As per uniform curriculum structure for Two-Year BEd Programme in West Bengal following NCTE Regulations, 2014

2nd Semester

Course-VIIIA

this ebook download from

ebook.dascoaching.in

জ্ঞান এবং পাঠক্রম

PART-I

ড. দেবাশিস পাল

রীতা পাবলিকেশন™

According to Uniform Curriculum Structure for Two-Year BEd Programme in WEST BENGAL following NCTE Regulations, 2014

জ্ঞান এবং পাঠক্রম

KNOWLEDGE AND CURRICULUM

PART-1

ব্যাবহারিক অংশ (PRACTICUM) সহ

2nd SEMESTER ● COURSE-VIII-A (1.2.8A)

ড. দেবাশিস পাল

এম এস সি (এডুকেশন), এম এস সি (সাইকোলজি), পি এইচ ডি (এডুকেশন)
ডিপ্লোমা ইন্ রিসার্চ মেথডোলজি (এন সি ই আর টি, দিল্লি)

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গোপালচন্দ্র স্মৃতি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
নবব্যারাকপুর, কলকাতা

রীতা পাবলিকেশন™
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা- 700 009

জ্ঞান এবং পাঠক্রম
(KNOWLEDGE AND CURRICULUM)
Dakshin Dinajpur B. Ed. College
Call No.... ....
Acc No.... 2845 ....

অপরাজিতা ভট্টাচার্য
রীতা পাবলিকেশন
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - 700 009
স্বত্বস্বত্ব:
প্রকাশিকা কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ:
মে, 2016-17

মুদ্রণে:
নবলোক প্রেস
15/2 নীরোদবিহারী মল্লিক রোড
কলকাতা - 700 006

বর্ণসংস্থাপনায়:
রীতা পাবলিকেশন
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - 700 009

প্রাপ্তিস্থান
রীতা বুক এজেন্সি
এবং
রীতা বুক হাউস
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - *700 009*

Contact:
9874099680 / 9433508007
(11:00 AM to 6:00 PM)

Email:
ritapublication@yahoo.com
ritapublication@gmail.com

Visit us: *www.ritapublication.com*

মূল্য: **₹ 200.00**

নিবেদন

NCTE Regulations 2014-র নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর একটি কারিকুলাম কমিটি গঠন করেছেন, যারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি **2** বছরের পাঠক্রম তৈরি করেছেন। **BEd** স্তরে এই নতুন পাঠক্রম **2015** থেকে চালু করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণকে সময়োপযোগী এবং যথোপযুক্ত করে তোলার লক্ষ্যে **BEd** স্তরের পাঠক্রমে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। **2** বছরের শিক্ষাকালকে **4**টি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সেমিস্টারে যে সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হল **Course VIII(A) : Knowledge and Curriculum**।

নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী **Course VIII-A**-র বিষয়বস্তুগুলি যথোপযুক্ত তথ্য সহকারে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে '**জ্ঞান এবং পাঠক্রম**' বইটিতে। নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রশ্নমান (**2** নম্বর, **5** নম্বর ও **10** নম্বর) অনুসারে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তাদের উত্তর সংকেত দেওয়া হয়েছে।

আশাকরি পশ্চিমবঙ্গের **BEd** স্তরের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন '**জ্ঞান এবং পাঠক্রম**' বইটি থেকে।

বইটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই রীতা পাবলিকেশন-এর কর্ণধার শ্রী বিজু ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহযোগীগণকে। বইটি লেখার ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য-উৎস থেকে সহযোগিতা পেয়েছি সেই সব তথ্যের লেখক ও প্রকাশক প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সুদীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যতের শিক্ষকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাদের প্রয়োজনে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

সবশেষে সমস্ত স্তরের পাঠকদের কাছে অনুরোধ তারা যেন গঠনমূলক সমালোচনা করে বইটির গুণমান বৃদ্ধি করতে আমাকে সহযোগিতা করেন।

2মে, 2016

বিনীত—
দেবাশিস পাল

(Syllabus)

Course-VIII-(A): Knowledge and Curriculum-Part-I (½)

Unit I : Epistemological bases of Education:

- Meaning of epistemology with reference to the process of knowledge building and generation.
- Distinction and relationship between: Knowledge and skill, Teaching and training, Knowledge and information, Reason and belief.

Unit II : Philosophical Foundation of Education:

- Significance of Philosophy in Education.
- Brief account of the tenets of the following philosophers of education: Vivekananda, Gandhi, Tagore, Aurobindo, Dewey, Radhakrishnan and Sir Asutosh Mukherjee.
- Relevance of the philosophy of the aforesaid philosophers in Indian education with regard to activity, discovery and dialogue.

Unit III : Sociological bases of education:

- Constitutional goal for Indian Education.
- Social issues in education: Globalization, multiculturalism, secularism, education for sustainable development.
- Nationalism, universalism and secularism– their interrelationship with education.
- Illiteracy, poverty, socially disadvantaged groups gender inequality.

Unit IV : Concepts and scope of education:

- Four pillars of education.
- Aims of education: Personal, Social, Economic and National Development.
- Education for generation, conservation and transmission of knowledge.
- Agencies of education: home, school, community and media.
- Types of education: formal, non-formal, informal and role of their agencies.

Unit V : Dynamics of Curriculum Development:

- Determinants of curriculum development
- Theories of curriculum development
- Stage Specific Curriculum: Pre-primary, Primary, Secondary, Higher Secondary
- Curriculum reforms in India; National Curriculum Frameworks

Engagement with Field / Practicum :

- Any one of the following :
  - i. Policy analysis National Curriculum Frame works.
  - ii. Identification of core, hidden, null and latent curriculum in textbooks.
  - iii. Designing an activity based curriculum.
  - Analysis of School Curriculum at different stages

সূচিপত্র

1. শিক্ষার জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি
(Epistemological Bases of Education) 1-22

- জ্ঞানের গঠন এবং উৎসের প্রেক্ষিতে জ্ঞানতত্ত্বের অর্থ
(Meaning of Epistemology with Reference to the Process of Knowledge Building and Generation)...1
- জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য
(Relation and Difference between Knowledge and Skill)...8
- শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য
(Relation and Difference between Teaching & Training)...10
- জ্ঞান এবং তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য
(Relation between Knowledge and Information)...13
- কারণ ও বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য
(Relation and Difference between Reason and Belief)...15
- **প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী** ...19

2. শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি
(Philosophical Foundation of Education) 23-85

2018 • শিক্ষায় দার্শনিক তাৎপর্য
(Significance of Philosophy in Education)... 23
- শিক্ষাদার্শনিকদের মতবাদ
(Tenets of Philosophers in Education)... 27
স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda)... 27, মহাত্মা গান্ধি 2018 (Mahatma Gandhi)... 31, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)... 34, জন ডিউই (John Dewey)... 43, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan)... 47, আশুতোষ মুখার্জি (Ashutosh Mukherjee)... 52
- ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রেক্ষিতে (সক্রিয়তা, আবিষ্কার এবং বক্তব্য) উপরোক্ত দার্শনিকগণের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা
(Relevance of Philosophy of the aforesaid Philosophers in Indian Education with regard to Activity, Discovery and Dialogue)... 55
- **প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী** ...81

Library Dakshin Dinajpur B. Ed. College ESTD.-2009 D/Dinajpur

3. শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি
(Sociological Bases of Education) 86-171
- ভারতবর্ষের শিক্ষার সাংবিধানিক লক্ষ্য
(Constitutional Goal for Education)... 86
- শিক্ষার সামাজিক বিষয়সমূহ — বিশ্বায়ন, বহু সংস্কৃতিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্থায়ী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা
(Social Issues of Education--Globalization, Multiculturalism, Secularism, Education for Sustainable Development)... 92
বিশ্বায়ন (Globalization)... 92, বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism) ... 97, ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)... 100, স্থায়ী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা (Education for Sustainable Development)...104
- জাতীয়তাবাদ (Nationalism)... 120
- আন্তর্জাতিকতাবাদ (Universalisation)... 127
- নিরক্ষরতা (Illiteracy)... 133
- দারিদ্র্য (Poverty)... 137
- সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়
(Socially Backward Groups)... 143
- লিঙ্গ অসমতা (Gender Inequality)... 156
- **প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী** ...166

4. শিক্ষার ধারণা এবং পরিধি
(Concept and Seope of Education) 172-287
- শিক্ষার চারটি স্তম্ভ
(Four Pillars of Education)...172
- শিক্ষার লক্ষ্য: ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক এবং জাতীয় উন্নয়ন
(Aim of Education: Personal, Social, Economic and National Development)...186
শিক্ষার লক্ষ্য: ব্যক্তিগত বিকাশ (Aims of Education: Individual Development)...189, শিক্ষার লক্ষ্য: সামাজিক বিকাশ (Aim of Education: Social Development)...191, অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)...193, শিক্ষার লক্ষ্য: জাতীয় বিকাশ (Aims of Education: National Development)...195
- জ্ঞান সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা
(Education for Generation, Conservation and Transmission of Knowledge)...200
- শিক্ষার সংস্থা: পরিবার, বিদ্যালয়, কমিউনিটি এবং মাধ্যম
(Agency of Education: Home, School, Community and Media)...201
গৃহ-পরিবার (Home and Family)...202, বিদ্যালয় (School) ...207, শিক্ষা সংস্থা হিসাবে কমিউনিটি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Community or Social Institution and Agency of Education)...216, শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত সংস্থা হিসাবে মাধ্যম (গণমাধ্যম) (Media as an Agency of Education—Mass Media)...219
- শিক্ষার প্রকার: প্রথাগত, প্রথাবহির্ভূত ও অপ্রথাগত এবং ওই সংস্থাগুলির ভূমিকা
(Types of Education: Formal, Non-Formal and Informal and Role of their Agencies)...230
প্রথাগত শিক্ষা এবং তার সংস্থার ভূমিকা (Formal Education and Role of their Agencies)...231, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা বা বিধিমুক্ত শিক্ষা এবং তার সংস্থাগুলির ভূমিকা (Non-Formal Education and Role of their Agencies)...239
- **প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী** ...282

5. পাঠক্রমের গতিশীলতা
(Dynamics of Curriculum) 288-366
- পাঠক্রম প্রণয়নে নির্ধারকসমূহ
(Determinants of Curriculum Development)...288
পাঠক্রমের ধারণা (Concept of Curriculum)...288
- পাঠক্রম প্রণয়নের তত্ত্ব
(Theories of Curriculum Development)...297
- স্তরভিত্তিক পাঠক্রম – প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক
(Stage Specific Curriculum–Pre-Primary, Primary, Secondary, and Higher Secondary)...302
- ভারতবর্ষের পাঠক্রম সংস্কার: ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক
(Curriculum Reforms of India: National Curriculum Framework)...323
ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (National Curriculum Framework–2005)...323, ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক–শিক্ষক শিক্ষা (National Curriculum Framework–2009)...336
- **প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী** ...364

■ ব্যবহারিক (Practicum) 367-376

Two-Year BEd Programme-এ 2nd Semester-এর অন্যান্য বই

- শিখন এবং শিক্ষণ (Learning and Teaching)
  ড. জয়ন্ত মেটে ড. রুমা দেব ড. বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ
- শিখন ও শিক্ষণ (Learning and Teaching)
  ড. দেবাশিস পাল
- ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি (Pedagogy of Language Teaching)
  ড. সুবিমল মিশ্র
- ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা (Pedagogy of Language Teaching)
  শ্রাবণী সান্যাল উৎপল মুখার্জি
- সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি (Pedagogy of Social Science Teaching)
  ড. অমল কুমার মাইতি, অর্ণব কুমার দত্ত
- সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ইতিহাস
  (Pedagogy of Social Science Teaching: History)
  গৌতম পাত্র
- সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ভূগোল
  (Pedagogy of Social Science Teaching: Geography)
  ড. মহাদেব ঠাকুর চক্রবর্তী ও পিউ রায়
- সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা
  (Pedagogy of Social Science Teaching)
  ড. চৈতন্য মণ্ডল
- বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ভৌতবিজ্ঞান (Pedagogy of Science Teaching)
  ড. অমলকান্তি সরকার
- বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ভৌতবিজ্ঞান (Pedagogy of Science Teaching)
  ড. দেবাশিস ধর
- বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি (Pedagogy of Science Teaching)
  ড. উদয়াদিত্য ভট্টাচার্য, রুম্পা মুখার্জি
- বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা (Pedag[illegible] of Science Teaching)
  মহুয়া চক্রবর্তী
- গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি (Pedagogy of Math[illegible]tics Teaching)
  প্রণয় পাণ্ডে
- প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম (Knowledge and Curriculum)
  ড. অমলকান্তি সরকার
- জ্ঞান ও পাঠক্রম (Knowledge and Curriculum)
  ড. প্রণব কুমার চক্রবর্তী
- শিখনের অ্যাসেসমেন্ট (Assessment for Learning)
  ড. দেবাশিস পাল, ড. দেবাশিস ধর
- শিখন প্রক্রিয়া ও শিখন ব্যবস্থার অ্যাসেসমেন্ট (Assessment for Learning)
  ড. অমলকান্তি সরকার
- শিক্ষায় নাটক ও শিল্পকলা (Drama and Arts in Education)
  অনিরুদ্ধ মুখার্জি

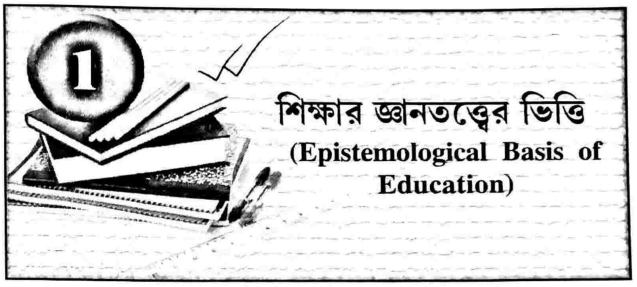

1 শিক্ষার জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি (Epistemological Basis of Education)

জ্ঞানের গঠন এবং উৎসের প্রেক্ষিতে জ্ঞানতত্ত্বের অর্থ (Meaning of Epistemology with Reference to the Process of Knowledge Building and Generation)

ebook.dascoaching.in

জ্ঞানবিদ্যার অর্থ (Meaning of Epistemology)

দর্শনের যে শাখা জ্ঞানের উৎপত্তি এবং তার প্রকৃতি, সীমা ও বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে তাকে জ্ঞানবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। গ্রিক শব্দ 'Episteme'-এর অর্থ হল জ্ঞান এবং গ্রিক শব্দ 'Logos'-এর অর্থ হল বিজ্ঞান বা যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। এই দুটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে ইংরেজি শব্দ 'Epistemology' বা জ্ঞানবিদ্যা।

সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগেই ইউরোপীয় দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, ব্রিটিশ দার্শনিক **জন লক** ***(John Locke)*** তাঁর দার্শনিক আলোচনায় জ্ঞানবিদ্যার উল্লেখ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক যিনি জ্ঞান বিদ্যার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সচেষ্ট হন এবং জ্ঞানের উৎস, উপকরণ ও সীমা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জ্ঞানের গঠন, প্রকৃতি, উৎপত্তি বা উৎস এবং যথার্থ বা বৈধতা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

জ্ঞানের গঠন প্রক্রিয়া (Process of Knowledge Building)

জানা ক্রিয়াপদটি প্রয়োজনের তারতম্যভেদে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। সাধারণত 'জানা' ক্রিয়াপদটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—

(i) পরিচিতিমূলক জ্ঞানের গঠন বা বস্তু জ্ঞান (Knowledge of things): একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিচিতিমূলক জ্ঞানের গঠন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন—আমি রামকে জানি, মঞ্জু পৌষালীকে জানে—এই দুটি বাক্যে 'জানা' শব্দটি চেনা বা সাক্ষাৎ বা পরিচয় লাভ করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অর্থে আমরা আমাদের সহপাঠীদের জানি, বন্ধুদের জানি, বাজারে যার নিকট জিনিস কিনি তাকে জানি ইত্যাদি।

আবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তবে তাঁর সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানা আছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ, তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত এবং দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং 'জানা' কথাটির একটি অর্থ চেনা বা সাক্ষাৎ বা পরিচিতি হলেও, সেটাই তার একমাত্র অর্থ নয়, তবে জানার মাধ্যমে জ্ঞান গঠন হয় এ কথা সত্য।

(ii) সাধন জ্ঞান বা কর্মকুশলতা (Knowing how): নিম্নোক্ত উদাহরণের সাহায্যে এই প্রকৃতির জ্ঞানের গঠন ব্যাখ্যা করা যায়।

রাজু স্কুটার চালাতে জানে।

মাধবী অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে জানে

উপরের দুটি উদাহরণে 'জানা' ক্রিয়াটি কোনো কর্ম করতে পারা বোঝায় অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেও (যেমন—স্কুটার চালানো, ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলা) জ্ঞান গঠিত হয়। এই ধরনের জ্ঞান গঠন দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত।

(iii) বাচনিক জ্ঞান (Propositional knowledge): বাচনিক জ্ঞান বা বাচনিকভাবে জ্ঞানের গঠন নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

আমি জানি যে—

সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

লিওনেল মেসি ফুটবল খেলার জাদুকর।

এখানে সত্যজিৎ রায় এবং লিওনেল মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও অর্থাৎ তাঁদের না চিনলেও তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। আমরা যদি একটি বৈশিষ্ট্যকে জানি এবং জানি যে উক্ত বৈশিষ্ট্যটি একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান, তাহলে সেই বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের 'জানা' হল বাচনিক অর্থে জানা বা বাচনিকভাবে জ্ঞানের গঠন। যেমন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার কী তা আমরা জানি এবং ওই পুরস্কারটি যে সত্যজিৎ রায় পেয়েছেন তাও জানি। একইভাবে ফুটবলের জাদুকর কী তা আমরা জানি এবং এও জানি যে লিওনেল মেসির মধ্যে ওই বৈশিষ্ট্যটি আছে। এই ধরনের জানা বা জ্ঞান বাচনিক অর্থে গঠিত। বাচনিকভাবে জ্ঞানের গঠনে যে বৈশিষ্ট্যমূলক বা বিবৃতিমূলক বাক্যটি জানা যায় সেটিকে অবশ্য সত্য হতে হবে, তা না হলে উক্ত জ্ঞানটি বাচনিকভাবে গঠিত বলে মনে করা হবে না। অর্থাৎ আমাদের উদাহরণে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ফুটবলের জাদুকর বিষয়টি সত্য হতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে জ্ঞান তিনভাবে গঠিত হয়—(ক) পরিচিতিমূলক ভাবে, (খ) কোনো কাজ করতে পারার মধ্য দিয়ে এবং (গ) কোনো বিবৃতিমূলক বচনকে সত্য বলে মনে করে।

দার্শনিক **জন হসপাস**-এর মতে এই তিন প্রকারের জ্ঞানের গঠনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাচনিকভাবে গঠিত জ্ঞান। তিনি আরও বলেন পরিচিতিভাবে গঠিত বা কোনো কর্ম সাধনের মধ্য দিয়ে গঠিত জ্ঞান, বাচনিকভাবে গঠিত জ্ঞান ছাড়া গঠিত হতে পারে না। বাচনিকভাবে গঠিত জ্ঞানের তিনটি শর্ত আছে।

ধরা যাক 'A' হল একজন ব্যক্তি এবং B হল একটি বিবৃতিমূলক বচন। তাহলে তিনটি শর্ত হল;

1. B বচনটি সত্য হবে
2. A-কে বিশ্বাস করতে হবে B সত্য
3. B বচনটি যে সত্য তার সমর্থনে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা প্রয়োজন

এই তিনটি শর্তের প্রত্যেকটি বাচনিকভাবে গঠিত জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত। এই শর্তের একটিও অনুপস্থিত থাকলে জ্ঞান গঠিত হবে না।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে জ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় তবে জ্ঞানের গঠন বা ধারণা করা যায়।

A J Ayer-এর মতে জ্ঞানের গঠন বা ধারণার উপযুক্ত শর্ত হল—

'ক' 'খ'-কে জানে যদি এবং কেবলমাত্র যদি 1. 'খ' সত্য, 2. 'ক' নিশ্চিত যে 'খ' সত্য 3. ক-এর নিকট প্রমাণ আছে যে 'খ' সত্য।

জ্ঞানের উৎস (Source of Knowledge)

জ্ঞানের উৎস হল মানুষের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্র। নিম্নে এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি মডেল এবং ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হল।

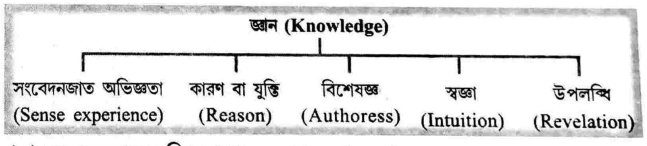

(ক) সংবেদনজাত অভিজ্ঞতা (Sense Experience)

জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সংবেদনজাত অভিজ্ঞতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধ এবং স্বাদ সংবেদনের মাধ্যমে জাগতিক বস্তু বা তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সংবেদনজাত অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র বাহ্যিক সংবেদনেই সীমাবদ্ধ নয়, অভ্যন্তরীণ সংবেদনের কথাও উল্লেখ করা যায়। এই অভ্যন্তরীণ সংবেদনজাত অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা আমাদের ব্যথা, বেদনা, ভালোবাসা, ঘৃণা, চিন্তা-ভাবনার কথা বলতে পারি। সংবেদনজাত জ্ঞান হল তাৎক্ষণিক, প্রত্যক্ষ এবং মূর্ত প্রকৃতির।

অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও সংবেদনজাত অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করে থাকি, যাকে অলীক কল্পনা বলে। আবার অনেক সময়ে প্রত্যক্ষণে ভ্রান্তি দেখা যায়, যেমন

রজ্জুকে সর্প ভ্রম করা, তবে এগুলিকে সংবেদনজাত অভিজ্ঞতার ভ্রান্তি বলা যায় না। তার কারণ হল বিচারে ভ্রান্তি। বিচারের ক্ষেত্রে সঠিক বা ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু সংবেদনজাত অভিজ্ঞতা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়।

জ্ঞানের উৎস হল সংবেদনজাত অভিজ্ঞতা—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দার্শনিকগণ হলেন—**বেকন** ***(Becon)***, **লক** ***(Lock)***, **বার্কলে** ***(Berkley)***, **হিউম** ***(Hume)***, **মিল** ***(Mill)*** প্রমুখ। তাঁরা বলেছেন প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি যা জ্ঞানে রূপ নেয়। তাঁরা আরও বলেন, ব্যক্তি কোনো সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তারা ধারণা আয়ত্ত করে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অবরোহী পদ্ধতিতে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

(Main Thesis of Sense Experience/Empiricist)

প্রথমত, হিউম প্রমুখ নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন যে, বাস্তব ব্যাপারে জ্ঞান একমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া যায়। চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীরা আর-এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন যে, কেবল বাস্তব ব্যাপারে নয়, কোনো বিষয়ের জ্ঞানই অভিজ্ঞতা ব্যতীত হতে পারে না। তাঁদের মতে যৌক্তিক নীতি (Logical Principle) এবং গাণিতিক সত্যগুলিও অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতাবাদীরা জ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, ও আরোহ পদ্ধতিকে স্বীকার করে নেয়।

তৃতীয়ত, অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন মৌলিক ধারণা গঠনে মন নিষ্ক্রিয় থাকে এবং পরে সেগুলিকে যুক্ত করে মৌলিক ধারণা গঠনের সময় মন সক্রিয় হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, অভিজ্ঞতাবাদীরা কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, জন্মের সময় আমাদের মন একটা সাদা বা অলিখিত কাগজের মতো থাকে।

পঞ্চমত, এদের মতে বুদ্ধিতে এমন কিছু নেই যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না। সব জ্ঞানই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

ষষ্ঠত, অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে যেহেতু সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এগুলির কোনো যথার্থ অস্তিত্ব নেই।

অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা (Criticism of Sense Experience or Empiricism)

(i) অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস, বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। দার্শনিক কান্টের মতে কখনও কোনো কিছুকেই বিনা বিচারে স্বীকার করা উচিত নয়।

(ii) অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে মৌলিক ধারণা গঠনে মন একেবারে নিষ্ক্রিয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মনের সক্রিয়তা ব্যতীত জ্ঞান বা ধারণা গঠন সম্ভব নয়।

(iii) শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সবচেয়ে সুনিয়ন্ত্রিত হয় না। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অনেক সময় যে ভ্রান্ত হয় তা বুদ্ধির সাহায্যেই নির্ণয় করা যায় যেমন জলে ডোবানো একটি লাঠিকে বাঁকা দেখায়, কিন্তু তা ঠিক নয়।

(iv) অভিজ্ঞতাবাদীরা বিচ্ছিন্ন সংবেদনকে এবং ধারণাকেই জ্ঞানের উপকরণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন সংবেদন এবং ধারণার মধ্যে অভ্যন্তরীণ শ্রেণিসূত্র না থাকলে জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাখ্যা করা যায় না।

(v) অভিজ্ঞতা বলতে অভিজ্ঞতাবাদীরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ছাড়াও আরও নানা ধরনের অভিজ্ঞতা, যেমন—অতীন্দ্রিয় (Mystic), নৈতিক (Moral) ইত্যাদি থাকতে পারে এবং এগুলিও জ্ঞানের উৎস হতে পারে।

(খ) কারণ, যুক্তি বা বুদ্ধিবাদ (Reason or Rationalism)

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই যে জ্ঞানের উৎস এই মতের বিরোধিতা করে সক্রেটিস বলেন যে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উৎস নয়, বুদ্ধিই জ্ঞানলাভের উপায়। বুদ্ধি বা যুক্তি, মনকেই বোঝায়। মনের কাজ হল চিন্তা করা, কল্পনা করা, যুক্তি দান করা। ফল বা মন্তব্য করলে যে মানসিক প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় তাকে যুক্তিকরণ বা বুদ্ধি বলে, যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় 60 + 30 কী করে 90 হয়, সে দর্শন, শ্রবণ বা স্পর্শ করে এর উত্তর দেবে না, সে গণনা করবে অর্থাৎ বুদ্ধি বা মুক্তির সাহায্যে উত্তর দেবে। যুক্তিকরণের জন্য ব্যক্তি হয় আরোহী না হয় অবরোহী কৌশল গ্রহণ করে। অবরোহী পদ্ধতিতে বক্তব্য (Premises) থেকে যুক্তি সহকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যদি বক্তব্য সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সত্য হবে। আরোহী পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঘটনা বা উদাহরণকে ভিত্তি করে সামান্যীকরণে উপনীত হতে হয়।

যুক্তিকরণকে যারা জ্ঞানের অন্যতম উৎস বলে মনে করেন তাদের বলা হয় বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। এই বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্লেটো, সক্রেটিস, স্পিনোজা, লাইবনীজ, ব্রাডলে প্রমুখ।

বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন যথার্থ জ্ঞান শাশ্বত ও সনাতন এবং সেই জ্ঞান আমরা সংবেদনজাত অভিজ্ঞতা থেকে পাই না। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদের দুটি ভাগ আছে—(ক) নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ এবং (খ) চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ। প্রাচীন বুদ্ধিবাদীগণ যেমন জার্মান দার্শনিক ভলভ এবং ইংরেজ দার্শনিক ব্রাডলে প্রভৃতি হলেন চরমপন্থী। আর দেকার্ত, লাইবনীজ এবং কান্ট হলেন নরমপন্থী।

চরমপন্থী বুদ্ধিবাদীগণ মনে করেন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনোই প্রকৃত সত্যের উদ্‌ঘাটন করা যায় না। একমাত্র বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান বা প্রকৃত সত্যকে জানা সম্ভব। নরমপন্থী বুদ্ধিবাদীগণ মনে করেন বুদ্ধির দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্জিত জ্ঞান অপেক্ষা উন্নততর। অর্থাৎ বুদ্ধি হল উন্নত জ্ঞানের উৎস।

বুদ্ধিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Main Thesis of Rationality)

(i) যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যেই লাভ করা যায়। বাহ্য অভিজ্ঞতাকে বর্জন করে মনোজগৎ বা বুদ্ধিকেই যথার্থ জ্ঞান লাভের উৎস বলে মনে করা প্রয়োজন।

(ii) বুদ্ধিবাদ অনুযায়ী ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সর্বজনগ্রাহ্য এবং অবশ্য স্বীকার্য জ্ঞান দিতে সক্ষম নয়। যথার্থ জ্ঞান শাশ্বত ও সনাতন যা আমরা বুদ্ধির সাহায্যেই লাভ করি।

(iii) বুদ্ধিবাদ অনুযায়ী মন বা আত্মা হল সক্রিয় এবং বুদ্ধি হল স্বাভাবিক গুণ।

(iv) বুদ্ধিবাদীরা যথার্থ জ্ঞানের উৎস হিসাবে কতকগুলি সহজাত ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, যেমন—অসীমতা, নিত্যতা, পূর্ণতা ইত্যাদি।

(v) বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং আরোহ পদ্ধতি নয়; দার্শনিক জ্ঞানের যথার্থ পদ্ধতি হল অবরোহ পদ্ধতি এবং গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই আমরা দর্শনের যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি।

(vi) চরমপন্থী বুদ্ধিবাদীরা মূল্যের (Values) বাস্তবতা স্বীকার করেন। তারা মনে করেন মূল্য বুদ্ধিগ্রাহ্য, সত্য, শিব ও সুন্দর বস্তুগত তারা নিছক মনের অলীক ধারণা নয়।

(vii) চরমপন্থী বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন কতকগুলি মৌলিক ও সহজাত ধারণা (innate ideas) থেকে অবরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করে জগৎ, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

বুদ্ধিবাদের সমালোচনা (Criticism of Rationalism)

(i) অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রান্ত বা সংশয়াত্মক—বুদ্ধিবাদীদের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়, অভিজ্ঞতা ছাড়া কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা জীবজগৎ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

(ii) অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে চিন্তন বা মননের সাহায্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়াই দর্শনের লক্ষ্য।

(iii) **লক** ***(Locke)***-এর মতে—যে সহজাত ধারণার উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিবাদ গড়ে উঠেছে তা সর্বজনস্বীকৃত বলা যায় না, ঈশ্বর বা নৈতিকতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়।

(iv) যথার্থ জ্ঞান শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া যায়—এই দৃষ্টিভঙ্গি যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি যথার্থ জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধি থেকেই পাওয়া যায়—এই দৃষ্টিভঙ্গিও সমর্থন করা যায় না।

(গ) বিশেষজ্ঞ (Authority)

বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃত্ব জ্ঞানের উৎস হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—আমি জানি এটা সত্য কারণ 'ক' ব্যক্তি একথা বলেছেন এবং 'ক' তিনি ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত।

ইতিহাসে 'ধর্মগুরুগণ'-এর বাণী বা কথা জ্ঞানের উৎস বলে মনে করা হয়। অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি এইসব ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

(ঘ) স্বজ্ঞা (Intuition)

অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি বা কারণ নির্ণয় এবং বিশেষজ্ঞ ছাড়া মনের এমন একটি শক্তি আছে যার সাহায্যে মন সরাসরি সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। এই শক্তির নাম স্বজ্ঞা। কোনোরকম অভিজ্ঞতা বা বিচারের সাহায্য না নিয়ে একটি ধারণা, সত্য বা বস্তুকে মন দিয়ে সরাসরি উপলব্ধি করার ক্ষমতাই হল স্বজ্ঞা। স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **বার্গসন** ***(Bergson)***। স্বজ্ঞাবাদীদের মতে স্বজ্ঞা হঠাৎ আসে। তারা আরও বলেন যে, অভিজ্ঞতা বা বিচার অর্থাৎ বুদ্ধিবাদ প্রকৃত জ্ঞান দিতে অক্ষম। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, বিচার বা বুদ্ধিও যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। একমাত্র স্বজ্ঞাই ধারণা, সত্য বা বস্তুর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটিয়ে তার প্রকৃতি বা স্বরূপ জানাতে পারে।

(ঙ) উপলব্ধি (Revelation)

অনেক সময় আমরা বলে থাকি উপলব্ধির (Revelation) মাধ্যমে আমরা জেনেছি। উপলব্ধি বলতে বোঝায় বাহ্যিক বা অধিক শক্তিশালী কোনো উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ, যেমন ঈশ্বর (God)। শিল্পকীর্তিতে যে খোদাই করা জ্ঞান আছে তাকে উপলব্ধিমূলক জ্ঞান বলে।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের উৎস
(Source of Knowledge in Indian Philosophy)

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানবাদে (Epistemology) জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণ চার রকমের—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। এ ব্যতীত অর্থপট্টী এবং অনুপলব্ধি জ্ঞানের উৎস বলে যথাক্রমে প্রভাদা মীমাংসা এবং বেদান্তমরা মনে করেন, নিম্নে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া হিসাবে প্রত্যক্ষ জুয়া, অনুমিতি, উপমিতি এবং শব্দকে ব্যাখ্যা করা হল।

ন্যায়দর্শন অনুযায়ী জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া হিসাবে প্রত্যক্ষ জুয়াকে দেখানো হল—

জ্ঞেয় (আত্ম)—মন—ইন্দ্রিয়—বস্তু—প্রত্যক্ষ জুয়া—প্রত্যক্ষণ জাত জ্ঞান।

অনুমিতির (মন্তব্যকরণ জ্ঞান) ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া হল—

জ্ঞেয় (আত্ম)—মন—ইন্দ্রিয়—বস্তু—সদৃশ জুয়া—অনুমিতি।

উপমিতির (সদৃশজাত জ্ঞান) ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া হল—

জ্ঞেয় (আত্ম)—মন—ইন্দ্রিয়— বস্তু—সদৃশ জুয়া—উপমিতি।

শব্দের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া হল—

জ্ঞেয় (আত্ম)—মন—ইন্দ্রিয়—বস্তু—পদ জুয়া—শব্দ।

সবশেষে উল্লেখ করা যায় ভারতীয় দর্শনে একাধিক ভাগ আছে প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণ-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়।

জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য (Relation and Difference between Knowledge and Skill)

জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য আলোচনা করার পূর্বে জ্ঞান ও দক্ষতা কাকে বলে তা জানা প্রয়োজন।

জ্ঞান (Knowledge)

জ্ঞান বলতে বোঝায় একগুচ্ছ তথ্য যা কোনো কাজ করতে সরাসরি প্রয়োগ করতে হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টিকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যায়।

চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্নার জন্য জ্ঞানের অর্থ হল—চিংড়ি মাছের মালাইকারি প্রস্তুত করার জন্য কী কী উপকরণের প্রয়োজন, চিংড়ি মাছগুলি কীভাবে কাটতে হবে, কোন্ সময়ে কী পরিমাণে কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে বোঝা যাবে রান্না হয়ে গেছে ইত্যাদি। একইভাবে শিখন সম্পর্কে জ্ঞান বলতে বোঝায় শিখন কাকে বলে, শিখনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

সংক্ষেপে বলা যায়, জ্ঞান হল কোনো বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক তথ্য সকল।

দক্ষতা (Skill)

দক্ষতা হল মনোসঞ্চালনমূলক (Psychomotor) কোনো কাজের পর পর্যবেক্ষণ গ্রাহ্য সফলতা বা সাফল্য। যেমন পূর্বের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায় কোনো গৃহিণী যদি নিজের হাতে এমন চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করে যা আহার করে সকলেই খুব ভালো হয়েছে বলে মন্তব্য করে, এক্ষেত্রে বলা হবে গৃহিণীর চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করার দক্ষতা আছে। সংক্ষেপে বলা যায় দক্ষতা হল ব্যাবহারিক দিক যা প্রমাণিত হয় পর্যবেক্ষণ দ্বারা (এক্ষেত্রে আস্বাদনের দ্বারা)।

জ্ঞান ও দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Knowledge and Skill)

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞান এবং দক্ষতাকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। এর কারণ হল উভয়েই পরস্পর সম্পর্কিত। জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে সম্পর্কগুলি হল—

1. জ্ঞান হল তাত্ত্বিক বা তত্ত্ব সংক্রান্ত (Theoretical) এই তত্ত্বের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকেই (Practical or application) দক্ষতা বলে।
2. দক্ষতা বিকাশের পূর্বে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন আবশ্যক, সেই কারণেই বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে ব্যাবহারিক শ্রেণির (Practical Class) কাজের পূর্বে উক্ত বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করা হয়।
3. কোনো কোনো ক্ষেত্রে দক্ষতা সহজাত হলেও তার বিকাশ এবং উন্নয়নের জন্য সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

4. অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ ধরে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করলে সময় এবং পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়।
5. দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে জ্ঞান অর্জন করে তা সংশোধন করা যায়।
6. দক্ষতার ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করলে দক্ষতাকে বিশ্লেষণ করা যায় এবং প্রতিটি স্তর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয় যার ফলে ওই বিষয়ে ব্যক্তির দক্ষতা আরও উন্নত হয়।
7. জ্ঞান দক্ষতাকে আরও পরিশীলিত এবং পরিণত করে।

Library D.El.Ed College ESTD-2009 D/Dinajpur

জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Knowledge and Skill)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অধিকাংশ সময়েই জ্ঞান ও দক্ষতা একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। মনে হয় দুটি শব্দের অর্থ এক। জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

1. জ্ঞান বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের উপর তথ্য, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি যা শিক্ষক, পুস্তক বা অন্যান্য মাধ্যম, প্রতিষ্ঠান, অভিজ্ঞতা থেকে শেখা যায়। অপর দিকে দক্ষতা হল অর্জিত জ্ঞান যা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সফল হওয়া যায়। অর্থাৎ জ্ঞান হল তাত্ত্বিক বিষয়, দক্ষতা হল তাকে সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় BEd ডিগ্রিধারী কোনো শিক্ষক জানেন কীভাবে পাঠদান করা উচিত, শ্রেণিকক্ষে কোন্ সময়ে কী ধরনের প্রশ্ন করা উচিত, শ্রেণি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কী কী করা প্রয়োজন, শ্রেণিকক্ষ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কী কী করা উচিত ইত্যাদি এ সবই হল জ্ঞানের বিষয়। এই অর্জিত জ্ঞান যখন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান কালে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শিখনকে উন্নত করা যায় তখন সেই শিক্ষককে বলা যাবে দক্ষ শিক্ষক। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জিত হলেই যে তা দক্ষতায় পরিণত হবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এককথায় বলা যায় জ্ঞান এবং দক্ষতা পৃথক ধারণা।
2. দার্শনিক দিক থেকে জ্ঞান স্পর্শনীয় নয় (Intangible) কিন্তু দক্ষতাকে স্পর্শনীয় (Tangible) করে তোলা যায়।
3. চেষ্টা ও ভ্রান্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করে দক্ষতার উন্নতি সম্ভব কিন্তু তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করতে গেলে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো ব্যক্তি হয়তো সাধারণভাবেই কাঠের কাজ চমৎকারভাবে করে কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি কাঠের কাজের প্রযুক্তি জানে তাহলে সে আরও উৎকৃষ্ট মানের কাঠের কাজ করতে পারবে। একইভাবে কোনো ব্যক্তির মধ্যে হয়তো যথেষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞান আছে কিন্তু প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে সে তার প্রয়োগ করতে অক্ষম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো ব্যক্তির বিদ্যুতের উপর

যথেষ্ট পড়াশোনা আছে কিন্তু হঠাৎ তার গৃহে বিদ্যুৎজাত কোনো সমস্যা দেখা দিল, সে ক্ষেত্রে প্রথমেই তার কী করণীয় তা স্থির করতে পারে না। এখানে মন্তব্য করা যায় জ্ঞানার্জন হলেও ব্যক্তির বিদ্যুৎ সম্পর্কে দক্ষতা শূন্য।

4. তাত্ত্বিক জ্ঞান অন্যান্যদের সঙ্গে আদানপ্রদান করা যায়, কোনো কোনো দক্ষতা কখনোই অন্যদের সঙ্গে আদানপ্রদান করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন গাড়ি মেকানিক কোনো গাড়ি দেখলেই তার ত্রুটি বুঝতে পারে, কারণ দীর্ঘ সময় এবং বিভিন্ন গাড়ি নিয়ে কাজ করার ফলেই তার এই বিশেষ দক্ষতা গড়ে উঠেছে, যা সে তার শিক্ষানবিশদের মধ্যে সঞ্চার করতে সক্ষম নয়।

5. জ্ঞান এবং দক্ষতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল জ্ঞান তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে (Information processing) এবং মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়, দক্ষতা সম্পূর্ণতা পায় হস্তের দ্বারা।

6. জ্ঞান আংশিকভাবে হলেও তা ব্যক্তির উপকারে আসে। অপর দিকে দক্ষতা উচ্চমাত্রার হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় দক্ষতার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা প্রয়োজন।

7. অধিকাংশ শিক্ষা মনোবিদ মনে করেন জ্ঞানের মূল্য দক্ষতা থেকে অধিক। কারণ দক্ষতা বিকাশে জ্ঞান সাহায্য করে, বিপরীতটা হয় না।

পরিশেষে বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞান এবং দক্ষতা উভয়েরই প্রয়োজন। শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন যেমন শিক্ষার লক্ষ্য নয় তেমনি জ্ঞানহীন দক্ষতা প্রত্যাশিত নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য (Relation and Difference between Teaching & Training)

শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্যের আলোচনায় প্রথমে জানতে হবে শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা এবং অর্থ।

ebook.dascoaching.in

শিক্ষণের সংজ্ঞা এবং অর্থ (Meaning and Definition of Teaching)

অভিধান অনুযায়ী শিক্ষণের সংজ্ঞা হল—কোনো কিছু জানার কারণ, জ্ঞান প্রদান করা বা উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশদান (to cause to know something, to impart knowledge or to instruct by example)। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ শিক্ষণের উপর প্রখ্যাত কয়েকজন শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হল।

(i) ***Albert Einstein***-এর মতে, "The supreme art of teaching is to awaken joy in creative expression and knowledge." অর্থাৎ জ্ঞান ও সৃষ্টিশীল প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আনন্দ জাগ্রত করাই হল শিক্ষণ শিল্পের প্রধান লক্ষ্য।

(ii) ***American Education Research Association*** প্রকাশিত 'Hand Book of Research in Teaching'-এ বলা হয়েছে—"Teaching is the form of interpersonal influence aimed at changing the behaviour of another person." অর্থাৎ শিক্ষণ হল এক ধরনের আন্তর্ব্যক্তি প্রভাব যার লক্ষ্য হল অন্য ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটানো।

(iii) ***W R Ryburn***-এর মতে, "Teaching includes the training of emotions of the child. It is one of the means of given right feeling to the children." অর্থাৎ শিক্ষণের মাধ্যমে শিশু প্রাক্ষোভিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। শিশুদের মধ্যে সঠিক অনুভূতি সঞ্চালনের অন্যতম উপায় হল শিক্ষণ।

শিক্ষণের অর্থ হল—এটি একটি প্রক্রিয়া যা তাত্ত্বিক ধারণা শিখতে সাহায্য করে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান সঞ্চালন ঘটায়। শিক্ষকের ভূমিকা হল শিখনে সাহায্য করা, আলোচনার নেতৃত্ব দান, মুক্ত প্রশ্ন (Open ended question) জিজ্ঞাসা করার সুযোগ সৃষ্টি করা, প্রক্রিয়া এবং কর্মসূচির নির্দেশদান এবং শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্যোগী করে তোলা।

শিক্ষকের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুদের শিক্ষা দান করা যার ফলে শিশু সুনাগরিক হিসেবে পরিচিত হতে পারে। এই কারণেই শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসাবে বিবেচিত হয়।

প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা এবং অর্থ (Meaning and Definition of Training)

প্রশিক্ষণের আভিধানিক অর্থ হল যা নির্দেশদানের ফলে সংঘটিত হয় এবং কোনো পরীক্ষা বা দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা হল—এটি একটি কৌশল যা প্রায়শই কোনো সংগঠনের আদর্শ বা প্রত্যাশিত দক্ষতা, জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে ব্যবহৃত হয় (Training is a technique frequently used in organisation to build a persons knowledge, skills and attitudes in order to meet the expected standards of organisation)। একজন ব্যক্তি হয়তো উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন তথাপি তাকে ওই সংগঠনের কর্মী হতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণ হল কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোনো কাজে পারদর্শিতা উন্নত করতে নির্দেশদান। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হল—

1. অভিপ্রায় (Intent)
2. নকশা (A design)
3. উপায় এবং মাধ্যম (The reasons and media)
4. প্রথাগত মূল্যায়ন বা শংসাপত্র দানের ক্ষমতা (Formalized assessment or certification capability)

প্রশিক্ষণ প্রাক্-বৃত্তি (Pre service training) এবং বৃত্তিকালীন (In-service training) উভয়ভাবেই দেওয়া যায়, প্রাক্-বৃত্তি বলতে বোঝায় বৃত্তি গ্রহণের পূর্বে নির্দিষ্ট বৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, যেমন BEd কলেজে নবাগত শিক্ষার্থী (Fresher students)। বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণ বলতে বোঝায় বৃত্তিতে থাকাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট কাজে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা গড়ে তোলা। তবে দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক
(Relation between Teaching and Training)

শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নে উল্লেখ করা হল—

1. উভয় ক্ষেত্রেই শিখনের (Learning) প্রয়োজন, যিনি শিক্ষণে শিক্ষাদান বা নির্দেশদান করেন তাকে বলা হয় শিক্ষক এবং যিনি প্রশিক্ষণে নির্দেশদান করেন তাকে বলা হয় প্রশিক্ষক।
2. শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে।
3. উভয় ক্ষেত্রেই পাঠক্রম থাকে।
4. শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
5. উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
6. উভয়ের উদ্দেশ্য হল ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ।
7. উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন এবং শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।
8. প্রশিক্ষণ হল শিক্ষণের একটি উপব্যবস্থা।
9. শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ উভয়েই গুণগত মানের উন্নতিতে সাহায্য করে।

শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Teaching and Training)

শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যেমন—

1. শিক্ষণ-তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত অন্যদিকে প্রশিক্ষণ হল জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ।
2. প্রশিক্ষণ শিক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর নির্দিষ্ট দিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়।
3. শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল নতুন জ্ঞান পরিবেশন করা, যেখানে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল বিশেষ কৌশলে নির্দিষ্ট দক্ষতাগুলিকে বিকশিত করা, যেমন অণুশিক্ষণের (Micro-teaching) সাহায্যে শিক্ষণ দক্ষতাগুলিকে বিকশিত করা।
4. শিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বা শ্রোতাদের মনকে উন্নত করা, যেখানে প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির নির্দিষ্ট অভ্যাস গড়ে তোলা।

5. শিক্ষণ সাধারণত পুথিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, অপর দিকে প্রশিক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
6. শিক্ষকগণ প্রায়শই শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে Feedback লাভ করেন, অপরদিকে প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণরত ব্যক্তিদের নিকট থেকে Feedback পায়।
7. প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে শিক্ষণ কাজটি সম্পন্ন হয়, অপরদিকে প্রশিক্ষণ কর্ম ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হয়।
8. শিক্ষণ শৈশবকাল থেকেই শুরু হতে পারে, অন্যদিকে শিশুশ্রমিক আইন অনুযায়ী (Child labour Act) নির্দিষ্ট বয়সের পরেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় একজন ব্যক্তিকে দক্ষ পেশাজীবী হতে গেলে তাত্ত্বিক ধারণাগুলিকে গভীরভাবে বুঝতে হবে এবং একই সঙ্গে তাকে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ উভয়েই সম গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞান এবং তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য
(Relation between Knowledge and Information)

অধিকাংশ সময়েই আমরা জ্ঞান (Knowledge) এবং তথ্য (Information) শব্দ দুটিকে এমনভাবে বলে থাকি যাতে মনে হয় শব্দদুটি একটি অপরটির বিকল্প। প্রকৃতপক্ষে শব্দ দুটির মধ্যে সম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা থাকলেও বেশ কিছু পার্থক্যও আছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

আলোচনার প্রথমেই প্রয়োজন হল শব্দ দুটি অর্থাৎ জ্ঞান এবং তথ্যের অর্থ।

জ্ঞান-এর অর্থ (Meaning of Knowledge)

জ্ঞান হল সংক্ষিপ্ত এবং তথ্যের যথাযথ সংগ্রহ যাতে তা ব্যবহার করা যায়। জ্ঞান একটি নির্ধারণমূলক প্রক্রিয়া যা একগুচ্ছ তথ্যের বিন্যাস (Pattern) নির্দিষ্ট করে। আমরা এও বলতে পারি যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় সংক্রান্ত তথ্য মুখস্থ করে, তখন তার মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার হয়। এই জ্ঞানের প্রয়োজন এবং প্রয়োগও হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের জ্ঞানকে সমন্বয়িত করা যায় না, যার দ্বারা আরও জ্ঞান অর্জন করা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা নামতা মুখস্থ করে বলতে পারে 3 সংখ্যা 3 বার হলে তা হবে 9 (3 × 3), কারণ তারা নামতার বই থেকে এটা মুখস্থ করেছে। কিন্তু তারা বলতে পারে না 23 সংখ্যা 25 বার হলে কত হবে। এর কারণ হল নামতা বইতে এটা নেই। এই কারণেই বলা হয় মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন করলে তার সাহায্যে অধিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হল বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Analytical ability) এবং বাস্তব জ্ঞানে পরিণত করার ক্ষমতা (ability to reduce empirical factual knowledge)।

জ্ঞান বলতে বোঝায় আমরা যা জানি। এই 'জানা'-টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক আমরা বিশ্বের মানচিত্রকে মস্তিষ্কে গঠন করেছি, মস্তিষ্কে রক্ষিত এই বিশ্বের মানচিত্রটি কিন্তু প্রাকৃতিক মানচিত্রের (Physical Map) মতো হবে না। কারণ মস্তিষ্কে শুধুমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানই থাকে না, জ্ঞানের সঙ্গে থাকে বিশ্বাস, প্রত্যাশা এবং অনুভূতি। জ্ঞান অবশ্যই মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় কিন্তু তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। জ্ঞানের সঙ্গে আরও কিছু সঞ্চিত হতে থাকে, কারণ আমরা সর্বদাই আমাদের চোখ, কান, স্পর্শ দ্বারা বাইরের সংকেত গ্রহণ করি। জ্ঞান অর্জন কতকগুলি জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার ফল। এগুলি হল ধারণা, সংযোগসাধন ও যুক্তি প্রদর্শন। জ্ঞান মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

তথ্য-এর অর্থ (Meaning of Information)

ইংরেজি শব্দ 'Information'-এর উৎপত্তি হয়েছে লাতিন শব্দ 'informatio' থেকে, যার উৎপত্তি আবার 'informer' থেকে, যার অর্থ হল 'মনকে আকার প্রদান', নির্দেশ দান বা শিক্ষা দান। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তথ্যকে কতকগুলি সংকেতের পর্যায়ক্রম বলা যায়, যা একটি অর্থযুক্ত শব্দ নির্মাণ করে। ব্যাবহারিকঅর্থে তথ্য হল কতকগুলি প্রতীকের একটি ছন্দ যা একটি অর্থযুক্ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হয়। আবার Date প্রক্রিয়াকরণকেও তথ্য বলে, যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বই, মাধ্যম বা অন্য কারো নিকট থেকে কিছু শোনে বা data সংগ্রহ করে এবং সেইগুলিকে যখন সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থবহ করে তখন সেইগুলি তথ্য হয়। এটা মনে রাখা প্রয়োজন তথ্য ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়।

তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Information and Knowledge)

তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক হল—

1. জ্ঞান তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তথ্য ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়।
2. তথ্য আমাদের জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাইরে বিস্তৃত করে।
3. জ্ঞান এবং তথ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভুল হতে পারে।
4. মস্তিষ্কে সংরক্ষণের উপর জ্ঞান এবং তথ্য নির্ভর করে।
5. তথ্য হল পরিসংখ্যান বা ডেটার প্রক্রিয়াকরণ, আবার জ্ঞান হল সেই তথ্য যাকে ব্যবহার করা যায়।

তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Information and Knowledge)

জ্ঞান এবং তথ্যের সঙ্গে পার্থক্য হল—

1. তথ্য হল ডেটার (Data) প্রক্রিয়াকরণ, অপরদিকে জ্ঞান হল তথ্যক ব্যবহারের জন্য রূপদান করা।

2. তথ্য ডেটাকে (Data) সম্পর্কিত করে, সেখানে জ্ঞান একগুচ্ছ তথ্যের প্যাটার্ন পরীক্ষা করে।
3. জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন হল প্রজ্ঞামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা যেখানে তথ্যের জন্য প্রজ্ঞামূলক ক্ষমতার কোনো প্রয়োজন হয় না।
4. জ্ঞান কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত অপরদিকে তথ্য অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক।

কারণ ও বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য (Relation and Difference between Reason and Belief)

কারণ এবং বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক এবং পার্থক্য আলোচনার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হল কারণ এবং বিশ্বাস কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করা।

বিশ্বাস-এর অর্থ (Meaning of Belief)

বিশ্বাস বলতে সাধারণত পারিপার্শ্বিক বস্তু ও জগৎ সম্পর্কে ব্যক্ত, স্থায়ী পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান, ধারণা বা উপলব্ধি এবং তার নিশ্চয়তাকে বোঝানো হয়, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বাস শব্দটি পৃথক অর্থ বহন করে। সেই কারণেই অন্যান্য দার্শনিক বিষয়, যেমন সত্য, জ্ঞান, তথ্য এইগুলির মতো বিশ্বাসের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে সত্য বা মিথ্যা বিচার করে সত্য মনে করলে তা বিশ্বাস করা হয়। মিথ্যা মনে করলে অবিশ্বাস করা হয়। আর মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা মনে করা হলে তাকে সন্দেহ করা হয়। সন্দেহকে অনেক সময় বিশ্বাসের অভাবও বলা হয়। বিশ্বাসকে অনেক সময় আস্থা (Trust) এবং ভরসা (Faith) হিসাবে দেখা হয়। বিশ্বাসের দৃঢ়তা খুব অধিক হলে তাকে অন্ধবিশ্বাস বলা হয়। বিশ্বাসের ধারণাকে অনেক ক্ষেত্রে আশা (Hope), আশ্বাস (Assurance) বা বিশ্বাস করার ইচ্ছা (Willingness to trust) ইত্যাদির সঙ্গে এক হিসাবে দেখা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে অনুভূতির সচেতন অনুধাবনের সঙ্গে এক হিসাবে দেখা হয়, আবার অনেকে একে কোনো তথ্যকে (Information) বোধগম্য হওয়ার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যাচাই করার পর এই বোধের নিশ্চয়তা তৈরি হলে জ্ঞান হিসাবে বিচার করা হয়। কোনো পর্যবেক্ষণলব্ধ বিশ্বাসকে যুক্তির সঙ্গে বিচার করার পর তা 'সত্য' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তখন জ্ঞান সৃষ্ট হয়। এইভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়।

বিশ্বাসের ধারণাটির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কল্পনা (Imaginative) যুক্ত। আবার অনেক সময় ভিত্তিহীন বা যুক্তিবর্জিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস জন্মে, যাকে ভ্রান্ত বিশ্বাস (Illusion) বলে। যেমন "দড়িকে সাপ বলে ভুল করা হয়"। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ধারণার সঙ্গে মূল্যবোধ যুক্ত থাকে। যেমন গণতন্ত্রে বিশ্বাস (ভালো), জাতিভেদে বিশ্বাস (মন্দ) ইত্যাদি।

বিশ্বাসের উৎস বিভিন্ন হতে পারে। মনোবিদগণ এই সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলেন বিশ্বাসের উৎস হল—

1. শৈশবকাল থেকে আমরা আমাদের চারপাশের মানুষের বিশ্বাসকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করি।
2. অনেক ক্ষেত্রে জনগণ কোনো অসাধারণ ব্যক্তি বা নেতৃত্বের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে।
3. ধর্মীয় আচার-আচরণকে বিশ্বাস করা হয়।
4. ধর্মীয় প্রধান বা 'গুরুদেব' প্রমুখ ব্যক্তিদের বক্তব্যে বিশ্বাস করি।
5. অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সংস্থাগুলি বারংবার প্রচারের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করে।

কারণ-এর অর্থ (Meaning of Reason)

Reason বা কারণ হল ক্ষমতা, যা সচেতনভাবে বিষয়কে অর্থযুক্ত করে, যুক্তির অবতারণা করে, তথ্য স্থাপন বা যাচাই করে এবং প্রচলিত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তন করে এবং নতুন বা প্রচলিত তথ্যকে বিশ্বাস করে। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত এবং শিল্প প্রভৃতি মানুষের কার্যাবলির সঙ্গে কারণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সাধারণভাবে মানব প্রকৃতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

'কারণ' ধারণাটি অনেক সময় যৌক্তিকতা (Rationals) এবং অনেক সময় বিচার্যে (Discursive) রূপ নেয় যা স্বজ্ঞার (Intuition) বিপরীত।

কারণ বা কারণ নির্ণয় (Reasoning) চিন্তন, প্রজ্ঞা এবং বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। স্বজ্ঞা বা অভ্যাসের ন্যায় কারণ হল একটি পথ যার সাহায্যে একটি ধারণা বা ভাব (Idea) থেকে অন্য একটি সম্পর্কিত ভাব বা ধারণায় চলে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এটি (কারণ) হল একটি পন্থা যার সাহায্যে ব্যক্তি কার্য-কারণ (Cause and effect), সত্য-মিথ্যা, এবং ভালো-মন্দ বিচার করে। সচেতন বা স্ব-ইচ্ছায় বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা ইত্যাদির পরিবর্তনের ক্ষমতার সঙ্গে কারণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সেই কারণেই বলা হয় স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কারণ সম্পর্কিত। মনস্তত্ত্ববিদ এবং জ্ঞানমূলক বিজ্ঞানীরা কীভাবে ব্যক্তি কারণ নির্ণয় করে তার উপর একাধিক পরীক্ষা বা অধ্যয়ন করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন—কোন্ ধরনের জ্ঞান বা স্নায়ুসংবেদন (Neural Connection) এর জন্য দায়ী এবং কেমনভাবে সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (Cultural factor) ব্যক্তির মন্তব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক প্রাচীন দার্শনিকগণের মতে প্রকৃতির সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে উদ্দেশ্য আছে। যেমন **পিথাগোরাস** ***(Pythagoras)***-এর মতে মহাকাশের ক্ষেত্রেও কারণ আছে। এর অর্থ হল 'কারণ' কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রভাব দেখা যায়।

গ্রিক দার্শনিক **প্লেটো** ***(Plato)***-এর মতে, মানব প্রকৃতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা কারণ উচ্চস্তরের, যেমন সামাজিকতা হল এমন একটি বিষয় যা মানুষ পারস্পরিক সুবিধার

জন্য নিজেদের মধ্যে গড়ে তোলে এবং সকলেই এতে অংশগ্রহণ করে। Plato আরও বলেন 'কারণ' হল আত্মার স্বাভাবিক রাজা যা অন্যান্য অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন তেজস্বিয়তা (Spiritedness) এবং আবেগ।

প্লেটোর ছাত্র **অ্যারিস্টটল** ***(Aristotle)*** মানুষকে যুক্তিবাদী প্রাণী হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং কারণকে মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সুখী যিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে, উচ্চমাত্রার এবং সম্পূর্ণভাবে কারণ অনুযায়ী জীবনযাপন করেন।

আধুনিক দার্শনিক **কান্ট** ***(Kant)***, **য়ুর্গেন হেবারমাস** ***(Jurgen Habermas)***-এর মতে কারণ হবে সম্পূর্ণভাবে প্রথাগত (Formal) বা পদ্ধতিগত (Procedural)। তাঁরা কারণকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন:

1. **জ্ঞানমূলক-যান্ত্রিক কারণ (Cognitive-Instrumental Reason):** বিজ্ঞানে এই ধরনের কারণ ব্যবহৃত হয়। কোনো ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা, নিয়ন্ত্রণ করা, পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহৃত হয়।
2. **নৈতিক-ব্যাবহারিক কারণ (Moral-Practical Reason):** যখন আমরা স্বতঃপ্রণোদিত নৈতিক বা রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করি তখন এই ধরনের কারণ ব্যবহার করি।
3. **সৌন্দর্যানুভূতিমূলক কারণ (Aesthetic Reason):** শিল্প, সাহিত্য এবং বিশ্বকে নতুন ভাবে দেখার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

এ ছাড়াও দার্শনিক কান্ট 'Reason' বা কারণকে দু-ভাবে বিচার করেছেন—বেসরকারি কারণ (Private Reason) এবং সরকারি কারণ (Public Reason)

যখন কোনো ব্যক্তিকে সমাজে কোনো ভূমিকা পালন করতে হয় এবং কোনো কাজ করতে হয়, যেমন সৈন্য হতে হয়, কর (Tax) দিতে হয়, সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করতে হয় তখন যে কারণ ব্যবহৃত হয় তাকে বেসরকারি কারণ (Private Reason) বলে আবার যখন কোনো ব্যক্তি তার কাজের জন্য উপযুক্ত কারণ দেখায়, যখন যে মানবতার জন্য কাজ করে তাকে বলা হয় সরকারি কারণ (Public Reason)। এই ক্ষেত্রে কারণ হবে মুক্ত এবং ব্যক্তির নিজস্ব।

বিশ্বাস এবং কারণের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য (Similarities between Belief and Reason)

বিশ্বাস এবং কারণের মধ্যে সাদৃশ্য হল—

(i) বিশ্বাস এবং কারণ উভয়েই সত্যকে অনুসন্ধান করে।
(ii) কারণ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করে এবং অনেক সময় পরিবর্তন করে।
(iii) কারণ এবং বিশ্বাস উভয়েই দর্শনের বিষয় এবং মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য।

(iv) বিশ্বাস অনেক সময় কারণকে সক্রিয় করে এবং কারণ অনেক সময় বিশ্বাসকে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলে।

(v) কারণ এবং বিশ্বাস উভয়েই পরিবর্তনশীল।

বিশ্বাস এবং কারণের মধ্যে পার্থক্য হল—

(i) বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় প্রথা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি যা অনেক সময় যুক্তিসিদ্ধ নয়। কারণ অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ এবং পরীক্ষাসাপেক্ষ।

(ii) কারণ প্রক্রিয়ায় কার্যকারণ সম্পর্ক, সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মন্দের বিচার করা হয় অপরদিকে বিশ্বাস এইগুলির উপর নির্ভরশীল নয়।

(iii) চিন্তন, বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া কারণকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে বিশ্বাস চিন্তন, বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ।

(iv) কারণ পরীক্ষাসাপেক্ষ (Experiment), বিশ্বাস পরীক্ষাসাপেক্ষ নয়।

(v) বিশ্বাসের সঙ্গে আবেগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, কারণের ক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম।

(vi) মানব প্রকৃতি হিসাবে কারণ বিশ্বাস অপেক্ষা উচ্চতর হিসাবে গণ্য।

(vii) সমাজ-রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে মানব সমাজে শোষণ, উৎপীড়ন এবং অত্যাচার হয়েছে। কারণ এই ধরনের শোষণ, উৎপীড়ন ইত্যাদির বিরোধিতা করে।

(viii) অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বাস কারণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

(ix) শিক্ষার সঙ্গে কারণের সম্পর্ক ইতিবাচক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বাস শিক্ষা নিরপেক্ষ।

(x) বিশ্বাস ব্যক্তিগত কারণ নৈর্ব্যক্তিক।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— **মান-2**

▶ জ্ঞানবিদ্যার অর্থ কী? (What is Epistemology ?)

Ans. দর্শনের যে শাখা জ্ঞানের উৎপত্তি এবং তার প্রকৃতি, সীমা ও বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে তাকে জ্ঞানবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। গ্রিক শব্দ 'Episteme'-এর অর্থ হল জ্ঞান এবং গ্রিক শব্দ 'Logos'-এর অর্থ হল বিজ্ঞান বা যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। এই দুটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে ইংরেজি শব্দ 'Epistemology' বা জ্ঞানবিদ্যা।

▶ অভিজ্ঞতাবাদের কয়েকটি সমালোচনা লিখুন। (Write some criticisms of sense experience or empericism.)

Ans. অভিজ্ঞতাবাদের বিভিন্ন সমালোচনাগুলি হল—

(i) অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস, বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। দার্শনিক কান্টের মতে কখনও কোনো কিছুকেই বিনা বিচারে স্বীকার করা উচিত নয়।

(ii) অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে মৌলিক ধারণা গঠনে মন একেবারে নিষ্ক্রিয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মনের সক্রিয়তা ব্যতীত জ্ঞান বা ধারণা গঠন সম্ভব নয়।

(iii) শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সবচেয়ে সুনিয়ন্ত্রিত হয় না। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অনেক সময় যে ভ্রান্ত হয় তা বুদ্ধির সাহায্যেই নির্ণয় করা যায় যেমন জলে ডোবানো একটি লাঠিকে বাঁকা দেখায়, কিন্তু তা ঠিক নয়।

▶ স্বজ্ঞা কী? (What is intuition ?)

Ans. অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি বা কারণ নির্ণয় এবং বিশেষজ্ঞ ছাড়া মনের এমন একটি শক্তি আছে যার সাহায্যে মন সরাসরি সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। এই শক্তির নাম স্বজ্ঞা। কোনোরকম অভিজ্ঞতা বা বিচারের সাহায্য না নিয়ে একটি ধারণা, সত্য বা বস্তুকে মন দিয়ে সরাসরি উপলব্ধি করার ক্ষমতাই হল স্বজ্ঞা। স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **বার্গসন *(Bergson)***। স্বজ্ঞাবাদীদের মতে স্বজ্ঞা হঠাৎ আসে। তারা আরও বলেন যে, অভিজ্ঞতা বা বিচার অর্থাৎ বুদ্ধিবাদ প্রকৃত জ্ঞান দিতে অক্ষম। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, বিচার বা বুদ্ধিও যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। একমাত্র স্বজ্ঞাই ধারণা, সত্য বা বস্তুর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটিয়ে তার প্রকৃতি বা স্বরূপ জানাতে পারে।

▶ জ্ঞান বলতে কী বোঝায়? (What is knowledge ?)

Ans. জ্ঞান বলতে বোঝায় একগুচ্ছ তথ্য যা কোনো কাজ করতে সরাসরি প্রয়োগ করতে হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টিকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যায়।

চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্নার জন্য জ্ঞানের অর্থ হল—চিংড়ি মাছের মালাইকারি প্রস্তুত করার জন্য কী কী উপকরণের প্রয়োজন, চিংড়ি মাছগুলি কীভাবে কাটতে হবে, কোন্ সময়ে কী পরিমাণে কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে বোঝা যাবে রান্না হয়ে গেছে ইত্যাদি। একইভাবে শিখন সম্পর্কে জ্ঞান বলতে বোঝায় শিখন কাকে বলে, শিখনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

সংক্ষেপে বলা যায়, জ্ঞান হল কোনো বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক তথ্য সকল।

▶ **দক্ষতা কী? (What is skill ?)**

Ans. দক্ষতা হল মনোসঞ্চালনমূলক (Psychomotor) কোনো কাজের পর পর্যবেক্ষণ গ্রাহ্য সফলতা বা সাফল্য। যেমন পূর্বের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায় কোনো গৃহিণী যদি নিজের হাতে এমন চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করে যা আহার করে সকলেই খুব ভালো হয়েছে বলে মন্তব্য করে, এক্ষেত্রে বলা হবে গৃহিণীর চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করার দক্ষতা আছে। সংক্ষেপে বলা যায় দক্ষতা হল ব্যাবহারিক দিক যা প্রমাণিত হয় পর্যবেক্ষণ দ্বারা (এক্ষেত্রে আস্বাদনের দ্বারা)।

▶ **শিক্ষণের সংজ্ঞা এবং অর্থ লিখুন। (Write the definition and meaning of teaching.)**

Ans. অভিধান অনুযায়ী শিক্ষণের সংজ্ঞা হল—কোনো কিছু জানার কারণ, জ্ঞান প্রদান করা বা উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশদান (to cause to know something, to impart knowledge or to instruct by example)।

শিক্ষণের অর্থ হল—এটি একটি প্রক্রিয়া যা তাত্ত্বিক ধারণা শিখতে সাহায্য করে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান সঞ্চালন ঘটায়। শিক্ষকের ভূমিকা হল শিখনে সাহায্য করা, আলোচনার নেতৃত্ব দান, মুক্ত প্রশ্ন (Open ended question) জিজ্ঞাসা করার সুযোগ সৃষ্টি করা, প্রক্রিয়া এবং কর্মসূচির নির্দেশদান এবং শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্যোগী করে তোলা।

▶ **তথ্য-এর অর্থ লিখুন। (Write the meaning of information.)**

Ans. ইংরেজি শব্দ 'Information'-এর উৎপত্তি হয়েছে লাতিন শব্দ 'informatio' থেকে, যার উৎপত্তি আবার 'informer' থেকে, যার অর্থ হল 'মনকে আকার প্রদান', নির্দেশ দান বা শিক্ষা দান। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তথ্যকে কতকগুলি সংকেতের পর্যায়ক্রম বলা যায়, যা একটি অর্থযুক্ত শব্দ নির্মাণ করে। ব্যাবহারিক অর্থে তথ্য হল কতকগুলি প্রতীকের একটি ছন্দ যা একটি অর্থযুক্ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হয়। আবার Date প্রক্রিয়াকরণকেও তথ্য বলে, যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বই, মাধ্যম বা অন্য কারো নিকট থেকে কিছু শোনে বা data সংগ্রহ করে এবং সেইগুলিকে যখন সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থবহ করে তখন সেইগুলি তথ্য হয়। এটা মনে রাখা প্রয়োজন তথ্য ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়।

Library D.El.Ed. College ESTD.—2009 D/Dinajpur

▶ **তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation between information and knowledge.)**

Ans. তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক হল—

1. জ্ঞান তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তথ্য ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়।
2. তথ্য আমাদের জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাইরে বিস্তৃত করে।
3. জ্ঞান এবং তথ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভুল হতে পারে।
4. মস্তিষ্কে সংরক্ষণের উপর জ্ঞান এবং তথ্য নির্ভর করে।
5. তথ্য হল পরিসংখ্যান বা ডেটার প্রক্রিয়াকরণ, আবার জ্ঞান হল সেই তথ্য যাকে ব্যবহার করা যায়।

▶ **তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। (Write the difference between information and knowledge.)**

Ans. জ্ঞান এবং তথ্যের সঙ্গে পার্থক্য হল—

1. তথ্য হল ডেটার (Data) প্রক্রিয়াকরণ, অপরদিকে জ্ঞান হল তথ্যক ব্যবহারের জন্য রূপদান করা।
2. তথ্য ডেটাকে (Data) সম্পর্কিত করে, সেখানে জ্ঞান একগুচ্ছ তথ্যের প্যাটার্ন পরীক্ষা করে।
3. জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন হল প্রজ্ঞামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা যেখানে তথ্যের জন্য প্রজ্ঞামূলক ক্ষমতার কোনো প্রয়োজন হয় না।
4. জ্ঞান কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত অপরদিকে তথ্য অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক।

▶ **কান্ট ও হেবারমাস কারণকে কটি ভাগে ভাগ করেছেন? (How many type of reason are divided by Kant and Habermas ?)**

Ans. কান্ট ও হেবারম্যান কারণকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—

1. **জ্ঞানমূলক-যান্ত্রিক কারণ (Cognitive Instrumental Reason):** বিজ্ঞানে এই ধরনের কারণ ব্যবহৃত হয়। কোনো ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা, নিয়ন্ত্রণ করা, পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহৃত হয়।
2. **নৈতিক ব্যাবহারিক কারণ (Moral-Practical Reason):** যখন আমরা স্বতঃপ্রণোদিত নৈতিক বা রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করি তখন এই ধরনের কারণ ব্যবহার করি।
3. **সৌন্দর্যানুভূতিমূলক কারণ (Aesthetic Reason):** শিল্প, সাহিত্য এবং বিশ্বকে নতুন ভাবে দেখার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— মান-5

▶ জ্ঞানের গঠন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। (Discuss about the process of knowledge building.)

Ans. 1-2 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জ্ঞান ও দক্ষতার সংজ্ঞাসহ সম্পর্ক আলোচনা করুন। (Discuss the relation between knowledge and skill with definition.)

Ans. 8-9 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জ্ঞান ও দক্ষতার মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the differences between knowledge and skill.)

Ans. 9-10 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিশ্বাস ও কারণের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the similarities and differences between belief and reason.)

Ans. 17-18 পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— মান-10

▶ জ্ঞানের উৎসগুলি লিখুন। (Write about the source of knowledge.)

Ans. 3-7 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা, অর্থ, পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য উল্লেখ করুন। (Mention the meaning, definition, relation and differences between teaching and training.)

Ans. 10-13 পৃষ্ঠা দেখুন।

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

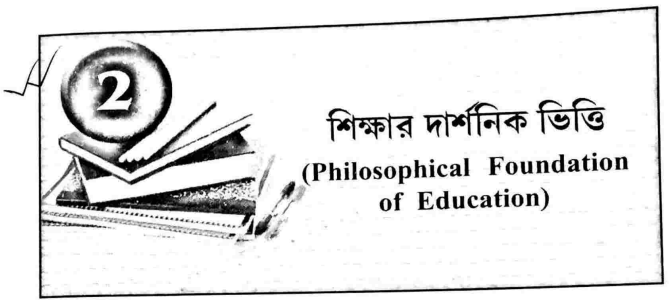

শিক্ষায় দার্শনিক তাৎপর্য
(Significance of Philosophy in Education)

শিক্ষায় দার্শনিক তাৎপর্য বুঝতে গেলে প্রথমে দর্শন ও শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

দর্শনশাস্ত্র (Philosophy)

দর্শন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Philosophy' দুটি লাতিন শব্দ Philo (যার অর্থ Love বা ভালোবাসা) এবং Sophia (যার অর্থ Knowledge বা জ্ঞান) থেকে এসেছে। অর্থাৎ Philosophy-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বা আসক্তি। শিক্ষাবিদ ***Raymont***-এর মতে, যে ব্যক্তির সব রকম জ্ঞানের প্রতি আসক্তি আছে অর্থাৎ যার জ্ঞানপিপাসা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না তিনিই হলেন প্রকৃত দার্শনিক।

জীবনের মূল উৎস ও উদ্দেশ্যকে খুঁজে বের করাই হল দর্শনের কাজ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণই দার্শনিকের কৌশলের ভিত্তি। যে-কোনো একক ঘটনার তাৎপর্য নয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দর্শনের কাজ।

সক্রেটিসের মতে, সত্যের সন্ধান ও সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হল দর্শন। জীবনের প্রয়োজন থেকেই দর্শনের জন্ম। জীবন কী? জীবনের উৎস কোথায়? পরিণতিই বা কী? এইভাবে জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন মানুষের বহু দিনের। দর্শনের মধ্যেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর নিহিত আছে। দর্শন জীবনের মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারণের চেষ্টা করে। মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনার প্রেক্ষিতে জীবনের প্রকৃত অর্থ অন্বেষণই হল দর্শনের লক্ষ্য।

শিক্ষা (Education)

শিক্ষা হল ব্যক্তির জীবন বিকাশের এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি প্রয়োজনমতো আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলে অর্থাৎ অভিযোজনে

প্রয়াসী হয়। এই পরিবেশ শুধুমাত্র জৈবিক পরিবেশ নয়—মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক (Relation between Education and Philosophy) উপরে উল্লিখিত দর্শন ও শিক্ষার অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দর্শন নির্ধারণ করে জীবনের উদ্দেশ্য—কী কী করণীয় এবং কী কী করণীয় নয়। আর শিক্ষা হল সেই উপায় বা হাতিয়ার যার দ্বারা দর্শন-নির্ধারিত জীবনের উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করা যায়। এই অর্থে দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কিত। জীবনকে ঘিরেই এই সম্পর্ক তৈরি হয়। মানুষের জীবনদর্শন শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিশক্তি বিভিন্নভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে।

দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে দার্শনিক ***Fitche*** সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ''The art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy.''

শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে এর তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিক

(Theoretical Relation between Education and Philosophy)

1. ***শিক্ষা ও দর্শনের স্বরূপ পরিবর্তন***—পূর্বে শিক্ষা শুধু জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষা বর্তমানে ব্যক্তিকে সুনাগরিক করে তোলার কৌশল। শিক্ষা সমস্যাবহুল জীবনকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। যে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিয়ে আসে সেই শিক্ষাই আমাদের লক্ষ্য।

   একইভাবে বর্তমানে দর্শনশাস্ত্র বাস্তববর্জিত, শুষ্ক বৌদ্ধিক জ্ঞানের সমষ্টি নয়। আধুনিক দর্শন বাস্তবধর্মী। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের চিন্তা এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শিক্ষা ও দর্শন উভয়ের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। উভয়ই ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যাসমাধান ও কল্যাণের কাজেই রত।

2. ***সমাজের মূল তথ্যগুলি নির্ধারণে দর্শন ও শিক্ষা***—বহু তর্কবিতর্কের পর দর্শন জীবনের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়; যেমন—আদর্শবাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি। এই তত্ত্বগুলির উপর ভিত্তি করেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

3. ***দার্শনিকের তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার***—শিক্ষার মাধ্যমেই দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটে। শিক্ষার মাধ্যমেই দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। আবার শিক্ষার অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি তার দার্শনিক ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

4. ***নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে দর্শন ও শিক্ষা***—শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল মূল্যবোধ গড়ে তোলা। পরিবর্তনশীল সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন স্বাভাবিক। এই পরিবর্তন দু-ভাবে সম্ভব হয়। প্রথমত, নতুন ও পুরোনো মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই মূল্যবোধ পরিবর্তনে দর্শন শিক্ষাকে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, পুরোনো মূল্যবোধের অসারতা উপলব্ধি করে নতুন মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে শিক্ষাকে গতিশীল করতেও দর্শন সাহায্য করে।

5. ***মহান দার্শনিকগণ ও মহান শিক্ষাবিদগণ***—শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সকল দার্শনিক শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়, পদ্ধতি প্রভৃতির উপর তাঁদের দর্শনের প্রভাব পড়েছে। রুশোর নেতিবাচক ও প্রকৃতিবাদী শিক্ষার তত্ত্ব তাঁর কৃত্রিমতাপূর্ণ সমাজবিরোধী দার্শনিক চিন্তার ফলশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর আশ্রমিক শিক্ষার মধ্যে। জন ডিউই-র প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ল্যাবোরেটরি বিদ্যালয়ে সমস্যাসমাধান পদ্ধতির মাধ্যমে।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কের ব্যাবহারিক দিক

(Relation of Practical Aspects between Education and Philosophy)

শিক্ষা একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। কতকগুলি পরিকল্পিত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষা-প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াগুলির উপর দর্শনের ভূমিকা আলোচনার মধ্য দিয়েই শিক্ষার উপর দর্শনের ব্যাবহারিক সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ—নির্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যতীত শিক্ষা কার্যকারী হয় না। শিক্ষার লক্ষ্য দেশ ও কালভেদে পরিবর্তনশীল। প্রতিটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। **নান**-এর মতে, ''Every scheme of education, being at bottom a practical philosophy, necessarily touches at every point.'' অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থাই একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। দার্শনিকগণ চিন্তা ও মননের সাহায্যে জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ কিছু মূল্যবোধ স্থির করেন। শিক্ষার লক্ষ্য হল সেই মূল্যবোধ বা লক্ষ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা। এইভাবে দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরকরণে ব্যাবহারিকভাবে সাহায্য করে।

পাঠক্রম রচনা—দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরকরণে সাহায্য করে, আর পাঠক্রম স্থির করে কীভাবে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করার পর দর্শন সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ অর্থাৎ পাঠক্রম রচনার রচয়িতাদের সাহায্য করে। তাই দেশ ও কাল ভেদে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন। তাই পাঠক্রম ছিল বিষয়কেন্দ্রিক। পরে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর বিকাশ। তখন পাঠক্রম হল শিশুকেন্দ্রিক বর্তমানে শিক্ষা হল সমগ্র জীবন।

প্রয়াসী হয়। এই পরিবেশ শুধুমাত্র জৈবিক পরিবেশ নয়—মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক (Relation between Education and Philosophy)

উপরে উল্লিখিত দর্শন ও শিক্ষার অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দর্শন নির্ধারণ করে জীবনের উদ্দেশ্য—কী কী করণীয় এবং কী কী করণীয় নয়। আর শিক্ষা হল সেই উপায় বা হাতিয়ার যার দ্বারা দর্শন-নির্ধারিত জীবনের উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করা যায়। এই অর্থে দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কিত। জীবনকে ঘিরেই এই সম্পর্ক তৈরি হয়। মানুষের জীবনদর্শন শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিশক্তি বিভিন্নভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে।

দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে দার্শনিক ***Fitche*** সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ''The art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy.''

শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে এর তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিক

(Theoretical Relation between Education and Philosophy)

1. ***শিক্ষা ও দর্শনের স্বরূপ পরিবর্তন***—পূর্বে শিক্ষা শুধু জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষা বর্তমানে ব্যক্তিকে সুনাগরিক করে তোলার কৌশল। শিক্ষা সমস্যাবহুল জীবনকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। যে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিয়ে আসে সেই শিক্ষাই আমাদের লক্ষ্য।

   একইভাবে বর্তমানে দর্শনশাস্ত্র বাস্তববর্জিত, শুষ্ক বৌদ্ধিক জ্ঞানের সমষ্টি নয়। আধুনিক দর্শন বাস্তবধর্মী। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের চিন্তা এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শিক্ষা ও দর্শন উভয়ের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। উভয়ই ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যাসমাধান ও কল্যাণের কাজেই রত।

2. ***সমাজের মূল তথ্যগুলি নির্ধারণে দর্শন ও শিক্ষা***—বহু তর্কবিতর্কের পর দর্শন জীবনের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়; যেমন—আদর্শবাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি। এই তত্ত্বগুলির উপর ভিত্তি করেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

3. ***দার্শনিকের তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার***—শিক্ষার মাধ্যমেই দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটে। শিক্ষার মাধ্যমেই দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। আবার শিক্ষার অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি তার দার্শনিক ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

4. ***নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে দর্শন ও শিক্ষা***—শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল মূল্যবোধ গড়ে তোলা। পরিবর্তনশীল সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন স্বাভাবিক। এই পরিবর্তন দু-ভাবে সম্ভব হয়। প্রথমত, নতুন ও পুরোনো মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই মূল্যবোধ পরিবর্তনে দর্শন শিক্ষাকে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, পুরোনো মূল্যবোধের অসারতা উপলব্ধি করে নতুন মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে শিক্ষাকে গতিশীল করতেও দর্শন সাহায্য করে।

5. ***মহান দার্শনিকগণ ও মহান শিক্ষাবিদগণ***—শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সকল দার্শনিক শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়, পদ্ধতি প্রভৃতির উপর তাঁদের দর্শনের প্রভাব পড়েছে। রুশোর নেতিবাচক ও প্রকৃতিবাদী শিক্ষার তত্ত্ব তাঁর কৃত্রিমতাপূর্ণ সমাজবিরোধী দার্শনিক চিন্তার ফলশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর আশ্রমিক শিক্ষার মধ্যে। জন ডিউই-র প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ল্যাবোরেটরি বিদ্যালয়ে সমস্যাসমাধান পদ্ধতির মাধ্যমে।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কের ব্যাবহারিক দিক

(Relation of Practical Aspects between Education and Philosophy)

শিক্ষা একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। কতকগুলি পরিকল্পিত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষা-প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াগুলির উপর দর্শনের ভূমিকা আলোচনার মধ্য দিয়েই শিক্ষার উপর দর্শনের ব্যাবহারিক সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ—নির্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যতীত শিক্ষা কার্যকারী হয় না। শিক্ষার লক্ষ্য দেশ ও কালভেদে পরিবর্তনশীল। প্রতিটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। **নান**-এর মতে, ''Every scheme of education, being at bottom a practical philosophy, necessarily touches at every point.'' অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থাই একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। দার্শনিকগণ চিন্তা ও মননের সাহায্যে জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ কিছু মূল্যবোধ স্থির করেন। শিক্ষার লক্ষ্য হল সেই মূল্যবোধ বা লক্ষ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা। এইভাবে দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরকরণে ব্যাবহারিকভাবে সাহায্য করে।

পাঠক্রম রচনা—দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরকরণে সাহায্য করে, আর পাঠক্রম স্থির করে কীভাবে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করার পর দর্শন সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ অর্থাৎ পাঠক্রম রচনার রচয়িতাদের সাহায্য করে। তাই দেশ ও কাল ভেদে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন। তাই পাঠক্রম ছিল বিষয়কেন্দ্রিক। পরে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর বিকাশ। তখন পাঠক্রম হল শিশুকেন্দ্রিক বর্তমানে শিক্ষা হল সমগ্র জীবন।

ফলে পাঠক্রম হল জীবনকেন্দ্রিক। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ সবেরই পশ্চাতে আছে দার্শনিক চিন্তাধারা। শিক্ষাবিদ ব্রিগন (Briggn) পাঠক্রম রচনায় দার্শনিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "It is here that the education seriously need leaders who hold a sound and comprehensive philosophy of which they can convince others and who can direct its consistent application to the formulation of appropriate curricula." অর্থাৎ এখানে (অর্থাৎ পাঠক্রমে) প্রয়োজন হল এমন নেতৃত্বের, যার দার্শনিক ভিত্তি খুবই দৃঢ়। অপরের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে এবং উপযুক্ত পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে এর সঠিক ব্যবহার সক্ষম।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন—শিক্ষায় দর্শনের ব্যাবহারিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অন্যতম বিষয়। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার সময় তার উদ্দেশ্য, মান (Standard) ও নীতি নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। পুস্তকে যথেষ্ট ছবি, উদাহরণ থাকবে কি না, কী ধরনের ছবি বা উদাহরণ থাকা উচিত, পুস্তকের ভাষা কী হবে ইত্যাদি বিষয়ে দর্শন শিক্ষাকে ব্যাবহারিকভাবে সাহায্য করে।

শিক্ষণ পদ্ধতি—শিক্ষণ পদ্ধতি হল, যে উপায় বা কৌশলের সাহায্যে পাঠ্যবিষয় বা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'Methodology' বলে। প্রতিটি শিক্ষণ পদ্ধতি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাববাদী দর্শনে আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) এবং বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)-র উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে প্রয়োগবাদী দর্শনে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃতি অধ্যয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এইভাবে দর্শন শিক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

শৃঙ্খলার প্রকৃতি নির্ধারণ—শৃঙ্খলা রক্ষা শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কীভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে সেক্ষেত্রে দর্শনের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। প্রাচীনকালে শৃঙ্খলা রক্ষার উপায় ছিল, "Spare the rod spoil the child"। প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন, প্রকৃতির দণ্ডবিধানের মাধ্যমেই প্রকৃত শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি হয়। "আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে"—এই শিক্ষা শিশু আগুনে হাত দিয়েই শিখবে। ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, শৃঙ্খলা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া উচিত। কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই শিশু শিখবে কী তার করা উচিত, কী নয়। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন, শৃঙ্খলাবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসবে। শৃঙ্খলার উপযোগিতা উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা মেনে চলবে। এইভাবে শৃঙ্খলা কীভাবে রক্ষিত হবে সে সম্পর্কে ভাববাদী, প্রকৃতিবাদী, প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শিক্ষা প্রশাসন—শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রেও দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় শিক্ষা প্রশাসনে থাকবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব। শিক্ষক প্রতিনিধি, ছাত্র

প্রতিনিধি, অশিক্ষক প্রতিনিধি, অভিভাবক প্রতিনিধি সকলেই। একনায়কতন্ত্রে যেখানে প্রধান শিক্ষকই সর্বেসর্বা। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

শিক্ষাদার্শনিকদের মতবাদ
(Tenets of Philosophers in Education)

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষায় মতবাদ বা নীতিসমূহ বলতে বোঝায় শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি।

কোনো বিশেষ শিক্ষাদার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার বক্তব্যকেই সেই শিক্ষা দার্শনিকের মতবাদ (tenet) বলে। এরই ভিত্তিতে নিম্নে স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, জন ডিউই, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতবাদ উল্লেখ করা হল।

✓ স্বামী বিবেকানন্দ
(Swami Vivekananda, 1863–1902)

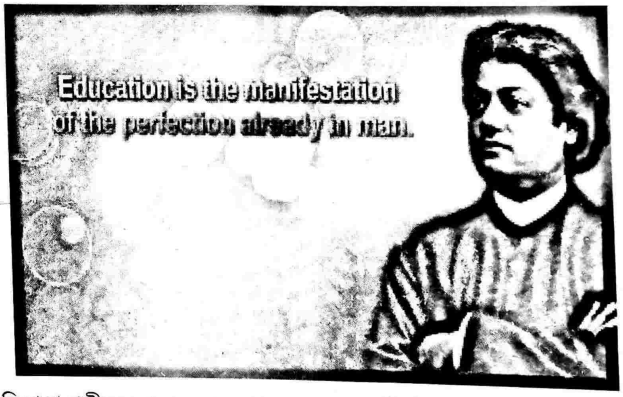

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং যাঁদের মেধা ও ব্যক্তিত্ব ভারতের জাতীয় জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। তিনি উত্তর কলকাতার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে 1863 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ ***W W Hastie*** বলেন, "Narendranath is really a genius. He is bound to make his mark in life."

1893 খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। তাঁর বক্তৃতা আমেরিকায় এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। দীর্ঘ চার বছর তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত ধর্ম প্রচার করেন।

তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। 1902 খ্রিস্টাব্দের 4 জুলাই মাত্র 39 বছর বয়সে তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় দেহরক্ষা করেন।

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি (Spiritual Perception)

বিবেকানন্দ কলেজে শিক্ষাকালে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা উপলব্ধি করেন। তিনি সর্বপ্রথম কলেজের অধ্যক্ষ Mr. Hastie-র কাছ থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্পর্কে জানেন এবং তাঁর কাছ থেকে এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে এবং তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে পরিচিত হন। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার ফলে তিনি যে কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তা নয়, পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করলেন এবং ভারতবাসীকে সেই উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হতে আহ্বান জানালেন।

বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন (Vivekananda's Philosophy of Life)

দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে বিবেকানন্দ হলেন ভাববাদী দার্শনিক। মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব। বিবেকানন্দ ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি হল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে গুরুত্ব দিলেও, তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় বেদান্তের মিলন ঘটাতে তিনি বলেছেন, "What we want are western science coupled with Vedanta." অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য হল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তকে সমন্বয় করা। ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষিত করতে হলে ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে গেলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাকে আয়ত্ত করা প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করতেন।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধি থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন—"Education is the mainfestation of perfection already in man." অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মহত্ত্বের প্রকাশই হল শিক্ষা। তাঁর মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের বিষয়। বাইরে থেকে শিশুর ভেতরে জ্ঞান সঞ্চালন করা যায় না। এ সম্পর্কে স্বামীজি একটি সুন্দর

কথা বলেছেন—চকমকি পাথরের মধ্যে আগুন জ্বালার সম্ভাবনা আছে বলেই ঘর্ষণের ফলে তা জ্বলে ওঠে। আগুন বাইরের থেকে আসে না। শিক্ষক শিক্ষার সাহায্যে চকমকি রূপ শিক্ষার্থীর মধ্যকার জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচিত করবেন। শিক্ষার্থীর মনের মধ্যেই জ্ঞান সঞ্চিত আছে। যার প্রকাশের জন্য অনুভাবনের প্রয়োজন। বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তাঁর দেয় শিক্ষার সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার সংজ্ঞায় তাঁর উল্লিখিত দুটি শব্দের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই দুটি শব্দ হল 'Perfection' (মহত্ত্ব) এবং 'Manifestation' (প্রকাশ)। 'মহত্ত্ব' বলতে ব্যক্তির গুণাবলির কথাই বলেছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাশীল বিবেকানন্দ ব্যক্তির মধ্যে সব কিছুকেই মহৎ বলে মনে করেন। ব্যক্তির মধ্যে এই মহৎ গুণাবলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাই বলে। 'প্রকাশ' শব্দটির তাৎপর্য হল কোনো কিছু ব্যক্ত বা পরিস্ফুট করার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তির মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ বিবেকানন্দ শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

এইভাবে বিবেকানন্দ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজ চেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন। বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য মস্তিষ্কে তথ্য প্রবেশ করানো যা সারাজীবনে হজম হল না, মাথার মধ্যে অসংবদ্ধভাবে ঘুরতে লাগল তা নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল জীবন গঠন, মানুষ তৈরি করা, চরিত্র গঠন করা, চিন্তাভাবনা সকল পরিপাক করা (Education is not the amount of information that is put into your train and runs riot there undigested all your life. We must have life building, man-making, character-making assimilation of ideas)। তিনি আরও বলেছেন—শিক্ষা সৃজনশীলতা, মৌলিকত্ব এবং উৎকর্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করবে "Education should lay proper emphasis on creativity, originality and excellence"।

তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন—সব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানুষ তৈরি করা, সমস্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও শেষ কথা হল মানুষের বিকাশ (The end of education, all training should be man-making. The end and aim of all training is to make the man grow)।

পাঠক্রম (Curriculum)

বিবেকানন্দ পাঠক্রম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেননি। শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের পাঠক্রমের প্রয়োজন এ সম্পর্কে তিনি একটি চারাগাছের মহিরুহ হয়ে ওঠার সঙ্গে শিশু শিক্ষার্থীদের বড়ো হওয়ার তুলনা করেছেন। তাঁর মতে চারাগাছের মহিরুহ হওয়ার শক্তি নিজের মধ্যেই বর্তমান। শুধু প্রয়োজন মতো রৌদ্র, জল ও বায়ুর জোগান দিতে হবে এবং অন্য কেউ যাতে গাছটিকে নষ্ট না করে তার জন্য গাছের চারিদিকে বেড়া দেওয়া

প্রয়োজন। শিশুশিক্ষার্থীও নিজের শক্তিতে ক্রমশ বড়ো হয়। শুধু দেহ ও মনে পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করতে হবে এবং তার আত্মবিকাশ যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য বাধাগুলির হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে।

স্বামীজির মতে শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠিত হবে, মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে, বুদ্ধির সম্প্রসারণ ঘটবে এবং মানুষ হবে আত্মনির্ভরশীল। তাই পাঠক্রম হবে এমন যা চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে, মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হবে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে এবং ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবে।

পাঠক্রম রচনার মূলনীতি প্রসঙ্গে স্বামীজি সেই সময়কালের জাতীয় প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জনগণের জীবনের উপযোগী পাঠক্রম রচনা করতে হবে। তারা যাতে আত্মনির্ভর, কর্মক্ষম, স্বাধীন ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে।

পাঠক্রমে কী কী বিষয় থাকবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু না বললেও তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে দেখা যায় তিনি পাঠক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা, মাতৃভাষার চর্চা, সংস্কৃত চর্চা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান, সংগীত প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি কারিগরি ও শিশুশিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর পাঠক্রমে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষা পদ্ধতি (Teaching Method)

শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে স্বামীজি একাগ্রতার (concentration) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, মনের একাগ্রতাই হল শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি আরও বলেছেন যে, এই একাগ্রতা আনয়নের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্রিকরা একাগ্রতা প্রয়োগ করেছিলেন বহির্জগতে। অন্যদিকে হিন্দুরা একাগ্রতা স্থাপন করেছিলেন অন্তর্জগতে। ফলে গ্রিকরা যেমন—শিল্প, সাহিত্যে উৎকর্ষতা অর্জন করেছিলেন ভারতবাসী তেমনই যোগশাস্ত্রে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই যোগের সাহায্যে মনকে কেন্দ্রীভূত করে একাগ্রতার অনুশীলন করা যায়। এ জন্য তিনি প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।

একাগ্রতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বামীজি আত্মসংযমী জীবনযাপনের কথা বলেছেন। ব্রহ্মচর্য ছাত্রজীবনে একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বামীজি মাতৃভাষার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে সুপারিশ করেছেন।

শিক্ষা সম্পর্কে উপরোক্ত মতবাদগুলি ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময়ের ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রসঙ্গে জনশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যা পরে আলোচনা করা হবে।

মহাত্মা গান্ধি
(Mahatma Gandhi, 1868–1948)

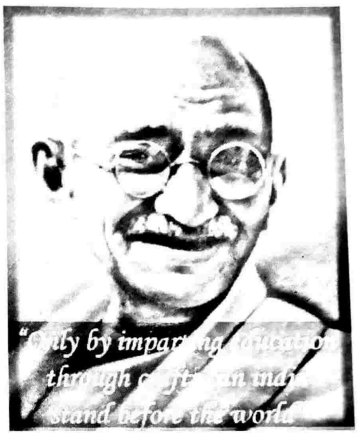

মহাত্মা গান্ধি ছিলেন আধুনিক জগতে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তি। পরাধীন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে গান্ধিজির দান অপরিসীম। তিনি যে শুধুমাত্র সমগ্র জাতিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তা নয়, ভারতবাসীর নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁর সমস্ত জীবন নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর জীবনের দুটি আদর্শ ছিল—সত্য এবং অহিংসা। তিনি মনে করতেন সত্য এবং অহিংসা ছাড়া কিছুতেই মানবজাতি ও মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না। তাঁর স্বপ্নের সমাজ ছিল শ্রেণিহীন, শোষণহীন, অহিংস ও বিকেন্দ্রীকৃত। প্রকৃতপক্ষে গান্ধিজি ছিলেন ব্যাবহারিক বাস্তববাদী।

জীবনদর্শন (Philosophy of Life)

গান্ধিজি ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক মানুষ একই ব্রহ্মের অংশ। তাঁর মতে জীবনের উদ্দেশ্য হল সেই স্রষ্টা পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। তিনি বলেছেন, আত্মোপলব্ধি হল ভগবানকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়। তিনি তাঁর এই সকল চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে জীবনের সকলক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন—সত্যাচরণ, প্রেম ও অহিংসা। তিনি মনে করতেন অহিংসা ও প্রেমের বন্ধনে সমগ্র মানুষকে আবদ্ধ করতে পারলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এটি ছিল তাঁর জীবনদর্শনের মূলকথা।

সমাজদর্শন (Philosophy of Society)

গান্ধিজির জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে তাঁর সমাজদর্শন গড়ে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতিকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে হলে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন প্রতিটি মানুষ যদি পারস্পরিক আন্তরিকতা বজায় রেখে পাশাপাশি বসবাস করে তবেই সমাজের উন্নতি ঘটবে। তিনি এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিজ বিকাশের জন্য সমান সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও সামাজিক উন্নতির জন্য তিনি অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের কথা বলেছিলেন। সবশেষে সমাজজীবনের উন্নতির জন্য তিনি নাগরিকতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক নাগরিককে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে করে সে সমাজে তার নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। গান্ধিজির শিক্ষা-দর্শন তাঁর এই সমাজ দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

গান্ধিজির শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Gandhiji's Ideal Education and Aim of Education)

গান্ধিজি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ এবং আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। শিক্ষা বলতে তিনি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তার বিকাশসাধন করা। এই লক্ষ্যকে তিনি শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নাগরিকতা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন শ্রমবিমুখ ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখাতে হবে। তাই তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এই ধরনের শিক্ষা চারিত্রিক দৃঢ়তা এনে দেবে এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করতে সাহায্য করবে। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ebook.dascoaching.in

পাঠক্রম (Curriculum)

গান্ধিজির মতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া দরকার। তিনি বলেছেন পাঠক্রমে এমন সব বিষয়কে নির্বাচন করতে হবে যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সমাজ জীবনের সম্পর্ক আছে। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়গুলি শিশুর সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ও উপস্থাপিত হবে। তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং মাতৃভাষাকে পাঠদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তশিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্তশিল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে অন্যদিকে গ্রামের জীবনের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ

ও শ্রদ্ধা জন্মাবে। এ ছাড়াও সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। গান্ধিজির পাঠক্রম সংক্রান্ত এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। গান্ধিজির প্রস্তাবিত পাঠক্রমটি হল—(i) মূল বিষয়—সুতা কাটা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ, কাগজের কাজ। (ii) মাতৃভাষা—পাঠ্যবিষয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চর্চা। (iii) গণিত—কেবলমাত্র ব্যাবহারিক গণিত। (iv) সমাজবিদ্যা—ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান। (v) সাধারণ জ্ঞান—বিজ্ঞানের সব শাখার প্রয়োজনীয় ও ব্যাবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা। (vi) ছবি আঁকা। (vii) সংগীত। (viii) বাধ্যতামূলক শরীরচর্চা।

গান্ধিজি বিশ্বাস করেন এই ধরনের পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করা সম্ভব হবে এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

গান্ধিজির শিক্ষণ পদ্ধতি (Gandhiji's Teaching Method)

গান্ধিজি তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে অনুবন্ধ প্রণালীকে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শেখাতে হবে। তাঁর পদ্ধতি একদিকে যেমন সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে তিনি অনুবন্ধ প্রণালীকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুতাকাটা একটি ক্রাফট্। এই ক্রাফট্ বা হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে এর প্রধান উপাদান 'তুলো' কোথায় উৎপন্ন হয়, কী পরিবেশে এবং কী জলবায়ু তুলো উৎপাদনে অনুকূল, তুলো কী প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে সুতা তৈরি হয়, সুতা তৈরির ইতিহাস কী প্রভৃতি শেখানোর মধ্য দিয়ে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর জ্ঞান সঞ্চালন করা যেতে পারে। অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা এবং আগ্রহ বজায় থাকে। গান্ধিজির হস্তশিল্পভিত্তিক অনুবন্ধ শিক্ষাদান-পদ্ধতি আধুনিক মনোবিদ্যার যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। তিনি আরও বলেছেন হস্তশিল্পটি কী হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক। তিনি বলেছেন, জ্ঞান মনের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করে। তাই মানুষের মন একটি মূল জ্ঞানকে ভিত্তি করে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এর জন্য তিনি হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান উপস্থাপন করার কথা বলেছেন। ***John Dewey***-র Project পদ্ধতির সঙ্গে গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। Project পদ্ধতিতে বিশেষ একটি Project-এর মাধ্যমে যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করা হয়, তেমনি গান্ধিজির প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষাতেও একটি বিশেষ হস্তশিল্পের সাহায্যে অন্যান্য জ্ঞান সরবরাহ করা হয়।

গান্ধিজির শিক্ষক সম্পর্কিত ধারণা (Gandhiji's Concept about Teacher)

শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। এই ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "We must procure the best teachers for our

children, whatever it may cost." অর্থাৎ যে মূল্যেই হোক না কেন, আমরা আমাদের শিশুদের জন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষকসংগ্রহ করব। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার্থীরা বই অপেক্ষা শিক্ষকের কাছ থেকে অনেক বেশি শিখবে। গান্ধিজি বিবেকানন্দের ন্যায় 'Character building education'-এ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন সমস্ত জ্ঞানের শেষ কথা হল চরিত্র গঠন। গান্ধিজি বলেছেন—"The primary aim of all education is or should be, the moulding of the character of pupils and a teacher who has a character to keep need not lose heart." সব রকমের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন। চরিত্রবান শিক্ষকের এক্ষেত্রে সমস্যা নেই। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "I have found that boys imbribe more from the teacher's own lives than they do from the books that they read to them." অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের জীবন থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করে শিক্ষকের পাঠদানের বিষয় থেকে তা লাভ করে না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে তিনি উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকেন।

শিক্ষা সম্পর্কে উপরোক্ত মতবাদগুলি ছাড়াও গান্ধিজি তদানীন্তন সময়ের ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রসঙ্গে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে যা বলেছেন তা পরে আলোচনা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(Rabindranath Tagore, 1861–1941)

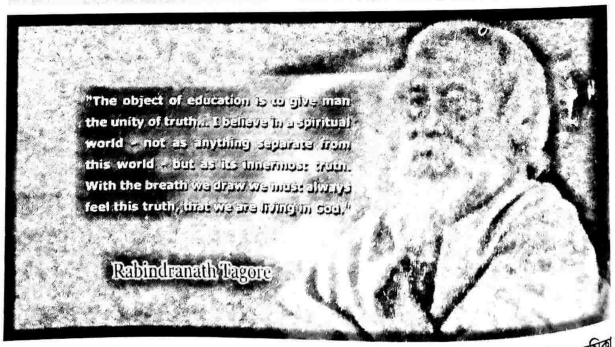

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই পরিবারের সন্তান, যিনি সমগ্র পৃথিবীতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও

শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল এবং সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা তাঁকে নাড়া দিত। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হল মোক্ষ। তিনি বৈদিক উপনিষদ জ্ঞানের ধারণা 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' (*Sa Vidya Ya Vimuktaye*) বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে করতেন জ্ঞানই মানুষকে সকল রকম বন্ধন থেকে মুক্ত করবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন (Rabindranath's Philosophy of Life)

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি ছিলেন ভাববাদী। তিনি মনে করতেন, সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি সৃষ্টির মধ্যেই সতত প্রকাশমান এবং সবকিছুর মধ্যেই এই সত্তা প্রকাশিত। একে তিনি বলেছেন বিশ্বচেতনা। এই বিশ্বচেতনা সুসামঞ্জস্য রূপে সর্বত্র বিরাজমান। এই বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা মানুষ সবসময় করে এবং পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমে তাকে লাভ করে। মানুষ এই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম জেনে নিজের নিয়মেই বিকাশ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূল বক্তব্য হল—বিশ্ববৈচিত্র্যের মাঝে এক শক্তি বিরাজ করছে। বহু বৈচিত্র্যের মাঝে তার ঐক্যের যে নিয়ম, সেই নিয়ম জেনে আনন্দ রূপে তাকে লাভ করাই হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। তিনি বলেছেন, "আমাদের জীবনে যা অতিরিক্ত, তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনাকে বিচ্ছেদবোধের মায়া থেকে মুক্ত করেন।" এই মুক্তিই হল ভারতীয় দর্শনের মূল কথা এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূল বক্তব্য। তাঁর এই জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাঁর শিক্ষাচিন্তা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার লক্ষ্য
(Rabindranath's Model Education and Aim of Education)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। কিন্তু মানবজীবনের এমন কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নেই, যেখানে তাঁর চিন্তার ছোঁয়া লাগেনি। মানব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। শিক্ষাও তার থেকে বাদ পড়েনি। তাঁর শিক্ষাচিন্তা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি নিজেই তাঁর প্রয়োগ করে গেছেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব বিশেষভাবে বাস্তববাদী। তিনি একদিকে যেমন ভাববাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন, অন্যদিকে প্রয়োগের সময় দেখা যায় তিনি প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সেই শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা, যা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।

তিনি গতানুগতিক শিক্ষাকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন তার মধ্যে আমাদের দেশের রীতিনীতি, আদর্শ কোনো কিছুকে স্থান দেওয়া হয়নি। তিনি বলেছেন বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। তিনি ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগ স্থাপন করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে—

1. **বিকাশ**—স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশই হবে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তাই তিনি বলেছেন, "যে শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদেরও সমস্ত দুঃখ দুর্গতির অবসান ঘটতে পারে।" শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করাই হল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।
2. **দৈহিক বিকাশ**—পাঠের বোঝা শিক্ষার্থীদের নিকট দুঃসহ হয়ে উঠেছে। জ্ঞানসম্পদ সঞ্চয় করতে গিয়ে স্বাস্থ্যসম্পদ হারানোকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। কবি তাই শিক্ষার্থীদের দৈহিক সম্পদের দিকে নজর দিতে বলেছেন। এজন্য তিনি তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় মুক্ত প্রকৃতিতে খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা বলেছেন।
3. **নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ**—রবীন্দ্রনাথের মতে, যে সর্বব্যাপী পরম সত্তা ছায়ার মতো আমাদের সহগামী তাঁকে উপলব্ধি করাই সকল প্রকার শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তিনি বলেছেন—

   "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
   চরণ ধুলার তলে।"
4. **সামাজিক গুণাবলির বিকাশ**—স্বামী বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়েই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটে। তাই শৈশব থেকেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষকে ভালোবাসা, আর্তকে সেবা করা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে।
5. **জনশিক্ষা বিস্তার**—শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জনশিক্ষা বিস্তারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

পাঠক্রম (Curriculum)

পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বিদ্যালয়কে মানবসংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তিনি সেই সমস্ত বিষয়কে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে মানবসংস্কৃতি প্রতিফলিত হবে। তিনি পাঠক্রমে ভাষা ও সাহিত্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুস্থ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য তিনি পৃথকভাবে রামায়ণ, মহাভারত পাঠের কথা

বলেছেন। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানসাধনাকে তিনি পাঠক্রমে গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীত, বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লিহিত সাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।" ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি মাতৃভাষার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখারও পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি খেলাধুলা, গান, বাগানের কাজ, গল্প বলা, হাতের কাজ প্রভৃতিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method of Rabindranath)

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষণ পদ্ধতির উল্লেখ করেননি। তবে তিনি ইন্দ্রিয়ানুশীলন, প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, সৃজনধর্মী কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষক তাঁর প্রয়োজনমতো পদ্ধতি উদ্ভাবন করে পড়াবেন। তিনি প্রাচীন তপোবনের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে সেখানে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। শ্রেণিশিক্ষণের গতানুগতিক প্রথার পরিবর্তে তিনি প্রকৃতির খোলা আকাশের নীচে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যালয়ে যৌথ জীবনযাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণ পদ্ধতির মূলকথা হল, শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তবে তিনি শান্তিনিকেতনে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালনের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তিনি সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি সহজ-সরলভাবে সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখাতে হবে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য হল—আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হল পরভাষায় শিক্ষা, শিক্ষায় পরধর্ম, মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার স্বাভাবিক মাধ্যম। স্বাভাবিক বাহন। "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।" ইংরেজি ভাষা মাধ্যমের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—ইংরেজি ভাষার মাধ্যম হওয়াতে ছাত্রদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় ভাষা শিক্ষায়। উপরন্তু এই শিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় দেশের জনসাধারণের নিকট এই ভাষা পৌঁছোয় না। মাতৃভাষায় শিক্ষা নয় বলে শিক্ষালয়ে বিষয়গুলি প্রাণের সামগ্রী হয়ে ওঠে না। 'শিক্ষিতরা' অশিক্ষিতই থেকে যায়।

শিক্ষক সম্পর্কে ধারণা (Concept about Teacher)

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার ধারা' প্রবন্ধে শিক্ষক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষ মানুষের কাছ থেকে শিখতে পারে, যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলে উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণের সঞ্চারিত হয়।" তিনি মনে করতেন শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়ক হবেন। তপোবনের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিক্ষককে 'গুরু' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে বলেছেন, "গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন।"

তিনি মনে করতেন, শিক্ষকের দান শুধু কর্তব্যবোধ থেকে উৎসাহিত হওয়ার নয়। তাঁর দান যুক্তির দান। জাত-শিক্ষক সব সময় আনন্দের সঙ্গে, অন্তরের ভালোবাসায় যা পেয়েছেন তাই অকৃপণভাবে দান করবেন। ভরে তুলবেন শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু ও পথপ্রদর্শক।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য ও ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তাহলে যারা পায় তারা হত ..., যারা দেয় তারা হত ...।"

বিশ্বকবি এবং মহান শিক্ষা দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ের (সম্ভবত বিশ্বের) এবং আগামী দিনের শিক্ষার একটি রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন, যেমন—জনশিক্ষা, নারী শিক্ষা, শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর স্থাপন এবং তার শিক্ষাব্যবস্থা, যা পরে আলোচনা করা হবে।

শ্রীঅরবিন্দ (Sri Aurobindo, 1872-1950)

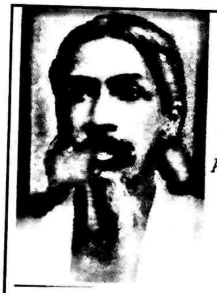

"...Like the majority of educated Indians, I have passively accepted without examination, the conclusion of European scholarship."

"...That we turn always the few distinct truths and the symbols or the particular discipline of a religion into a hard and fast dogmas, is a sign that as yet we are only infants in the spiritual knowledge and are yet far from the science of the Infinite."

"...The mind is not the highest possible power of consciousness; for mind is not in possession of Truth, but only its ignorant seeker."

শ্রীঅরবিন্দ 1872 খ্রিস্টাব্দে 15 আগস্ট কলকাতার নিকট কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 5 বছর বয়সে তাঁকে দার্জিলিং কনভেন্টে পড়তে পাঠানো হয়। 7 বছর বয়সে তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় এবং তিনি সেখানে 14 বছর থাকেন। উজ্জ্বল ছাত্রজীবন শেষ

ebook.dascoaching.in

করে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service) পরীক্ষায় (তাত্ত্বিক) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপতার জন্য তিনি ব্যাবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি। তিনি 'Special Tripose' (তিনটি Subject এ অনার্স) অর্জন করেছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Trinity College থেকে। 1893 খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং বরোদা কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এখানে এসে তিনি ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বালগঙ্গাধর তিলকের বিপ্লবী মনোভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

1905 খ্রিস্টাব্দে তিনি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দুটি দিক আছে। একদিকে তিনি গোপনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন, অপরদিকে তিনি প্রেস ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রচার শুরু করেন।

তাঁর বিপ্লবী মনোভাব প্রকাশ পায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে। 1906 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত Bengal National College-এ অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি যোগদান করেন। সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য 1908 খ্রিস্টাব্দে তিনি এক বছরের জন্য কারাবরণ করেন। 1909 খ্রিস্টাব্দে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি গভীরভাবে গীতা এবং উপনিষদের চর্চায় মগ্ন হন এবং তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। এই সময় থেকে তিনি যোগসাধনা শুরু করেন এবং অতি উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ ঋষি অরবিন্দ বলে পরিচিত হন। তাঁর অধ্যাত্মবাদ বাস্তব রূপ পায় পণ্ডিচেরিতে এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন (Sri Aurobindo's Philosophy of Education)

শ্রীমদ্ভাবগত গীতাকে তিনি জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনকে তিনি 'Yoga' হিসাবে দেখেছেন। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাঁর দর্শন চিন্তার দুটি মূল দিক হল মানুষ এবং সমাজ। তিনি মনে করতেন কোনো একটি সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর করে সেই সমাজের প্রকৃতি এবং সেখানে যেসব মানুষ বাস করে তাদের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক মানের উপর। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক জীবনের জন্য মানুষকে তৈরি করা। তিনি আত্মা এবং বিষয়কে যুক্ত করেছিলেন। তাই একই সঙ্গে তাঁকে ভাববাদী এবং বস্তুবাদী বলা যায়। তিনি মনে করতেন শিক্ষা হল অন্তরাত্মাকে আলোকিত করার উৎস যা মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। তাই বলা যায়, শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন বর্তমানের চাহিদা সমন্বয়ী ধারণাকে বিশেষভাবে পরিপূরণ করে। দর্শনের যে চরম সত্য তাকে অবশ্যই বর্তমানের চাহিদা মেটাতে হবে। এই সময়ের দাবি হল আশাবাদ ও নৈরাশ্যবাদের সমন্বয়। এটিই বর্তমান জীবন এবং শিক্ষার সর্বাপেক্ষা গতিশীল দিক।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দার্শনিক হিসাবে ঋষি অরবিন্দ হলেন ভাববাদী এবং তাঁর ভাববাদ সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেছেন, "Life in its largest sense is the great web of our internal and external action, the play of Shakti, the play of Karma it is religion and philosophy, thought and science, poetry and art, drama and song, dance and play, politics and society, industry, commerce and trade, adventure and travel, war and peace, conflict and unity, victory and defeat, aspiration and vicissitudes and the thoughts, emotional words, deeds, joys and sorrows which make-up the existence of man."

শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of Education)

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন প্রাচীন ভারতীয় বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বারা সম্পৃক্ত।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল—

(i) তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বয়ী ধারণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর বিকাশ। শিক্ষার সমন্বয়ী ধারা গঠিত হয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের দ্বারা এবং এখানে প্রত্যেককে তার সঠিক স্থান দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং আরও অন্যান্য শিক্ষাবিদ শিক্ষার সমন্বয়ী ধারণাকেই মেনে নিয়েছেন। তবে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষার সমন্বয়ী ধারণাকে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাচিন্তায় একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অপরদিকে তেমনি আত্মা এবং বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সবগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি যোগ শিক্ষাকে পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বর্ণনা করেছেন।

(ii) ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার লক্ষ্যের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হল ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত অর্থাৎ বন্ধন থেকে মুক্তি এবং আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত অর্থাৎ শিক্ষাই হল জীবন। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাচিন্তায় এই ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের সমন্বয় ঘটেছে।

(iii) শ্রীঅরবিন্দ মানুষের প্রকৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন স্বর্গীয় অনুভব মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। তিনি শিশুর স্বর্গীয় উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই স্বর্গীয়তার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধিও মানুষের প্রকৃতির এই দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(iv) তাঁর মতে, শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হল মানুষ তৈরি করা। তাঁর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল মানুষের অভিব্যক্তি। এই উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিচেরিতে 1952 খ্রিস্টাব্দের 24 এপ্রিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মানব জাতিকে একসূত্রে গাঁথা।

(v) তিনি আরও মনে করতেন শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানুষের মন ও আত্মার গঠন ও তার বিকাশ। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যার মধ্য দিয়ে এইগুলির বিকাশ ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ, শরীর গঠন, চরিত্র গঠন, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং যোগ শিক্ষা। নৈতিক বিকাশ ও নান্দনিক বিকাশ তাঁর মতে পাশাপাশি চলা দরকার।

(vi) তিনি ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের মতে মূল্যবোধের শিক্ষা
(Value Education According to Sri Aurobindo)

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমশ পুরোনো মূল্যবোধগুলি প্রতিস্থাপিত হচ্ছে নতুন মূল্যবোধের দ্বারা। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলির চর্চার প্রয়োজন। তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্যবোধ হল ঐক্য। অন্যান্য মূল্যবোধগুলি হল আধ্যাত্মিকতা, পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি। এই সমস্তগুলিরই বিকাশ এবং পরিচর্যার প্রয়োজন। বিকাশের জন্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মূল্যবোধ হল সাধুতা বা অকপটতা। শ্রীঅরবিন্দের মতে শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ।

পাঠক্রম এবং অধ্যয়নের বিষয়সমূহ (Curriculum and Subjects of Reading)

শ্রীঅরবিন্দর শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয় এবং কার্যসূচিগুলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে।

1. *শারীরশিক্ষা*—শ্রীঅরবিন্দর শিক্ষাচিন্তায় শারীরশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যায়াম, খেলাধুলা, জিমন্যাস্টিক, সুষম খাদ্য এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
2. *সপ্রাণ শিক্ষা*—শিক্ষার্থীদের প্রাণশক্তি উন্নত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সংগীত, শিল্প, নৃত্য, নাটক, ব্যালে প্রভৃতিতে অংশগ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। এর ফলে স্বাধীনতা, নেতৃত্বদান, দায়িত্ব গ্রহণ এবং কর্মের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণে প্রাণশক্তি ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ পায়।
3. *মানসিক শিক্ষা*—বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়নের সাহায্যে যেমন—সাহিত্য, গণিত, (শুদ্ধ এবং ফলিত), সমাজবিজ্ঞান, শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান মানসিক শক্তির বিকাশ করতে হবে।
4. *আধ্যাত্মিক শিক্ষা*—আশ্রম এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে আধ্যাত্মিক পরিবেশের উপর শ্রীঅরবিন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমস্ত ধরনের পাঠক্রমিক ও সহ-

পাঠক্রমিক কার্যসূচির লক্ষ্য হবে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। যেমন—প্রেম, সততা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, মন এবং হৃদয়ের শক্তিকে বৃদ্ধি করা।

5. *আন্তর্জাতিক শিক্ষা*—সর্বজনীন সম্প্রীতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সুসম্পর্ক শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত 'The International Centre' শিক্ষার মাধ্যমে এই আদর্শ বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্বে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই কেন্দ্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে রত। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাংস্কৃতিক বিনিময়, আদানপ্রদান এক আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার সৃষ্টি করে।

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা (Moral and Religious Education)

মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ নির্ভর করে তার নৈতিক এবং প্রাক্ষোভিক প্রকৃতির উপর। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে তিনি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। তবে এই দুটি বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। তিনি মনে করতেন মানুষের নৈতিক প্রকৃতি তিনটি উপাদানের সমবায়ে গঠিত হয়। এই তিনটি উপাদান হল প্রক্ষোভ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। তিনি মনে করতেন শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষার জন্য তাকে সঠিক পথ দেখাতে হবে। শিক্ষক এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবেন না। তিনি মনে করতেন পুথিগতভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা মানুষের ধর্মীয় মনোভাব গড়ে তোলে।

শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা (Teaching Method and Role of Teacher)

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পুস্তক 'A System of National Education'-এ শিক্ষণের তিনটি মূলনীতির কথা বলেছেন।

(i) তিনি বলেছেন প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই শেখানো যায় না। তিনি বিবেকানন্দের ন্যায় শিক্ষকের সহায়কের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ঈশ্বরের অংশ আছে তাকে উদ্দীপিত করাই তার কাজ।

(ii) তিনি মন্তব্য করেছেন মনকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। কোনো কিছুই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ভেতর থেকে উদ্দীপিত করতে হয়। তাই শিক্ষা কেবল শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী হবে না, তার ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

(iii) শিক্ষণের তৃতীয় নীতি হল শিক্ষার্থীকে নিকট থেকে দূরে নিতে হবে। তাকে জানা থেকে অজানায় নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাই হবে শিখনের ভিত্তি। পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে ঘিরেই শিক্ষার্থী নতুন জ্ঞান অর্জন করবে। এই নীতি শিক্ষণ এবং শিখনে শ্রবণ-দর্শন শিক্ষাসহায়ক

উপকরণের ব্যবহার সমর্থন করে। কারণ প্রকৃত এবং সিমুলেটেড অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হিসেবে এর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষণের এই তিনটি নীতি সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করে এবং প্রত্যেকটি শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষতা এই তিনটি নীতির প্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা যায়। একজন দক্ষ শিক্ষক প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে বুঝে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা করবেন। শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তার আগ্রহ, প্রবণতা, আবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলিই হল মৌলিক তথ্য যা শিখন অভিজ্ঞতা উপস্থাপনে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীর মতো শিক্ষককেও কৌতূহলী হতে হবে এবং শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই বলেছেন, একজন সুশিক্ষক হবেন একজন শিশু যিনি অন্যান্য শিশুদের পরিচালনা করবেন এবং তিনি হবেন একটি বাতি যিনি অন্যান্য বাতি ও বিশ্বে আলো জ্বালাবেন।

আদর্শ শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়াও ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দর জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা এবং পণ্ডিচেরীতে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন সেখানে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাগুলির বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়।

জন ডিউই (John Dewey, 1859–1952)

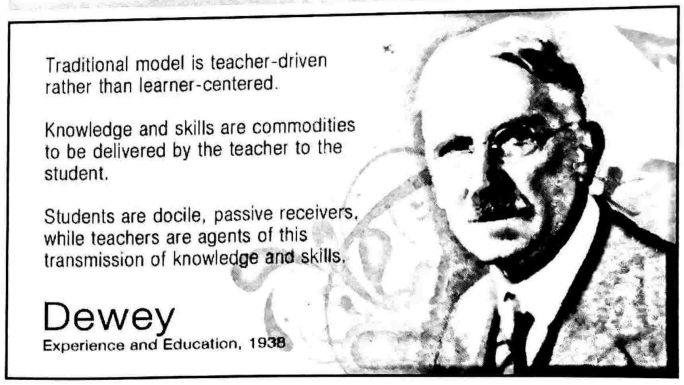

আমেরিকার আধুনিক ইতিহাসে উনিশ শতককে বলা হয় গণতন্ত্রের আদর্শ ও তার প্রয়োগগত প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী শতক থেকে আমেরিকায় একটি শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সমন্বয়ে দ্রুত আধুনিকীকরণের সূচনা হয়। উনিশ শতক বিশেষত এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই দুটি প্রক্রিয়ার দ্রুত বিকাশের ফলে

আধুনিক আমেরিকা প্রতিষ্ঠালাভ করে। স্বাভাবিকভাবে এই আধুনিকীকরণের প্রভাব জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ও রূপান্তরের পটভূমি রচনা করে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক শিল্পায়ন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় সার্বিক গণতন্ত্রীকরণ। এর প্রভাব অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষাকে এই পরিবর্তনশীল জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং শিক্ষার উপর নতুন চাহিদা পূরণের দাবি উপস্থিত হয়। এর ফলে মূলত ওই দেশের শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক রূপদান করার সমস্যাটি ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। এর পাশাপাশি সমাজজীবনে অর্থনৈতিক রূপান্তরের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের শিক্ষামূলক প্রশ্নটিও এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে। এমনই এক পটভূমিকায় আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় রূপান্তরসাধনের ভূমিকা গ্রহণ করে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব হলেন আধুনিক আমেরিকার সর্বাধিক প্রতিনিধি স্থানীয় শিক্ষাবিদ দার্শনিক জন ডিউই। জন ডিউই উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে আমেরিকার শিক্ষাজগতে তাঁর বিশিষ্ট পরিচয়কে তুলে ধরেন।

ডিউই-এর জীবনদর্শন (Dewey's Philosophy of Life)

1899 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ 'The School and Society' প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে থেকেই ডিউই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষণধর্মী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত আমেরিকায় বিদ্যালয় শিক্ষার ধর্মনিয়ন্ত্রিত যে আদর্শ ও নীতির আধিপত্য বর্তমান ছিল ডিউই সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কভিত্তিক প্রতিবাদের সূচনা করেন। তিনি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন যে, আমেরিকার শিক্ষণে অনতিবিলম্বে ওই প্রভাব থেকে মুক্ত করে একটি যুগোপযোগী রূপান্তর দান করতে হবে। এর জন্য বিদ্যালয় শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তববাদী নতুন লক্ষ্য গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃত্তি ও কর্মমূলক দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে হবে যাতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের আদর্শকে বাস্তবায়িত করা যায়। শিক্ষার এই আদর্শ ও প্রয়োগগত রূপান্তরসাধনের জন্য ডিউই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় জীবনাদর্শের পরিমণ্ডলে শিক্ষা সম্পর্কিত এক নতুন দর্শনের জন্মদান করেন। ডিউই-এর এই শিক্ষাদর্শন উইলিয়ম জেমস এবং চার্লস পিয়ারসন অনুসরণে প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন নামে পরিচিতি লাভ করে। ডিউই তাঁর পূর্বসূরিদের দার্শনিক চিন্তাকে শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এক নতুন তাৎপর্য দান করেন, যার ফলে সেটিকে অনেকে Instrumentalism নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। আসলে উনিশ শতকে আমেরিকার সমাজজীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তারই আলোকে ডিউই তাঁর শিক্ষাদর্শনকে নতুন ভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই দার্শনিক ধারণার দুটি প্রধান দিক রয়েছে—একটি হল সামাজিক দিক অন্যটি হল মনস্তাত্ত্বিক দিক। তিনি এই দুটি দিকের

সমন্বয়ে তাঁর শিক্ষাদর্শন রচনা করেছিলেন। প্রথমত তাঁর মতে—শিশুর ব্যক্তিগত পার্থক্য এবং স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত শক্তি, সম্ভাবনাগুলিই শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে। অন্যদিকে শিশুর শিক্ষামূলক বিকাশ প্রক্রিয়া তার সমাজ পরিবেশের মধ্য থেকে অর্জিত সামাজিক সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এই দুটিকেই পরস্পর যুক্ত করেই শিশুর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন বিকাশকেই সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

ডিউই-এর শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রম (Dewey's Philosophy of Education, Aim and Curriculum)

ডিউই শিক্ষার সংজ্ঞা দান করতে গিয়ে এটিকে জীবনের নিরন্তর বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা পুনর্গঠনমূলক প্রক্রিয়া রূপে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা ও জীবনকে তিনি একটি সমার্থক প্রক্রিয়া হিসাবে বিচার করেছেন। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া যা সার্থকতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়। সুতরাং ডিউই অন্যান্য দার্শনিকদের ন্যায় শিক্ষার কোনো চরম লক্ষ্যের ধারণায় বিশ্বাসী নন। এর অর্থ হল, শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত সার্থকতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রয়োগবাদে বিশ্বাসী ডিউই জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে কোনো eternal absolute বা চির সত্য ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জীবনের মূল্য বলতে জীবনের বৃদ্ধিমূলক চাহিদা পূরণকে বুঝিয়েছেন। কোনো না কোনো বাস্তব চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়ে তৃপ্তিদান করে, তাই হল Value বা মূল্য। এই অর্থে তিনি মূল্য সম্পর্কে একটি আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। শিক্ষার মূল্যকে ডিউই এই একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।

ডিউই জীবনকে একটি নিরন্তর বৃদ্ধিসাধনের গতিশীল প্রক্রিয়ারূপে গণ্য করলেন। তাঁর মতে, এই বৃদ্ধি কোনো উদ্দেশ্যহীন অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া নয়। ব্যক্তির সঠিক বৃদ্ধিসাধনের জন্য আদর্শ পরিবেশ রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বদান করেছেন। নির্বাচিত সমাজ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনই এক্ষেত্রে সঠিক নিয়ন্ত্রণ। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। এই অর্থে নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তিজীবনের বৃদ্ধি সাধনের অনুকূল সামাজিক অভিজ্ঞতা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া হল শিক্ষা। ডিউই তাই বলেছেন, শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা—এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ডিউই তাঁর এই শিক্ষা ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষার প্রয়োগ সাধনের বিভিন্ন দিকগুলিকে বিচার করেছেন। তাঁর নির্ধারিত আদর্শকে অনুসরণ করে শিক্ষা পাঠক্রমকে একটি অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তাভিত্তিক বাস্তব রূপদানের কথা বলা হয়েছে। তত্ত্বমূলক বিষয়ের অনুশীলনের পরিবর্তে আত্মসক্রিয়তামূলক ক্রিয়াকর্ম ও সমাজ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনই হল এই পাঠক্রমের মূলভিত্তি। এটিকে অনেকেই experience curriculum, আবার অনেকে activity curriculum নামে অভিহিত করেছেন। আসলে এই পাঠক্রম শিশুর স্বাভাবিক

নিরন্তর বৃদ্ধিসাধনের চাহিদার পরিপূরক পাঠক্রম হিসাবে সংগঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র দৈহিক সক্রিয়তাই নয়, চিন্তনমূলক বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের উপাদানের সমন্বয়ে ডিউই-র শিক্ষা পাঠক্রম সংগঠিত হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ডিউই পরিকল্পিত পাঠক্রমটি আসলে শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তামূলক সৃষ্টিধর্মী পাঠক্রম।

ডিউই-এর শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক ও শৃঙ্খলা (Dewey's Teaching System, Teacher and Discipline)

ডিউই-এর পাঠক্রমিক ধারণার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির ধারণাটিও গড়ে উঠেছে। ডিউই শিখনে শিশুর self-learning বা আত্মশিখনের উপর জোর দিয়েছেন। এই অর্থে শিশু তার আত্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে। শিশু নিজেই তার শিখনের উদ্দেশ্য ও বিষয়কে নির্বাচন করবে যার মধ্যে তার কোনো বৃদ্ধিমূলক চাহিদা পূরণের প্রশ্ন বা সমস্যা যুক্ত থাকে। এই সমস্যাটিকে আত্মসক্রিয়তামূলক কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে সমাধান করাই তার আত্মশিখনমূলক বৃদ্ধিসাধনের ভিত্তি গড়ে তোলে। এই সমস্যাসমাধানের প্রক্রিয়াটিই ডিউই-এর মতে—শিক্ষার আদর্শ পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকে। এটিই Problem solving method নামে পরিচিত। এর মধ্য থেকেই বিখ্যাত প্রজেক্ট মেথড-এর উদ্ভব হয়েছে। ডিউই-এর এই শিক্ষণ পদ্ধতি কয়েকটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে কার্যকর হয়ে থাকে। এগুলি হল—(i) সমস্যার পরিচয় বা নির্ধারণ; (ii) সমস্যার বিশ্লেষণ; (iii) সমস্যার সমাধানের সম্ভাব্য পরিকল্পনা রচনা করা; (iv) পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা এবং (v) অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে মূল্যায়ন।

ডিউই তাঁর পদ্ধতিকে learning by doing অর্থাৎ হাতেকলমে কাজ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি বলেছেন। শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারণ করতে গিয়ে ডিউই শিশুর বৃদ্ধিমূলক বিকাশ সাধনের উপযোগী শিক্ষা পরিবেশ সংগঠন ও পদ্ধতি যাতে বাস্তবরূপ লাভ করতে পারে সে সম্পর্কে একজন পর্যবেক্ষণ ও সাহায্যদানকারী বিশেষজ্ঞরূপে বিচার করেছেন। শিক্ষায় শৃঙ্খলা সম্পর্কে ডিউই শিশুর স্বাধীন আত্মশৃঙ্খলার ধারণাটি উপস্থিত করেছেন। এটিকে আমরা মুক্ত শৃঙ্খলার ধারণা বলতে পারি। এই উদ্দেশ্যে ডিউই বিদ্যালয়কে গৃহ জীবনের অনুরূপ একটি স্বাভাবিক সংগঠন হিসাবে বিদ্যালয় জীবন সংগঠনের কথা বলেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ডিউই-এর অবদান (Dewey's Contribution in Education)

লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ডিউই তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও পরিকল্পনায় স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ধারণাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন, গৃহ ও বিদ্যালয় জীবন, দৈহিক ও মানসিক বিকাশ এবং তত্ত্বমূলক ও প্রয়োগমূলক দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় রচনা করে একটি গতিশীল সামগ্রিক শিক্ষার রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। শিক্ষায় ব্যক্তির স্বাধীন সৃষ্টিশীল বৃদ্ধির দিকটিকে তিনি সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ও

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার রূপ তুলে ধরেছেন। ডিউই একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক রূপে শিক্ষার কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য ও স্থায়ী মূল্যবোধের বিশ্বাস রাখেননি। তিনি সমস্ত কিছুকেই ক্রিয়াশীল অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ফলদানের মাপকাঠিতে বিচার করার পক্ষপাতী। সমালোচকগণ মনে করেন যে, এই তাৎক্ষণিক মূল্যবোধের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলে অনেক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ক্রিয়ার তাৎপর্যকে অস্বীকার করা হয়, যার শিক্ষা ও জ্ঞানমূলক গুরুত্ব অপরিসীম। আবার ডিউই-এর মতে, শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না অর্থাৎ শিক্ষার ক্রিয়াশীল ধারার সমন্বয়ই হল লক্ষ্য আর প্রতিটি ক্রিয়াই হল লক্ষ্য পূরণের উপায় বা পদ্ধতি। এটি সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ এর ফলে শিক্ষার দীর্ঘস্থায়ী ও ভবিষ্যৎমুখী পূর্ব ধারণার সুযোগকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু এসব সমালোচনা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে শিক্ষাবিদ দার্শনিক ডিউইকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ***Rusk***-এর সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি—"In him were concentrated in a special degree the progressive tenderness of his age." আর এই অর্থেই Rusk-এর মতে, "Dewey was a great educationist because he was a great philosopher."

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 1888–1975)

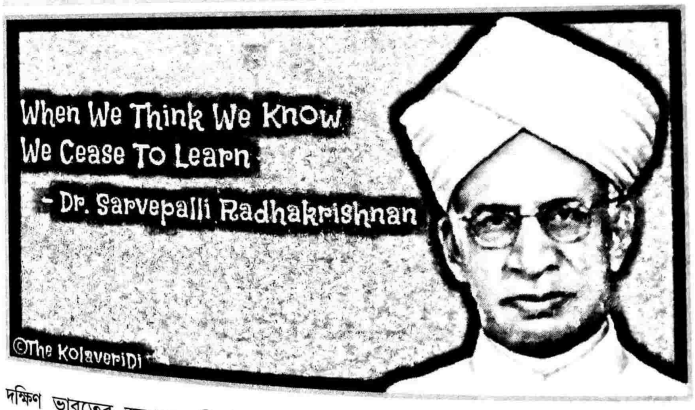

দক্ষিণ ভারতের অন্যতম তীর্থস্থান তামিলনাড়ুর তীরুতম্মিতে (Tiruttam) 1888 খ্রিস্টাব্দে ড. এস রাধাকৃষ্ণণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। 1910 খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথমে মাদ্রাজ এবং পরে মাইশোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

মাইশোর থেকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানে 'Mental and Moral Philosophy'-র উপর অধ্যাপনা করেন। তিনি King George V-এর চেয়ার অলংকৃত করেন, কুড়ি বছরের অধিক সময়ব্যাপী তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি প্রভূত সৃষ্টিশীল কাজ করেন যার ফলে সমগ্র বিশ্বে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ বাগ্মিতা দর্শকদের চমৎকৃত করতে সক্ষম হয়।

1929 খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম এবং দর্শনের (Comparative Philosophy and Religion) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন তবে শীঘ্রই তিনি চলে আসেন এবং 1931 খ্রিস্টাব্দে সদ্য স্থাপিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। 1940 খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Eastern Religion and Ethics-এর উপর 'Spalding chair' পদে যোগদান করেন। এটি একটি বিরল সম্মান। পরে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন।

1948-49 খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতির পদে থাকাকালীন দেশের উচ্চশিক্ষা পুনর্গঠন করে একটি নতুন দিশার পুরোধা হন। তাঁরই নেতৃত্বে লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণী দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে স্বীকৃত। ভারত সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হয়। UNESCO-তে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন।

এরপর তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। 1945 থেকে 1952 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত USSR-এ ভারতের দূত হিসেবে কাজ করেন। 1952 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন এবং 1957 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওই পদে আসীন ছিলেন। শীঘ্রই তিনি লোকসভার অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। দীর্ঘ দশ বছর তিনি রাজ্যসভার প্রাণ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

1962 খ্রিস্টাব্দে ড. রাধাকৃষ্ণণ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

1967 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'ভারতরত্ন'-র সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

রাধাকৃষ্ণণের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং তিনি অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন।

তাঁর লেখনীর মধ্যেও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় তাঁর লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

'The Philosophy of Rabindranath Tagore', 'Indian Philosophy', 'An Idealist View of Life', 'East and West Religion', 'The Future of Civilization', 'Education, Politics and War', 'My Search of Truth' ইত্যাদি।

রাধাকৃষ্ণণের জীবন এবং শিক্ষা দর্শন (The Philosophy of Life and Education of Radhakrishnan)

শিক্ষাক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণণের অবদান অদ্বিতীয় এবং অসাধারণ। তিনি কেবলমাত্র আদর্শবাদী ছিলেন না, ব্যবহারবাদী হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা মানুষের বিচরণ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে, তাকে জিজ্ঞাসা করতে শেখায়, জীবনের গভীর মূল্যবোধগুলি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে এবং আধ্যাত্মিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং প্রশাসক হিসেবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষ ক্রমশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে চলেছে, একমাত্র সঠিক শিক্ষাই একে প্রতিরোধ করতে পারে।

রাধাকৃষ্ণণের মতে—সন্দেহ নেই মানুষ তার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ দ্বারা অনুবর্তিত কিন্তু তাদের কখনোই মৌলিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। মৌলিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হল জীবনকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, আদর্শের অবনমন এবং মানুষের মনুষ্যত্বের পরাজয়।

তিনি বলেছেন বিশ্বাস হল মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য এবং এই বিশ্বাস হল তিন প্রকারের—

(i) **ঈশ্বরে বিশ্বাস (Faith in God):** নিখুঁতভাবে পরিচালিত এই মহাবিশ্ব যা ঈশ্বরের সৃষ্টি।

(ii) **মানুষের প্রতি বিশ্বাস (Faith in Man):** যা ঈশ্বর সৃষ্ট এই মহাবিশ্বে এক অনন্য (Unique) স্থান অধিকার করে আছে।

(iii) **নিজের প্রতি বিশ্বাস (Faith in Self):** প্রতিটি ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে তার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি আছে যা সহজাত। যে ব্যক্তি নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে সে হারিয়ে যাওয়া একটা সত্তা।

যে-কোনো সমাজে শিক্ষার সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান, কারণ শিক্ষা হল প্রকৃত অর্থে সমাজ-দার্শনিক উদ্যোগ এবং শিক্ষার সমস্যা-দর্শনেরই সমস্যা।

রাধাকৃষ্ণণের মতে দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে চলে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণণের চিন্তাভাবনা অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন হল জীবনের প্রতি রাধাকৃষ্ণণের দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে জানা। রাধাকৃষ্ণণ ভাববাদী দার্শনিক। এর অর্থ হল জীবনের উদ্দেশ্য আছে। এবং আদর্শ ও মূল্যবোধ হল গতিশীল শক্তি যা জীবনের গতি নির্দেশ করে এবং লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

1. রাধাকৃষ্ণণের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির বিকাশ। তার বিশেষ ক্ষমতার আবিষ্কার, প্রশিক্ষণ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য তার প্রয়োগ। শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণের জন্য সমন্বয়সাধন করা। শিক্ষা উপর থেকে

চাপিয়ে দেওয়া কোনো বিষয় নয়। শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন। শিক্ষণ হল নিরবচ্ছিন্ন এবং জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী শেখে শিক্ষকের নিকট থেকে, নিজের থেকে, সহপাঠী এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ সাধন।

2. শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মসংযমের বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝির অন্যতম কারণ হল শৈশবকাল থেকেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমন সব বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হয় যেগুলিকে আমরা আমাদের বুদ্ধি, বিচারশক্তি, ভালো-মন্দের নৈতিকতার দ্বারা বিচার করার সুযোগ পাই না। এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন হল ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। তাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ বিকাশে সহায়তা করা।
3. শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল মুক্ত মনের অধিকারী এবং দৃঢ়চেতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের তৈরি করা যাতে শিক্ষার্থীরা পরিণত বয়সে কুসংস্কার, আত্মসর্বস্ব এবং গতানুগতিকতার অবসান ঘটিয়ে যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে।
4. একটি মুক্ত সমাজ, মুক্ত নাগরিকের সমষ্টি, প্রকৃত স্বাধীনতা হল অভ্যন্তরীণ মন এবং আত্মার কার্যাবলি। শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে বিকাশ করা।
5. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় রাধাকৃষ্ণণের জীবনের একটা বড়ো অংশ স্বাধীন ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয়। তাই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রস্তাবনাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে। দর্শন হল সর্বজনীন যেখানে শিক্ষা হল দেশভিত্তিক যা বিশেষ স্থান এবং বিশেষ সময়ের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। সেই কারণে বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সমাজে শিক্ষার লক্ষ্যে পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় সমাজ এবং তার দর্শন অর্থাৎ সামাজিক দর্শনের ভিত্তিতে। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিশেষ ধরনের সমাজের কথা উল্লেখ আছে। আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যসূচির লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি বাস্তবায়িত করা যেমন ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, আইনের শাসন, ধৈর্য, সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ব।

গণতন্ত্র ব্যক্তির সহজাত গুণাবলির এবং মানুষের জীবনের মূল্য এবং মর্যাদার উপর আস্থাশীল। ব্যক্তিই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রতিটি ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।

ebook.dascoaching.in

পাঠক্রম (Curriculum)

1. পাঠক্রমের বিষয়সমূহ—রাধাকৃষ্ণণের মতে মানুষের তিন ধরনের অস্তিত্ব দেখা যায়—প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক। এইগুলি পরস্পর সম্পর্কিত। শিক্ষার পাঠক্রমিক বিষয়গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি—যা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে।
(খ) সামাজিক বিজ্ঞান—যা আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করে।
(গ) দর্শন, শিল্প ও স্থাপত্য—যা আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

রাধাকৃষ্ণণের মতে এই তিন ধরনের জ্ঞান হল সমগ্রের এক একটি অংশবিশেষ। তিনি আরও বলেন জ্ঞানকে পৃথকভাবে দেখা এবং বিশ্লেষণ করা উচিত নয় কারণ মানুষের জ্ঞান হল সমন্বিত। জ্ঞানের কোনো অংশকে অন্য অংশ থেকে পৃথক করা যায় না। শিক্ষা অবশ্যই মানুষকে সামগ্রিকভাবে দেখবে (Education must look for the whole men)। এর অর্থ হল পাঠক্রমের বিষয়গুলি পৃথক হলেও তার অন্তর্নিহিত অর্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বিত করতে হবে।

2. পাঠক্রমে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা: রাধাকৃষ্ণণের মতে, মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা তিন রকমের—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং ভক্তি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের প্রতি আস্থা। সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানুষের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে হবে, বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন। আর এই ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা দান করা হবে। তবে কোনোভাবেই ধর্মের গোঁড়ামি যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাসা না বাঁধে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বিদ্যালয়ে ধর্মীয় কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হল—শ্রদ্ধার সঙ্গে সকল ধর্মের আলোচনার ব্যবস্থা করা, বিশ্বের সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ, মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি। সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে যে, সব ধর্মের মূল বক্তব্য হল মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

নারী শিক্ষা (Women Education): রাধাকৃষ্ণণ স্ত্রীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষার ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এবং জীবন-জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে যে সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণণ সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করতেন। স্ত্রী শিক্ষার জন্য আরও বেশি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের প্রগতি দান করা তোলা জাতীয় কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষক (Teacher): রাধাকৃষ্ণণ নিজে শিক্ষক ছিলেন। তাই শিক্ষকের গুণাবলি, চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে শিক্ষক এবং তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যা সর্বস্তরের শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর মতে শিক্ষকের শিক্ষায় পান্ডিত্য ছাড়াও উদারতা, ছাত্র বাৎসল্য, সহানুভূতিশীল, শিক্ষার্থীদের প্রতি মর্যাদা দান, তাদের কৌতূহলী করা এবং মুক্ত মনে জ্ঞানের আদানপ্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল—

"We teachers, who are seekers, learners and propogators of truth form an intellectual consciousness of on community. We Must have a clear conception of the goal we have in view." (অর্থাৎ আমরা শিক্ষক, যারা অনুসন্ধানকারী, শিক্ষার্থী এবং সত্যকে ছড়িয়ে দিই, জনসমষ্টির চেতনা সৃষ্টি করি; আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অবশ্যই থাকা উচিত)।

পরিশেষে বলা যায় শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের মতবাদ উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণী যা পরে আলোচনা করা হবে।

আশুতোষ মুখার্জি
(Ashutosh Mukherjee, 1864–1924)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্যার আশুতোষ মুখার্জি 29 জুন 1864 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার বৌবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন জগদ্ধাত্রী দেবী, পিতা ছিলেন ডা. গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি যিনি কলিকাতার সাউথ সুবার্বন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞান এবং মানব বিজ্ঞান চর্চার গৃহ পরিবেশে আশুতোষ বড়ো হয়েছিলেন। শৈশবে তিনি ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে ভরতি হন। সেই সময় থেকেই তিনি অঙ্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখাতে শুরু করেন। পরে তিনি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। 1879 খ্রিস্টাব্দে মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত ম্যাট্রিকুলেশন (Matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রথম শ্রেণির বৃত্তি লাভ করেন। 1880 খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। সেখানে তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং নরেন্দ্রনাথ দত্তের (পরে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন) সঙ্গে পরিচিত হন। 1883 খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ করেন এবং 1885 খ্রিস্টাব্দে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। 1886 খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Physical Science) উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই প্রথম যিনি দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ওই বছরেই তিনি যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন। আশুতোষ আইন বিষয়ে (LLB) ডিগ্রি লাভ করার জন্য D.P.I-এর বিভাগে চাকুরিতে যোগদান করেননি। এই সময় থেকেই তিনি গণিতশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর প্রবন্ধ লিখতে এবং প্রকাশ করতে শুরু করেন। আশুতোষ মুখার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হিসাবে নির্বাচিত হন এবং তখন থেকেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র থেকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হন। সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকে উন্নতিকরণে সচেষ্ট ছিলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। 1906 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এই সময় থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করে। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন যার মধ্যে অন্যতম হলেন স্যার সি.ভি. রমন এবং ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।

কথিত আছে মাতৃভক্ত স্যার আশুতোষ মুখার্জি লর্ড কার্জনের অনুরোধ রক্ষা করেননি। লর্ড কার্জন স্যার আশুতোষকে ব্রিটেনে যেতে অনুরোধ করেন যাতে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদগণ ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কী ধরনের অগাধ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন শিক্ষাবিদ তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে পরিচিত হন।

স্যার আশুতোষের জননী সম্ভবত কুসংস্কারবশত যাওয়ার অনুমতি দেননি। স্যার আশুতোষ না যাওয়ার বিষয়টি লর্ড কার্জনকে জ্ঞাত করেন। উত্তরে লর্ড কার্জন লেখেন স্যার আশুতোষ যেন তাঁর মাতাকে বলেন—লর্ড কার্জন তাঁকে (আশুতোষকে) যেতে বলেছেন। আশুতোষ তার উত্তরে বলেন—আমি আমার মাতার কথা উপেক্ষা করে কোনো ভাইসরয় বা গভর্নর জেনারেলের আদেশ মানতে পারব না।

ফরাসি পণ্ডিত ***Sylvain Levi*** একবার মন্তব্য করেন—''Had this Bengal Tiger been born in Frances he would have exceeded George Elemenceans, the French Tiger. Ashutosh had no peer with whole Europe.'' (অর্থাৎ বাংলার এই বাঘ যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তিনি ফরাসি বাঘ জর্জ ক্লিমেনসিসের উপরে যেতেন। আশুতোষের সমকক্ষ ব্যক্তি সমগ্র ইউরোপে নেই।)

শিক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষের অবদান
(Contribution of Ashutosh to Education)

সেই অর্থে স্যার আশুতোষ অন্যান্য ভারতীয় শিক্ষা দার্শনিকের মতো ছিলেন না যারা শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদির উপর বিশদ আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল উচ্চতর শিক্ষা বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা। যদিও তিনি স্যাডলার কমিশনের সদস্য ছিলেন, তবে সেই কমিশনের মূল বিবেচ্য ছিল সেই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যালোচনা এবং সংস্কারসাধন। সেইজন্য স্যার আশুতোষের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান বলতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকে উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

যুবকদের কী ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন সে সম্পর্কে স্যার আশুতোষের প্রখর নজর ছিল। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনকর্তাদের সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

স্যার আশুতোষ সঠিকভাবে মনে করেছিলেন উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হল অত্যন্ত উচ্চমানের জ্ঞান অর্জন করা। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানকে পরিশীলিত করা এবং জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করা। সেইজন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডিগ্রি স্তরের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেমন—তুলনামূলক সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, ফলিত মনোবিজ্ঞান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি ইত্যাদি। এ ব্যতীত তিনি সংস্কৃত, পারসি, হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তরের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা নির্বিশেষে পণ্ডিতগণকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এবং পড়াতে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি ইউরোপ থেকে খ্যাতিমান অধ্যাপককে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীরামানুজমের প্রতিভা সম্পর্কে যারা অনুধাবন করেছিলেন স্যার আশুতোষ তাদের মধ্যে অন্যতম। স্যার আশুতোষ বিভিন্ন বিষয়ে উপর গবেষণার ব্যবস্থা করেছিলেন। 1916 খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ স্থাপন করেছিলেন।

1902 খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন যে কমিশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেখানে তিনি অর্থাৎ লর্ড কার্জন উল্লেখ করেছিলেন যে, ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে গোষ্ঠী বিশেষ সোচ্চার হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণেই

সম্ভবত উনিশ শতকে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে (অর্থাৎ যারা ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধী ছিল) স্ব-শাসন দিতে অস্বীকার করা হয়। এই জন্যই 1905-1935 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। 1923 খ্রিস্টাব্দে স্যার আশুতোষ উপাচার্যের পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কারণ লর্ড লিটন এই পদে পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছিলেন। 1906 খ্রিস্টাব্দে Bengal Technical Institute এবং 1914 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনে স্যার আশুতোষ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 1908 খ্রিস্টাব্দে তিনি Calcutta Mathematical Society স্থাপন করেছিলেন এবং 1908-1923 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। 1914 খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সূচনায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষের অবদানের জন্য ইংরেজ সরকার এবং ভারত সরকার তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। যেমন ভারতবর্ষের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 1911 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার তাঁকে Knighthood উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারত সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য আশুতোষের নামে একটি ডাকটিকিট চালু করেন।

স্যার আশুতোষ এবং ছাত্র রাজনীতি (Opinion on Students Politics)

শিক্ষাবিদ হিসাবে স্যার আশুতোষের ভূমিকা শেষ হয় না যদি তাঁর ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করা যায়। আশুতোষের সমকালীন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ছাত্রদের রাজনীতি বর্জনীয় নয়, আচরণীয়, তখন তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। স্যার আশুতোষ তখন বলেছিলেন তোমরা পলিটিকাল ইকনমি পড়ো, পলিটিক্যাল ফিলজফি পড়ো, জুরিসপ্রুডেন্স ও সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো, ইতিহাসের পাঠগুলি পড়ো, কিন্তু যৌবনের প্লাবনে প্লাবিত হয়ে রাজনীতির অনুশীলনে ভেসে যেয়ো না।

ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রেক্ষিতে (সক্রিয়তা, আবিষ্কার এবং বক্তব্য) উপরোক্ত দার্শনিকগণের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা
(Relevance of Philosophy of the aforesaid Philosophers in Indian Education with regard to Activity, Discovery and Dialogue)

পূর্বের আলোচনায় জন ডিউই এবং ভারবর্ষের কতিপয় প্রখ্যাত শিক্ষা দার্শনিকগণের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কীয় মতবাদ (Tenets) এবং কার্যাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে জন ডিউই ব্যতীত ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় উক্ত শিক্ষা দার্শনিকদের প্রাসঙ্গিকতা (বিশেষ করে সক্রিয়তা, আবিষ্কার এবং কথোপকথন) আলোচনা করা হল।

❶ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাচিন্তা এবং কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা (The Relevance of Swamiji's Education Philosophy and Activities on Indian Education)

স্বামীজির সময়ে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, জনগণের মুষ্টিমেয় অংশ অভিজাত সম্প্রদায়ের (Elitist) শিশুরাই শিক্ষার সুযোগ লাভ করত এবং শিক্ষার আলোকে তারা আলোকিত হত। জনগণের বৃহৎ অংশ বিশেষ করে দরিদ্র এবং নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এবং তাদের সন্তানরা নিরক্ষরতা, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল, শিক্ষা থেকে তাদের অবস্থান ছিল বহু বহু দূরে।

এই অবস্থায় স্বামীজির শিক্ষাচিন্তা এবং কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করা হল।

জনশিক্ষা (Mass Education)

স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের মানুষের যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা হল গণশিক্ষা। তিনি বলেছেন, ''One great national sin is the neglect of the masses and that is cause of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once move well educated, well fed and well cared for.'' অর্থাৎ জনগণের প্রতি অবহেলা হল আমাদের পতনের প্রধান কারণ। মানুষের প্রথম প্রয়োজন খাদ্য এবং শিক্ষা। এই দুটি জিনিস না থাকলে রাজনীতি দিয়ে কোনো লাভ হবে না। স্বামীজি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোনো দেশ কোনো কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলে ওই দেহ নিয়ে কোনো বড়ো কাজ করা যাবে না।—এ নিশ্চই জানবি।" আধুনিক শিক্ষা মুষ্টিমেয়কে আলোকিত করে। তাই শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা স্বামীজি বলেছেন।

বিবেকানন্দ শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে গিয়ে দেশের লোকদের আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, ধর্ম শিক্ষা দিতে বলেছেন। তিনি মনে করতেন, "সমাজের সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা।" স্বামীজি যথার্থই মনে করতেন, জনশিক্ষা প্রসারের ফলে এক নতুন ভারত জন্ম নিক। "নতুন ভারত বেরুক—বেরুক লাঙল ধরে, চামার কুটির ভেদ করে, জেলে-মালো-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে। ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গাল-পাহাড়-পর্বত থেকে।"

স্ত্রীশিক্ষা (Women Education)

স্বামীজি স্ত্রীশিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে তাদের মানুষ করতে বলেছেন। মেয়েরা মানুষ হলে তবে ভবিষ্যতে তাদের সন্তান-সন্ততি দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। তিনি এজন্য একদল ব্রহ্মচারিণী গঠন করতে বলেছেন। যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের শিক্ষা দেবেন।

আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং জাপানের মতো প্রগতিশীল দেশের উন্নতিতে তিনি নারীর সবিশেষ ভূমিকা লক্ষ করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের নারীদের দুর্দশা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সমাজে নারীর স্থান অবমূল্যায়নের জন্য তিনি অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, যে দেশ নারীকে শ্রদ্ধা করে না সেই দেশ বা জাতি কখনও বড়ো হতে পারে না। তিনি বলেছেন, ''There is no hope of rise for that family or country where there is no education of women, where they live in sadness. For this reason they have to be raised first.'' **মনু** বলেছেন, ''Where women are respected there the God delight and where they are not, there all work and efforts come to naught.'' তিনি সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আদর্শে ভারতীয় নারীদের গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তিনি নারীশিক্ষার একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। মহিলাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য থাকবে নারী মঠ এবং থাকবে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম হবে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, রন্ধন, সেলাই, সন্তান পালন, গার্হস্থ্যবিদ্যা সহ অন্যান্য শিক্ষা। মেয়েদের শিক্ষা দেবেন ব্রহ্মচারিণী অথবা শিক্ষিতা বিধবারা।

বিবেকানন্দ বলেছেন, নারীর শিক্ষাদীক্ষা এবং চরিত্র রামায়ণে বর্ণিত সীতাদেবীর মতো হওয়া উচিত। ভারতীয় নারীদের তিনি সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে বলেছেন।

ভাষা শিক্ষা (Language Education)

পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য বিবেকানন্দ ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চা এবং যে অমূল্য সব তথ্য ও তত্ত্ব সঞ্চিত রয়েছে তা আপামর জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ ও জাতির প্রতি গৌরববোধ জাগ্রত হয়।

ধর্মশিক্ষা (Religious Education)

বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। ইহার উপর আমাদের জীবন রূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত ... মানবসমাজ থেকে এই ধর্মকে বাদ দিলে কী থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ একটি অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না।" তাই বিবেকানন্দ ধর্ম শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম শিক্ষা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় আচার-আচরণ সর্বস্ব নয়। সমস্ত ধর্মের মূলনীতি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। ধর্ম শিক্ষার জন্য তিনি রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোটো ছোটো নীতিমূলক গল্প অনুবাদ করে শিশুশিক্ষার্থীদের পড়ানোর কথা বলেছেন।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (Removal of Untouchability)

স্বামী বিবেকানন্দ অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অস্পৃশ্যতাকে তিনি মানসিক ব্যাধি বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, শিক্ষার সাহায্যে তথাকথিত নীচু জাতির লোকেদের মধ্যে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে। তবেই জাতির উন্নতি হবে।

সমাজসেবা ও শিক্ষা (Social Service and Education)

স্বামীজি বলেছেন শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও কর্মশক্তি কেবলমাত্র অধ্যয়ন এবং আত্মোন্নতিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সমাজসেবার আদর্শে শিক্ষার্থীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে ও নিয়োজিত করতে হবে। সেবার মনোভাব ব্যতীত শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাঁর এই সেবাধর্মের আদর্শ জনগণের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিল।

সবশেষে বলা যায়, স্বামীজি পরাধীন ভারতবর্ষের জন্য এক সর্বার্থসাধক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ তাঁর সমস্ত শিক্ষাচিন্তার প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত সমাজ-চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। দরিদ্র, নিপীড়িত, হতভাগ্য ভারতবর্ষের আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য ও স্বরূপ কী হওয়া উচিত তা তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন। সেজন্য তিনি গণশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি নতুন ভারত গড়ার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন।

❷ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধির শিক্ষা বিস্তার এবং কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of the Mahatma Gandhi's Education and Philosophy in India)

প্রয়োগবাদী শিক্ষা দার্শনিক মহাত্মা গান্ধি মনে করেছিলেন গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে শিক্ষার সঙ্গে আর্থিক উন্নয়নকে মুক্ত করে সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষা এবং আর্থিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করা যাবে, সেজন্য তিনি এক নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যাকে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা বা নঈ-তালিম বলা হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

গান্ধিজি বিবেকানন্দের ন্যায় শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ। গান্ধিজি তৎকালীন ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠবে স্বনির্ভর। তিনি শিক্ষাকে উৎপাদনধর্মী ও সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধিজির শিক্ষা সম্পর্কে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যখন তিনি দক্ষিণ

আফ্রিকায় ছিলেন। টলস্টয়ের সান্নিধ্যে তাঁর এই প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন—"Tolstoy Farm"। এখান থেকেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত নতুন ধারণা বুনিয়াদি শিক্ষার সৃষ্টি।

গান্ধিজির চিন্তার পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায়। তিনি ছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং সংস্কারক। তিনি চেয়েছিলেন শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তুলতে। অহিংসা, সততা, সুবিচার এবং সমতার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুথিগত এবং তার মাধ্যমে আত্মবিকাশের সুযোগ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় এবং ইংরেজি শিক্ষার অত্যধিক প্রভাব ও শিক্ষায় উৎপাদনশীলতার অভাব গান্ধিজিকে বিশেষভাবে আঘাত করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজি 1937 খ্রিস্টাব্দে 'Wardha' পরিকল্পনায় তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রকাশ করেন। তাঁর এই শিক্ষাচিন্তা *Naitalim* নামে খ্যাত।

বুনিয়াদি শিক্ষার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি (Economical and Social Bases of Basic Education)

গান্ধিজি মনে করতেন শিক্ষাজগতের সঙ্গে কর্মজগতের সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে উভয়ের মধ্যকার প্রাচীরকে ভাঙতে হবে। এর জন্য শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে এটি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবে এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করবে। এর মধ্য দিয়ে তাদের মূল্যবোধ গড়ে উঠবে এবং আত্মোন্নয়ন হবে। শিক্ষা, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হবে। এই পরিকল্পনা বিদ্যালয়কে একটি ব্যাবহারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে। কমিউনিটি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। অর্থনৈতিক উৎপাদনে সক্ষম ব্যক্তিদের সরবরাহে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এইভাবে বিদ্যালয় ও বাস্তব জীবনের দূরত্ব দূর হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Basic Education)

(i) 7 থেকে 14 বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা।

(ii) এই স্তরে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে না, এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।

(iii) শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হবে। বুনন বা হাতে কাটা সুতা, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সেলাই, কৃষি, বাগান তৈরি, মৎস্য চাষ প্রভৃতিকে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

(iv) এই সমস্ত শিল্পকে কেন্দ্র করে তারা অর্থ উপার্জন করবে এবং নিজেদের শিক্ষার ব্যয় তারা নিজেরাই বহন করবে।

(v) এখানে গান্ধিজি অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।
(vi) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিকতা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে।
(vii) যতদূর সম্ভব পাঠ্যপুস্তককে পরিহার করতে হবে।
(viii) বুনিয়াদি শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুদের শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পিতা-মাতার শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাপ্তবয়স্ক, স্ত্রীলোক এবং হরিজনদের শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হবে।
(ix) বাহ্যিক মূল্যায়নের পরিবর্তে দৈনন্দিন কার্যাবলির প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হবে।
(x) বুনিয়াদি শিক্ষার কাঠামোয় চারটি স্তর থাকবে—(ক) প্রাক্-বুনিয়াদি স্তর (সাত বছরের পূর্ব পর্যন্ত), (খ) জুনিয়র বেসিক স্তর (সাত থেকে দশ বছর), (গ) সিনিয়র বেসিক স্তর (এগারো থেকে চোদ্দো বছর), (ঘ) পোস্ট বেসিক স্তর (চোদ্দো বছরের পর)।

এই শিক্ষাকে কেন বুনিয়াদি বলা হয়? (Why it is called Basic Education?)

(ক) জাতির মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
(খ) এর লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও জাতির ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ।
(গ) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে দণ্ডায়মান।
(ঘ) জাতি, ধর্ম, লিঙ্গভেদে সকল ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষা।
(ঙ) শিক্ষার্থীর মৌলিক এবং সৃজনশীল সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত।

বুনিয়াদি শিক্ষার উপযোগিতা (Facilities of Basic Education)

(i) ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে এই ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজনীয়। দেশে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও এই পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়। Zakir Hussain Committee-র মতে "We consider the scheme of basic education to be sound in itself. It should be accepted as a matter of sound educational policy and as an urgent measure of national reconstruction." অর্থাৎ বুনিয়াদি শিক্ষা স্বয়ং শক্তিশালী পরিকল্পনা। জাতির পুনর্গঠনে অত্যন্ত জরুরি এবং শক্তিশালী শিক্ষানীতির ভিত্তিতে এটি গঠিত।
(ii) অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটি কার্যকরী কারণ এটি আর্থিক স্বনির্ভরতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া এই শিক্ষা-পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে সহায়তা করে।
(iii) এই ধরনের শিক্ষা গণতান্ত্রিক ও সামাজিক। এখানে শ্রেণিভেদ ও জাতিভেদ প্রথা নেই। তাই এটি জাতীয় সংহতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(iv) এটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিভেদ দূরীকরণে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, এটি কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে বৌদ্ধিক কাজের দূরত্ব দূর করে এবং ধনী-দরিদ্র ও গ্রাম-শহরের দূরত্ব দূর করে।
(v) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সক্রিয়তাভিত্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত।
(vi) বুনিয়াদি শিক্ষা বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে।
(vii) এটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
(viii) এটি আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
(ix) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সৃজনাত্মক এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
(x) এটি নাগরিকতার শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে।

বুনিয়াদি শিক্ষার ত্রুটি (Defects of Basic Education)

বুনিয়াদি শিক্ষার একাধিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তা সার্থক হতে পারেনি, কারণ এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়নি। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার ব্যর্থতার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন—

(i) এই শিক্ষা রূপায়ণে শিক্ষক, সামাজিক নেতা এবং শিক্ষা প্রশাসক সকলেরই উদাসীনতা দেখতে পাওয়া যায় এবং আরও মনে করা হয় যে এই ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা বিদ্যালয়কে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দেবে। শিক্ষার্থীরাও অর্থ উপায়ের যন্ত্র হয়ে উঠবে এবং শিক্ষাক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে।
(ii) এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় Liberal Education-কে একেবারে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার অনেক সময় দেখা যায় শিল্পটিও ঠিকভাবে নির্বাচিত হয়নি।
(iii) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা কখনোই জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে নিম্নমানের বলে মনে করত।
(iv) কিছু মানুষ মনে করত সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সমাজের আধুনিকীকরণ ও দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ।

(v) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

(vi) এখানে যে শিল্প শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক, এর পেছনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ছিল না। তা ছাড়া এই ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনার সময় তালিকা নির্মাণ করাও খুব কঠিন।

(vii) এই ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

বুনিয়াদি শিক্ষা ছাড়াও ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে গান্ধিজির শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিম্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতেও দেখা যায়। যেমন—

ধর্মীয় শিক্ষা (Education on Religion)

গান্ধিজি ধর্মীয় শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "Life without religion is life without principle, and life without principle is like a ship without a rudder." অর্থাৎ ধর্ম ছাড়া জীবন আর নীতিহীন জীবন, হাল ছাড়া জাহাজের ন্যায়। গান্ধিজি ধর্ম বলতে কোনো মত বা ধর্মীয় সংস্কারকে বোঝাননি। তিনি বলেছেন, "There is no religion higher than Truth and Righteousness." অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের উপর কোনো ধর্ম হতে পারে না। তিনি সমস্ত ধর্মের মূল নীতিগুলি শিক্ষার কথা বলেছেন। 1948-49 খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণ কমিশন এবং 1964-66 খ্রিস্টাব্দের কোঠারি কমিশন ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষায় এই নীতিকে মেনে নিয়েছেন।

নারী শিক্ষা (Women Education)

গান্ধিজি ভারতবর্ষের নারীদের অবস্থানকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মতো তিনি মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন কোনো জাতির অগ্রগতির জন্য মেয়েদের শিক্ষা অপরিহার্য। গান্ধিজি বলেছেন "Home life is entirely the sphere of women and, therefore, in domestic affair, in the upbringing and education of children, women ought to have more knowledge." অর্থাৎ গৃহস্থজীবন নারীর বিচরণক্ষেত্র। সুতরাং গৃহস্থজীবন, শিশুর শিক্ষণ এবং লালনপালন সম্পর্কে নারীদের অধিক জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, তিনি পরীক্ষামূলকভাবে সহশিক্ষার কথাও বলেছেন।

বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)

বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধিজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। তিনি বুঝেছিলেন ভারতের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতীত দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জনশিক্ষার প্রয়োজন। ভারতের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। সুতরাং তাদের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

তিনি বলেছেন, "I would have adult education, not as we ordinarily understand it, but the education of parents so that they can undertake adequately the moulding of their children." অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আমি বলতে চাই না। আমি পিতা-মাতার এমন শিক্ষা চাই যার দ্বারা তাঁরা তাঁদের সন্তানদের মানুষ করতে পারেন। গান্ধিজির এই শিক্ষা-পরিকল্পনা মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপর জ্ঞানের বোঝা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা যা শেখে তা সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে হয়। তার পশ্চাতে কোনো আন্তরিক ইচ্ছা থাকে না। স্বতঃস্ফূর্ততা শিশুর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তার আগে থেকেই তার মধ্যে বিভিন্ন কাজে পারদর্শিতা দেখা যায়। বিদ্যালয়ের কাজ হবে তার সৃজনশীল চিন্তাশক্তি এবং গঠনমূলক চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

পরিশেষে বলা যায় গান্ধিজির শিক্ষা চিন্তা এবং নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট সুচিন্তিত ছিল। কিন্তু পরিভাষার বিষয় হল গান্ধিজির শিক্ষা সম্পর্কে মূল চিন্তাকে সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে ও অবহেলা করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে বুনিয়াদি শিক্ষার সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করা হয়নি।

❸ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা এবং কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Tagore's Education Philosophy and Activity in India)

শৈশবকালে রবীন্দ্রনাথের গতানুগতিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত ছিল। চার দেওয়ালে আবদ্ধ, শিক্ষকতাড়িত বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন তাঁর শিশুমনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। যার ফলে বিদ্যালয়ে বা প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে তিনি কোনোদিন পঠন-পাঠন করেননি। সম্ভবত সেই সময় থেকে তিনি অন্য এক ধরনের শিক্ষা-চিন্তার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন যা পরিণত বয়সে তিনি 'শান্তিনিকেতনে' এবং বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ দান করেন।

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন (Santiniketan and Educational Philosophy of Rabindranath)

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করেই থেমে থাকেননি। তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রয়োগ করার জন্য তিনি 1901 খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্যেরপ্রয়োজন আছে। তিনি গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের উপরও এখানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক না থাকলে আর যা হোক শিক্ষার আদানপ্রদান সম্ভব হয় না।

1921 খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন—"প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্ব প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে।" তিনি বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতায় আস্থাশীল ছিলেন। তাই শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্নপ্রকার খেলাধুলায় এবং স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
2. রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির কোলে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবদ্ধ রেখে কখনোই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতনে তাই খোলা আকাশের নীচে, গাছের তলায় পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে।
3. এখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কাজ ও সৃজনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা পরস্পর মেলামেশা করে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।
4. রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়তালিকার মধ্যে বেঁধে রাখতে চাননি। তিনি বলেছেন সময়তালিকা হবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী।
5. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এখানে মধুর। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। শিক্ষক তার পাশে বন্ধুর মতো থেকে তাকে সাহায্য করেন।
6. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক বৈষম্য অর্থাৎ কোনোরকম পার্থক্য এখানে করা হয় না। ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করে, খাওয়াদাওয়া ও খেলাধুলা করে।
7. ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার উপর রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। শৈশবকাল থেকেই শিশুরা যাতে ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজে গর্ব অনুভব করে সে চেষ্টা শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায়।
8. শান্তিনিকেতনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচলিত আছে। যথার্থ শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত একথা রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই শান্তিনিকেতনে শিক্ষার মাধ্যম হল মাতৃভাষা।

9. শান্তিনিকেতনে নানা রকম কুটিরশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, চামড়ার কাজ, কৃষিকাজ ও উদ্যান পরিচর্যার শিক্ষা দেওয়া হয়।
10. সমাজসেবা ও পল্লি উন্নয়নমূলক কাজ শান্তিনিকেতনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজসেবার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পল্লি উন্নয়নে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় অন্যদিকে তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। এই দুটি কাজই প্রতিটি মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম, তার অনুশীলন শান্তিনিকেতনে আবশ্যিক কর্ম।

বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন (Visvabharati and Rabindranath's Philosophy Education)

1922 খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার চূড়ান্ত রূপ। তিনি মনে করতেন, নিজেকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে একীভূত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। একে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন পূর্ব ও পশ্চিমকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মেলাতে হবে। তিনি লিখেছেন, "বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ ভূগোলের বেড়া ভেঙে গিয়েছে। জাতিরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় আজ সমস্ত পৃথিবী ব্যথিত।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে বিশ্বভারতী। পশ্চিমের বিজ্ঞান শিক্ষা আর পূর্বের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বভারতীতে পূর্ব আর পশ্চিমের মিলন ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"পশ্চিমে আজ খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

বিশ্বভারতীতে এই উপলব্ধির পূর্ণতা ঘটবে।

বিশ্বভারতীতে জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের চর্চার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের জন্য নার্সারি বিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের নানা বিষয় পঠনপাঠনের সুযোগ আছে। যেমন—

উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—

জনশিক্ষা (Mass Education): রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। তাঁর মতে শিশুর শিক্ষা শুরু হবে তার পরিবার থেকে। গ্রামের পাঠাগারগুলিকে তিনি জনশিক্ষা প্রসারের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। যাত্রা, লোকনৃত্য, লোকসংগীত, সাধারণ উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে জনশিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য লেখাপড়ার প্রয়োজন। কারণ শিক্ষাই চেতনা নিয়ে আসে।

নারী শিক্ষা (Women Education): রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় সকলের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গল্পে, উপন্যাসে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তবে স্ত্রী, পুরুষের যে ভেদ তার প্রতিফলন যাতে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকে সে ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার মধ্যে মেলবন্ধন করেছিলেন। তিনি ভারতীয় শিক্ষায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

❹ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ঋষি অরবিন্দের শিক্ষাদর্শন ও চিন্তা এবং কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Aurobindo's Education Philosophy and Thought and Activities in India)

শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। জীবনের প্রথম অংশে তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। পরবর্তী জীবনে তিনি অতি উচ্চ মাত্রায় আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হন। উভয় জীবনেই তিনি একজন শিক্ষা দার্শনিক এবং তাঁর দর্শন সমৃদ্ধ শিক্ষা সংস্কারমূলক কার্যাবলির নেতৃত্ব দান করেন। ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রেক্ষিতে যার প্রাসঙ্গিকতা নিম্নে আলোচনা করা হল।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি
(Sri Aurobindo's Scheme of National Education)

শ্রীঅরবিন্দ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তিনি একজন দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর অনুরাগ ও ভক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা মানবতার চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করতেন জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের উন্নতির প্রয়োজন। তিনি স্বধর্ম ও স্বদেশ এই দুটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন জাতির উন্নতির জন্য দেশের সংস্কৃতি ও চাহিদা এই দুটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষ তথা সমগ্র জাতির মন ও আত্মার বিকাশের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, যে শিক্ষা দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এবং যা জাতীয় নিয়ন্ত্রণে থাকবে ও যে শিক্ষা মাতৃভাষায় প্রদান করা হবে।

যথার্থ শিক্ষা কেবলমাত্র ব্যক্তির কথা নয় জাতি এবং মনুষ্যত্বর উপর গুরুত্ব দেবে। এই শিক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তির মন এবং আত্মার বিকাশের উপর গুরুত্ব দেবে তেমনি মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য জাতিকেও প্রস্তুত করবে। ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে প্রস্ফুটিত করবে। একই সঙ্গে ব্যক্তির কমিউনিটি ও মানবতার উপযুক্ত সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা (Mother Language of Medium of Instruction)

তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন মাতৃভাষার শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তারপর অন্য ভাষা শিক্ষার প্রশ্ন ওঠে। এই বিষয়টি সেই সময়কার শিক্ষা জগতের সকল দার্শনিক মেনে নিয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ এবং সংস্কৃতি (Sri Aurobindo and International Culture): পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জীবনের দ্বিতীয় ভাগে শ্রীঅরবিন্দ অতি উচ্চমাত্রায় আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এই সময় তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য দক্ষিণ ভারতের পন্ডিচেরীতে International Culture of Education নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখানে শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রবহমান শিক্ষার সুযোগ আছে এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা এবং আদর্শের সমন্বয়ে একটি পীঠস্থান হিসাবে পরিণত হয়েছে। ভারত সরকার UNESCO এই প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে এবং করছে।

❺ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তা এবং কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Radhakrishnan's Educational Philosophy and activities in India)

স্বাধীনতা অর্জনের পর রাধাকৃষ্ণণ প্রায় 28 বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা দান এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি ভারতবর্ষের শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল যার প্রাসঙ্গিকতা আজও বর্তমান।

রাধাকৃষ্ণণ এবং ভারতবর্ষের শিক্ষার লক্ষ্য
(Aim of Education in India and Radhakrishnan)

রাধাকৃষ্ণণের মতে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় সমাজ এবং দর্শনের ভিত্তিতে অর্থাৎ সামাজিক দর্শনের ভিত্তিতে। আমাদের অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিশেষ ধরনের সমাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচির লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি বাস্তবায়িত করা। যেমন ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, আইনের নিয়ম, ধৈর্য, সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র ব্যক্তির সহজাত গুণাবলি এবং মানুষের জীবনের মূল্য এবং মর্যাদার উপর আস্থা দান। ব্যক্তিই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রতিটি ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে পূর্ণ বিকাশে সহযোগিতা করা। শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে রাধাকৃষ্ণণের এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান।

❻ রাধাকৃষ্ণণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (Radhakrishnan and University Commission–1948-49)

ভূমিকা (Introduction): স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সরকারের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ড. এস. রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে 1948 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়

কমিশন গঠন করা। ড. রাধাকৃষ্ণণ ছাড়া এই কমিশনে ছিলেন ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার, ড. জাকির হোসেন, ড. তারাচাঁদ, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. এন কে সিদ্ধান্ত।

এ ছাড়া কমিশনে ড. জেমস এফ ডাফ, ডা. আর্থার ই মরগ্যান, ড. টি গার্ট এই তিনজন বিদেশি শিক্ষাবিদকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

কমিশনের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বহু কলেজের কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন ও দেশের শিক্ষা সমস্যার নানা দিক পর্যালোচনা করে 989 পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করেন।

কমিশনের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু (The Area of Commission): (1) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য, (2) পাঠক্রম ও শিক্ষার বাহন, (3) শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার মান, (4) গবেষণা, (5) ছাত্রদের স্বাস্থ্য, আবাসন, নিয়মানুবর্তিতা, (6) উচ্চশিক্ষার প্রশাসন, (7) গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ যেখানে স্থান পেয়েছে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সুপারিশ।

এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আছে ধর্মশিক্ষা, নারী শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Higher Education): স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা মনে রেখে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করেন সেগুলি হল—

(ক) নেতৃত্ব দানের শিক্ষা: এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে এমন, যাতে শিক্ষার্থীরা দেশের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাদের অবদানে জাতীয় জীবন ঐশ্বর্য ও সম্পদে ভরে ওঠে।

(খ) জাতীয় ও সংস্কৃতি শিক্ষা: শিক্ষার মান এমনভাবে উন্নত করতে হবে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী জাতীয় সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি হতে পারে, এবং মানব-সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে (সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প) তারা যেন স্থায়ী অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত শিক্ষার দুটি লক্ষ্য থেকে কমিশন বলতে চেয়েছেন দেশকে যদি সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, কারিগর, আবিষ্কর্তা প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হবে। সভ্যতার আলোকগামী এইসব বুদ্ধিজীবীদের গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে।

(গ) সাংস্কৃতিক জীবনে গতিশীলতা: আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীলতা বজায় রাখতে হলে কেবল অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। নতুন নতুন সম্ভাবনার কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য এমনই হবে যাতে শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংস্কৃতি উপলব্ধি করে তাকে সংরক্ষণ, জাতির অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে উপলব্ধি করে তার সম্প্রসারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভাবগুলি আয়ত্ত করে প্রয়োজনমতো গ্রহণ ও বর্জন ইত্যাদি করতে সক্ষম হয়।

(ঘ) গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ: শিক্ষার এই পর্যায়ে দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের নতুনভাবে চিন্তা করার শক্তি অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ এবং নানা দিকে তাদের গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) নানা ধরনের শিক্ষার মানোন্নয়ন: মানববিদ্যার চর্চার দ্বারা মানবতাবাদের বিকাশ, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, কৃষিবিদ্যার চর্চার মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ঘটানো বিশেষ প্রয়োজন। দেশের সাধারণ শিক্ষা, যান্ত্রিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি নানা ধরনের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।

(চ) নৈতিক মূল্যবোধ ও শিক্ষা: আমাদের স্বপ্নের সভ্যতার ভিত্তি হবে প্রধানত মানব চরিত্রের উপর, কেবলমাত্র যান্ত্রিক উন্নতির উপর নয়। চারিত্রিক উন্নতির জন্য ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিশ্বসাহিত্যে লিপিবদ্ধ থাকা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যাতে তারা নৈতিক মূল্যবোধ লাভ করতে পারে এবং মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) মানবিক গুণাবলির বিকাশসাধন: উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা, মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি মানবিক গুণগুলির বিকাশ সাধন করা।

(জ) সামাজিক চাহিদা ও শিক্ষা: নতুন সমাজ গড়ার জন্য সমাজদর্শন সম্পর্কে ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে এক সুশৃঙ্খল সমাজ সৃষ্টি হয়। সমাজের চাহিদা অনুসারে আমরা যেন এক বাঞ্ছিত সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি।

(ঝ) প্রজ্ঞার উন্মেষ: কমিশনের মতে, Education is both a training of minds, training of souls; it should give both Knowledge and Wisdom. অর্থাৎ শিক্ষা মন এবং আত্মা উভয়কেই প্রশিক্ষণ দেবে। উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়েই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটবে।

(ঞ) শিক্ষায় সমান অধিকার: আমাদের সংবিধানে ভারতবর্ষকে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্রের মূল কথা হল, সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়া গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করতে পারে না। সেজন্য প্রত্যেক নাগরিক যাতে শিক্ষার সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে স্বয়ংশাসিত ও স্বাধীন। শিক্ষকেরা যাতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির চাহিদা যাতে পূরণ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ট) সহপাঠক্রমিক শিক্ষা: সহপাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়কে, গৌণ ও সমবায়মূলক কাজকে যাতে বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্ব প্রদান করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঠ) জাতীয় সংহতি, আন্তর্জাতিকতাবোধের জন্য শিক্ষা: সুদূর সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য চলে আসছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল বক্তব্য হল আত্মানুসন্ধান। কেবল জড় ও পার্থিব এই দুয়ের মধ্যে ভারতবাসী কোনোদিন পরিতৃপ্তি লাভ করেনি। সে আত্মার সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর মনে বিশ্বপ্রেমের উন্মেষ ঘটেছে। সেইজন্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অন্তর্নিহিত মূল সত্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রভৃতি বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হবে।

(ড) শিক্ষা ও মানবসভ্যতা: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে মানবসভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী হয় তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঢ) ছাত্র ও শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষা: ছাত্র ও শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টার নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে সমাজে শুভ জীবনের উন্মেষ সাধন করা দরকার—উচ্চশিক্ষা সেই ধরনের হওয়া প্রয়োজন।

(ণ) মাতৃভাষায় শিক্ষা: সাধারণ শিক্ষায় মাতৃভাষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অপর লক্ষ্য হবে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সমান গুরুত্ব অনুযায়ী শারীরিক উন্নতির দিকে নজর দেওয়া।

(ত) ধর্ম ও নীতিশিক্ষা: রাধাকৃষ্ণণের মতে, মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তা তিন ধরনের হতে পারে—(a) ভগবানের প্রতি ভক্তি, (b) মানুষের প্রতি ভালোবাসা, (c) নিজেকে ভালোবাসা, যে মানুষ তার নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সে নিজেকেও হারিয়ে ফেলে। সুতরাং সমাজে শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এই ধারণার প্রতিফলন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনেও (1948-49) রয়েছে। তিনি বলেছেন, (a) ভারতের ধর্ম শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত হতে পারে না। শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন; তবে ধর্মের তাত্ত্বিক গোঁড়ামি থাকলে চলবে না। (b) বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ শুরু হওয়ার আগে ছাত্রদের কিছুক্ষণ নীরবে ধ্যান করে চিত্তকে সংযত করে নিতে হবে। (c) ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছর বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের জীবনীপাঠের ব্যবস্থা করতে হবে; ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে সর্বজনীন আবেদনপূর্ণ বাণী আলোচনা করতে হবে। তৃতীয় তথা ডিগ্রি কোর্সের শেষে ধর্মতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। (d) দর্শন শাস্ত্রের পাঠ্যসূচিতে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।

(থ) কৃষিবিদ্যা শিক্ষা: ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষিভিত্তিক দেশ। শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ জনসাধারণ গ্রামে বসবাস করেন। গ্রামীণ উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য হবে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(দ) কারিগরি শিক্ষা: প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিক বিশ্বের রূপ পালটে দিচ্ছে। জাতীয় বিকাশ এবং আর্থিক প্রগতির অন্যতম উপায় হল কারিগরি শিক্ষা। উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হবে।

(ধ) বয়স্ক শিক্ষা: বয়স্ক শিক্ষা যেহেতু দেশবাসীর কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। কোনো জাতিই গণনিরক্ষরতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না।

ebook.dascoaching.in

উপসংহার

শিক্ষাবিস্তার, নতুন জ্ঞানের অবিরাম অনুসন্ধান, জীবনের অর্থানুসন্ধানের অবিরত প্রচেষ্টা, সমাজের পেশাগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদান প্রভৃতি হল উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা যদি কেবল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমাজে একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করি, তবে সেক্ষেত্রে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে। তখন সমাজ লাভ করবে বিবেকহীন, চিরস্থায়ী এবং রুচিশীল ও শূন্যগর্ভ কারিগর। এর ফলে সর্বত্র একটি নৈতিক শূন্যতাবোধ বিরাজ করবে। তাই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মূল্যবোধ ও আদর্শ গড়ে তোলা দরকার। আমরা শিক্ষাদানের জন্য যে-কোনো মাধ্যমই গ্রহণ করি না কেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সকল নাগরিকের বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, মানুষের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আমাদের আনুগত্য রক্ষা করে চলতে হবে। আমরা যদি সত্য হতে চাই তাহলে দরিদ্র ও নির্যাতিতদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে, নারীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি আস্থা, শান্তি ও স্বাধীনতাপ্রীতি, নিষ্ঠুরতা পরিহার ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আমরা যদি গণতন্ত্র, ন্যায়নীতি, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ বজায় রাখতে না পারি, তাহলে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করতেও পারব না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই সমস্ত আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করতে হবে এবং মানুষ যতদিন জ্ঞানের অনুসন্ধান করবে ততদিন এই আদর্শ বিসর্জন দেওয়া চলবে না। আমরা যদি আমাদের সংবিধান রচয়িতা দূরদর্শী ও অনুভূতিপ্রবণ নেতাদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সঠিকপথে শিক্ষাদান করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষালাভের প্রকৃত সুযোগ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কাঠামো (Structure of University Education)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য হল, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতি করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষারও উন্নতি করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন—

1. বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মোট 12 বছর শিক্ষাগ্রহণের পর ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে।
2. প্রত্যেক প্রদেশে অধিক সংখ্যক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে।
3. বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের শেষে সমস্ত ছাত্র যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় না করে তার জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে।
4. 12 বছর বিদ্যালয় শিক্ষা লাভ করার পর ছাত্রেরা কলা ও বিজ্ঞান শাখায় ভরতি হতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ইন্টারমিডিয়েট কিংবা তদনুরূপ কোনো পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে পারে।
5. পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরা দু-বছর ও অনার্স কোর্স গ্র্যাজুয়েটদের তিন বছরের পড়াশোনা করতে হবে।
6. কলা ও বিজ্ঞান শাখাতে মাস্টার্স ডিগ্রির নিয়মকানুনের মধ্যে সংগতি রাখতে হবে।
7. অনার্সের ছাত্ররা এক বছর ও পাস কোর্সের ছাত্ররা দুই বছর পরে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করবে।
8. পি এইচ ডি ডিগ্রির শিক্ষার কাল হবে দু-বছর।
9. গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে জনশিক্ষা, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। গ্রামীণ শিক্ষার নিম্ন স্তরে থাকবে বুনিয়াদি বিদ্যালয়, আর উচ্চস্তরে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রামীণ শিক্ষার কাঠামোর স্তরগুলি হল—
   (ক) আট বছর ব্যাপী নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর।
   (খ) তিন বা চার বছর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর বা উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর।
   (গ) তিন বছরের কলেজ শিক্ষাস্তর।
   (ঘ) দু-বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষাস্তর।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum)

সাধারণ শিক্ষা (মানবিক বিষয় ও বিজ্ঞান): ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি স্তরে চূড়ান্ত বিশেষীকরণের সুফলের প্রতিরোধে কমিশন বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে সাধারণ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন যেসব সুপারিশ করেন সেগুলি হল—

1. বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার তত্ত্বগত ও ব্যাবহারিক দিক সম্পর্কে পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকবে এবং সেই মতো পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করতে হবে। ছাত্ররা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
2. সাধারণ শিক্ষার মূল নীতি যথাশীঘ্র প্রণয়ন করতে হবে এবং তা কার্যে পরিণত করতে হবে।
3. শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষধর্মী শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে এবং তা করার সময় ছাত্রদের সাধারণ আগ্রহ ও বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের আগ্রহের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
4. স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পেশাগত শিক্ষা: পেশাগত শিক্ষা বলতে কমিশন পেশাগত উদ্যমের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ ও যথাযোগ্য কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকেই বুঝিয়েছেন। যেসব কাজের জন্য উন্নত ধরনের দক্ষতা ও শৃঙ্খলাযুক্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় সেইসব কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকে পেশাগত শিক্ষা বলে। যেসব কাজে অপেক্ষাকৃত কম প্রস্তুতির প্রয়োজন তাকে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা বলে।

কমিশন তাঁদের রিপোর্টে নিম্নলিখিত পেশাগুলির পাঠ্যসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—(ক) কৃষি, (খ) বাণিজ্য, (গ) শিক্ষাতত্ত্ব, (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি, (ঙ) আইন এবং (চ) চিকিৎসাবিদ্যা।

(ক) কৃষি: জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করতে হবে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলিকে যুক্ত করতে হবে। কৃষি গবেষণার উন্নতি করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক কৃষি খামার স্থাপন করতে হবে।

(খ) বাণিজ্য: বাণিজ্যের ছাত্রকে তিন-চার প্রকার বিভিন্ন কাজে হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। বাণিজ্যে মাস্টার্স ডিগ্রির শিক্ষা যাতে কম পুথি ঘেঁষা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ছাত্র যাতে শিক্ষালাভ করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। স্নাতক হওয়ার পর কিছু সংখ্যক ছাত্রকে একটি বিশেষ পেশায় (যেমন অ্যাকাউন্টেন্ট) পারদর্শিতা লাভ করার সুযোগ দিতে হবে।

(গ) শিক্ষাতত্ত্ব: শিক্ষাতত্ত্বের পাঠক্রম নতুনভাবে রচনা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করতে হবে। ব্যাবহারিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে হবে। শিক্ষায় তত্ত্বগত বিষয়কে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি: বিভিন্ন স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সমস্ত শাখায় প্রথম বছরের পাঠক্রম একরকম হবে।

কলেজীয় শিক্ষার সঙ্গে কর্ম-অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। টেকনোলজিক্যাল কলেজগুলিকে, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করতে হবে। উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট খোলার চেষ্টা করতে হবে। উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল কোনো মন্ত্রক বা সরকারি বিভাগ ছাড়া সরকারি বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে।

(ঙ) আইন: আইন বিভাগে ভরতির জন্য তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশ করতে হবে। আইনের বিষয়গুলির জন্য তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে। এর মধ্যে শেষের বছরটিতে কোনো অ্যাডভোকেটের অধীনে ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আইনের প্রত্যেকটি শাখায় গবেষণার সুযোগ দিতে হবে।

(চ) চিকিৎসাবিদ্যা: যে বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য হাসপাতালের সাহায্য প্রয়োজন সেই বিভাগগুলিকে হাসপাতাল সংলগ্ন করতে হবে। অর্ধস্নাতক ও স্নাতক স্তরে কোনো গ্রামীণ কেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ও নার্সিংকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ছাত্রপিছু 10টি করে শয্যা থাকবে। চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম ডিগ্রি কোর্সে ভারতীয় প্রণালী সহ ভেষজ শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নততর কলেজগুলিতেই কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত পেশাগুলি ছাড়াও কমিশন ব্যবস্থা পরিচালনা, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, শিল্প সম্পর্ক প্রভৃতি কতকগুলি নতুন পেশার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

ধর্মীয় শিক্ষা (Religious Education)

ভারতবর্ষ বহুধর্মালম্বীদের দেশ। তাই ধর্মীয় নিরপেক্ষতাকে বজায় রেখে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ হল—

(ক) নীরব প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হবে।

(খ) ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছর মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ (বুদ্ধ, জিশুখ্রিস্ট, কনফুসিয়াস, মোহম্মদ, কবির, নানক ইত্যাদি)।

(গ) দ্বিতীয় বছরে প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশ্বজনীন বক্তব্যগুলির সংকলন পাঠ।

(ঘ) তৃতীয় বছরে ধর্মীয় দর্শনের মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার সুপারিশ করেন।

শিক্ষার মাধ্যম (The Medium of Education)

কমিশন শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত বিতর্কমূলক সমস্যাটির সুস্পষ্ট সমাধানে প্রয়াসী হন। এ সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য হল—

(ক) আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি ভাষার শব্দভাণ্ডারের উন্নতি বিধান করতে হবে।

(গ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বিজ্ঞান ও কারিগরি শব্দগুলির ভারতীয় পরিভাষা স্থির করতে হবে এবং তাদের উচ্চারণও ভারতীয় শব্দতত্ত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট করতে হবে।

(ঘ) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্র ভাষা (হিন্দি) চালু করার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজির পরিবর্তে কোনো ভারতীয় ভাষাকে (আঞ্চলিক ভাষা) গ্রহণ করতে হবে।

(চ) উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিনটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে— মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজি।

(ছ) ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে সংগতি রেখে চলার জন্য মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা চর্চা করতে হবে। কমিশন জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, ইংরেজি ভাষা আমাদের দেশের শিক্ষা ও বৌদ্ধিক জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University)

ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতের হাজার হাজার গ্রামের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তা থেকেই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা দেখা দেয়। কমিশন বুঝেছিলেন, তৎকালীন যেসব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেগুলিতে প্রধানত শহরের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই গ্রামে যেসব ছেলেমেয়ে বাস করে এবং যাদের শহরে এসে পড়ার সুযোগ হয় না তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় নামে এক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামের মানুষ যাতে নিম্নস্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করেন। সুতরাং রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সর্বাত্মক নতুন চেতনা যোগ করা। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব অনুভব করে শিক্ষাব্যবস্থাকে কমিশন গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের কথা বলেছেন।

কমিশনের মতে, গ্রামের সমাজজীবন ও শহরের সমাজজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা ও নাগরিক উচ্চশিক্ষার মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য থাকবে। শহরে ও গ্রামের অধিবাসীদের জীবিকা, শিক্ষার মান ও সামাজিক সমস্যার পার্থক্যের দিকে লক্ষ রেখে এই উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল ওই রিপোর্টে। যেমন শহরের উচ্চশিক্ষায় কারিগরি, যন্ত্রশিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে থাকে সেখানে গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা প্রাধান্য লাভ করবে। জনশিক্ষা, কৃষি,

গ্রামোন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের পরিকল্পনা করার সময় গ্রাম্যজীবনের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করার কথা বলা হয়েছিল এই কমিশনের রিপোর্টে।

এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার রূপ প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর-বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে গ্রামীণ বিদ্যালয় রূপে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ কলেজ। কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামীণ শিক্ষা কাঠামোয় থাকবে

1. 7 কিংবা 8 বছর ব্যাপী নিম্ন ও উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষা।
2. 3 কিংবা 4 বছরের উচ্চবুনিয়াদি ও মাধ্যমিক শিক্ষা।
3. 3 বছরের গ্রামীণ কলেজ।
4. বিশ্ববিদ্যালয়ে 2 বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা।

প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় 30 থেকে 60 একর জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে থাকবে বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষকদের আবাসন, খেলার মাঠ, ওয়ার্কশপ, কৃষিখামার, বাগান ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা 150 জনের অধিক হবে না। শতকরা 50 ভাগ সময় তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর এবং অবশিষ্ট 50 ভাগ সময় ব্যাবহারিক কার্যে ব্যয় করা হবে।

মাধ্যমিক স্তরের পরে গ্রামীণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কতকগুলি গ্রামীণ কলেজ নিয়ে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হবে। স্নাতক স্তরের শিক্ষা হবে কলেজে এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠদান ও গবেষণা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিটি কলেজে 300 এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 2500 শিক্ষার্থী-সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকবে। কলেজে তত্ত্ব ও ব্যবহার উভয় ধরনের শিক্ষা সমান গুরুত্ব পাবে। গ্রামীণ বিষয়গুলি ছাড়াও উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অন্যান্য বিষয়ের পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে। পাঠক্রমে প্রধান বিষয় হিসাবে থাকবে দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক স্বাধিকার থাকবে।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির অসারতা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সুচিন্তিত মন্তব্য করেন। কমিশন ঘোষণা করেছিলেন, If we are to suggest one single reform in university education, it should be out of examination। এককথায়, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কমিশন। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

(ক) বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভীক্ষা প্রস্তুতির কাজ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু করতে হবে।

ebook.daschoaching.in

(খ) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্থায়ী পরীক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সংস্থার সদস্য হবেন বিশেষ অধ্যাপকগণ। নতুন অভীক্ষাপত্র কীভাবে প্রস্তুত করা হবে সে সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্ভুক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রস্তুত করার কাজের ভার এই সংস্থার উপর দেওয়া হবে।

(গ) অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সমগ্র পরীক্ষার মূল্যায়নের এক-তৃতীয়াংশ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দিলে কাজ ভালো হবে। শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণির বাইরেও বিষয় সম্পর্কিত যে-কোনো কাজ করানো হবে; অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় সে সকল কাজেরও উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

(ঘ) বছরে একটা করে পরীক্ষা না নিয়ে ধারাবাহিক পরীক্ষার প্রবর্তন করলে কাজ ভালো হবে। ধারাবাহিক পরীক্ষার উপর ক্রেডিটের ব্যবস্থা করা দরকার।

(ঙ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা এই দুয়েরই সমন্বয় করা প্রয়োজন।

(চ) কমিশনের মতে, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কোনো প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থা গৃহীত হলে পরীক্ষাসংক্রান্ত অনেক ত্রুটি দূর হবে।

(ছ) পরীক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোনো বিষয়ে অন্তত পাঁচ বছরের পড়ানোর অভিজ্ঞতা না থাকলে তাঁকে পরীক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। ডিগ্রি পরীক্ষায় বহিঃপরীক্ষক একাদিক্রমে তিন বছরের বেশি সময় পরীক্ষক হিসাবে থাকতে পারবেন না।

(জ) স্নাতকোত্তর স্তর ও পেশাগত ডিগ্রি পরীক্ষায় মৌলিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্তন করতে হবে।

(ঝ) উচ্চশিক্ষার পরীক্ষাগুলিতে গ্রেস মার্ক দেওয়ার রীতি বর্জন করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সীমাবদ্ধতা (Limitations)

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হিসাবে রাধাকৃষ্ণণের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উল্লিখিত ইতিবাচক দিকগুলি থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা যায়।

1. ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের অভিমত অস্পষ্ট ও বিমূর্ত।
2. উচ্চশিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না দেওয়ায় সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে।
3. নারী-শিক্ষা ও শিল্পচর্চা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ আশাব্যঞ্জক নয়।
4. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামের পরিবর্তে শহরভিত্তিক অঞ্চলের উপরেই পরবর্তী সময়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মূল্যায়ন

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশগুলি ভারতের শিক্ষা-ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

1. উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দেশ করার ক্ষেত্রে কমিশন গণতন্ত্র, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব, পরিচালনা ও অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই দায়িত্বশীল নেতৃত্ব সরবরাহ করবে। উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য সময়োপযোগী ও প্রগতিশীল।
2. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী, পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে।
3. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব থাকার সুপারিশটি কমিশনের দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে।
4. কমিশন একদিকে যেমন প্রগতিশীল শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন, তেমনি ভারতের যেসব প্রাচীন ভাবধারার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সত্যিকারের গুরুত্ব আছে সেগুলিকে কমিশন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে সুপারিশ করেছেন।
5. কমিশন একদিকে যেমন কারিগরি, বৈজ্ঞানিক, বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যমূলক, চারুকলামূলক দার্শনিক শিক্ষার গুরুত্বের উপরও জোর দিয়েছেন।
6. ভারত মূলত একটি বিশাল কৃষিক্ষেত্র। তাই কমিশন কৃষিশিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিবেদনে এ কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কৃষিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলতে হবে গ্রামীণ পরিবেশে যেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব কর্ম পরিবেশের সঙ্গে তত্ত্বগত শিক্ষার যোগসূত্র খুঁজে পান।
7. এই কমিশন শিক্ষার সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে ত্রুটিপূর্ণ অনিষ্টকর বিষয়গুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ক্রম নিম্নগামী শিক্ষার মান, আকর্ষণহীন, অনমনীয় পাঠক্রম, ত্রুটিপূর্ণ, পরীক্ষাব্যবস্থা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ ও পক্ষপাতিত্ব, অবহেলিত গ্রামীণ শিক্ষা ইত্যাদির প্রতি কমিশন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমিশন ক্ষান্ত হননি, প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানের সুপরামর্শও দিয়েছেন। পরামর্শ ও নির্দেশগুলি নিঃসন্দেহে যুক্তিভিত্তিক। নিম্নমানের শিক্ষণ পদ্ধতি ও গবেষণার উন্নয়নের উপর কমিশন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, মঞ্জুরি কমিশন সংগঠন সম্পর্কিত সুপারিশগুলি অতি বাস্তব ও সর্বজনকাম্য।
8. সম্পর্কিত সুপারিশটি নিঃসন্দেহে মৌলিক ও বিপ্লবাত্মক।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায় সবশেষে বলা যায়—একবার ছাত্ররা তাদের অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিবস পালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা রাধাকৃষ্ণণের অনুমতি প্রার্থনা করতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষক রাধাকৃষ্ণণ উত্তরে বলেছিলেন—আমার জন্মদিনটি তোমরা শিক্ষক দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করো। সেই থেকে তার জন্মদিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' (Teachers' Day) হিসাবে পালন করা হয়।

৭ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে স্যার আশুতোষ মুখার্জির শিক্ষাচিন্তা এবং কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Sir Ashutosh Mukherjee Education Thoughts in India)

ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার সংস্কার, পুনর্গঠন এবং উন্নয়নের সূচনা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, পরে তা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে। এই কাজটি যিনি প্রথম শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে যার দূরদৃষ্টি সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পথ দেখায় তিনি হলেন 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই কারণেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নে বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সার্বিক বিকাশে স্যার আশুতোষের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত না হয়ে উচ্চশিক্ষার (যেমন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তর) পঠনপাঠন এবং গবেষণার কেন্দ্র হয় সেই ব্যবস্থা তিনিই প্রথম করেছিলেন। একই সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষা যাতে খুবই উন্নতমানের হয় সেজন্য তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে (এমনকি ইউরোপ থেকেও) উচ্চমানের পণ্ডিতগণকে নিয়ে এসে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ড. সি ভি রমন এবং এস রাধাকৃষ্ণণ।

দ্বিতীয়ত, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিবিদ্যা পঠনপাঠনের জন্য তিনি 1906 খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (Bengal Technical Institute) স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত, 1914 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত রাজাবাজারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনে স্যার আশুতোষ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই বিজ্ঞান কলেজেই আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানীগণ যেমন ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. বি ভি চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি গবেষণা করেছেন।

চতুর্থত, 1908 খ্রিস্টাব্দে স্যার আশুতোষ ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি (Calcutta Mathematical Society) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

পঞ্চমত, 1916 খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ স্থাপন করেন যা বর্তমান কলকাতা এবং মফস্‌সল অঞ্চলের যুবক-যুবতিদের উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণ করে চলছে।

ষষ্ঠত, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের জন্য তিনি লর্ড কার্জন এবং পরবর্তী সময়ে লর্ড লিটনের সঙ্গে মতান্তর হয়। আর্থিক সহায়তা করা সত্ত্বেও শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কোনো রকমের সরকারি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্ষা বিজ্ঞান অনুযায়ী যা সঠিক পথ।

সপ্তমত, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ভারতবর্ষের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের প্রাসঙ্গিকতা কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্যাডলার কমিশনের (1917-1919) সদস্য হয়ে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যদিও স্যাডলার কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল সেই সময়ের উচ্চশিক্ষার পর্যালোচনা করা এবং তার সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা। কমিশন বুঝতে পারে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি না করে উচ্চশিক্ষার সংস্কার সম্ভব নয়। তাই কমিশন সেই সময়ের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যালোচনা করে এবং কিছু সুপারিশ করে। অনেকের মতে এই পর্যালোচনা এবং সংস্কারের সুপারিশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ের মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি এবং তা দূরীকরণে একাধিক সুপারিশ করে, এর মধ্যে যে সব ত্রুটি ও সুপারিশগুলির এখনও প্রাসঙ্গিকতা আছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল। যেমন—

(i) শিক্ষার মান নিম্নমুখী
(ii) শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব
(iii) শিক্ষার্থীদের দারিদ্র্য

একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য যেসব সুপারিশগুলি আজও প্রাসঙ্গিক সেইগুলি হল—

(i) মাধ্যমিক শিক্ষার পর দু-বছরের শিক্ষা বিদ্যালয়েই হবে (এখন যেমন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা)
(ii) মাধ্যমিক এবং ইন্টারমিডিয়েট (এখন উচ্চমাধ্যমিক) শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনার পৃথক বোর্ড গঠন করা হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের জন্য দুটি পৃথক বোর্ড আছে।
(iii) সব বিষয়েই (ইংরেজি ও গণিত ছাড়া) মাতৃভাষায় পড়ানো হবে বর্তমানে অবশ্য গণিতও মাতৃভাষায় পড়ানো হচ্ছে।
(iv) ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক স্তর) পাঠক্রমে থাকবে মানববিদ্যা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি যা বর্তমানেও আছে।

অষ্টমত, ছাত্ররা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা সে ব্যাপারে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক। আশুতোষ বলেন—তোমরা পলিটিক্যাল ইকনমি পড়ো, পলিটিক্যাল ফিলজফি পড়ো, জুরিসপ্রুডেন্স ও কনস্টিটিউশন আইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো—ইতিহাসের মহান পাঠগুলি আয়ত্ত করো, কিন্তু যৌবনের প্রাবল্যে ভেসে গিয়ে রাজনীতির অন্ধগলিতে ভেসে যেও না। এই মতের উপর বিতর্ক থাকলেও সম্ভবত এটাই আজকের দিনে সঠিক পন্থা।

পরিশেষে বলা যায়, নানা ধরনের বাধাবিপত্তি বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতি বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এবং নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে স্যার আশুতোষ তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন এবং স্যার আশুতোষের নাম আগামী দিনগুলিতেও একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-2

▶ দর্শনশাস্ত্রের অর্থ কী? (What is philosophy ?)

Ans. দর্শন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Philosophy' দুটি লাতিন শব্দ Philo (অর্থ Love বা ভালোবাসা) এবং Sophia (অর্থ Knowledge বা জ্ঞান) থেকে এসেছে। অর্থাৎ Philosophy-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বা আসক্তি। শিক্ষাবিদ ***Raymont***-এর মতে, যে ব্যক্তির সব রকম জ্ঞানের প্রতি আসক্তি আছে অর্থাৎ যার জ্ঞানপিপাসা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না তিনিই হলেন প্রকৃত দার্শনিক।

▶ শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation between education and philosophy.)

Ans. উপরে উল্লিখিত দর্শন ও শিক্ষার অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দর্শন নির্ধারণ করে জীবনের উদ্দেশ্য—কী কী করণীয় এবং কী কী করণীয় নয়। আর শিক্ষা হল সেই উপায় বা হাতিয়ার যার দ্বারা দর্শন-নির্ধারিত জীবনের উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করা যায়। এই অর্থে দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কিত। জীবনকে ঘিরেই এই সম্পর্ক তৈরি হয়। মানুষের জীবনদর্শন শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিশক্তি বিভিন্নভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে।

▶ শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিক কী কী? (What is the theoretical relation between education and philosophy ?)

Ans. শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিকগুলি হল—

1. শিক্ষা ও দর্শনের স্বরূপ পরিবর্তন
2. সমাজের মূল তথ্যগুলি নির্ধারণে দর্শন ও শিক্ষা

3. দার্শনিকের তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার
4. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে দর্শন ও শিক্ষা
5. মহান দার্শনিকগণ ও মহান শিক্ষাবিদগণ।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কী? (In view of Rabindranath, what is the main aims of education ?)

Ans. 1. বিকাশ 2. দৈহিক বিকাশ
3. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ 4. সামাজিক গুণাবলির বিকাশ
5. জনশিক্ষা বিস্তার।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী কোন কোন বিষয় এবং কার্যসূচিগুলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে? (What subjects and programme are included in curriculum, according to Sri Aurobindo's philosophy of education ?)

Ans. 1. শারীরশিক্ষা 2. সপ্রাণ শিক্ষা
3. মানসিক শিক্ষা 4. আধ্যাত্মিক শিক্ষা
5. আন্তর্জাতিক শিক্ষা।

বুনিয়াদি শিক্ষাকে কেন বুনিয়াদি বলা হয়? (Why does called basic to basic education ?)

Ans. বুনিয়াদি শিক্ষাকে বুনিয়াদি বলা হয় কারণ—
(ক) জাতির মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
(খ) এর লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও জাতির ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ।
(গ) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে দণ্ডায়মান।
(ঘ) জাতি, ধর্ম, লিঙ্গভেদে সকল ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষা।
(ঙ) শিক্ষার্থীর মৌলিক এবং সৃজনশীল সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত।

স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কী কী লক্ষ্য নির্ধারণ করেন? (What types of aims are ascertained by University Commission after Independence ?)

Ans. স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্ধারণ করেন—
(ক) নেতৃত্ব দানের শিক্ষা, (খ) জাতীয় ও সংস্কৃতি শিক্ষা, (গ) সাংস্কৃতিক জীবনে গতিশীলতা, (ঘ) গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, (ঙ) নানা ধরনের শিক্ষার মানোন্নয়ন, (চ) নৈতিক মূল্যবোধ ও শিক্ষা, (ছ) মানবিক গুণাবলির বিকাশসাধন, (জ) সামাজিক চাহিদা ও শিক্ষা, (ঝ) প্রজ্ঞার উন্মেষ, (ঞ) শিক্ষায় সমান অধিকার, (ট) সহপাঠক্রমিক শিক্ষা, (ঠ) জাতীয় সংহতি, আন্তর্জাতিকতাবোধের জন্য শিক্ষা, (ড) শিক্ষা ও মানবসভ্যতা, (ঢ) ছাত্র ও শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষা, (ণ) মাতৃভাষায় শিক্ষা, (ত) ধর্ম ও নীতিশিক্ষা, (থ) কৃষিবিদ্যা শিক্ষা, (দ) কারিগরি শিক্ষা (ধ) বয়স্ক শিক্ষা।

কমিশন কোন্ কোন্ পেশাগুলির পাঠ্যসূচির আলোচনা করেছেন? (What types of syllabus of profession are discussed by Commission ?)

Ans. পেশাগত শিক্ষা বলতে কমিশন পেশাগত উদ্যমের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ ও যথাযোগ্য কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকেই বুঝিয়েছেন। যেসব কাজের জন্য উন্নত ধরনের দক্ষতা ও শৃঙ্খলাযুক্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় সেইসব কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকে পেশাগত শিক্ষা বলে। যেসব কাজে অপেক্ষাকৃত কম প্রস্তুতির প্রয়োজন তাকে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা বলে।
কমিশন তাঁদের রিপোর্টে যেসব পেশাগুলির পাঠ্যসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা হল—(ক) কৃষি, (খ) বাণিজ্য, (গ) শিক্ষাতত্ত্ব, (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি, (ঙ) আইন এবং (চ) চিকিৎসাবিদ্যা।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সীমাবদ্ধতা লিখুন। (Write the limitations of University Commission.)

Ans. স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হিসাবে রাধাকৃষ্ণণের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উল্লিখিত ইতিবাচক দিকগুলি থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা যায়।
1. ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের অভিমত অস্পষ্ট ও বিমূর্ত।
2. উচ্চশিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না দেওয়ায় সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে।
3. নারী-শিক্ষা ও শিল্পচর্চা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ আশাব্যঞ্জক নয়।
4. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামের পরিবর্তে শহরভিত্তিক অঞ্চলের উপরেই পরবর্তী সময়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-5

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কে তাত্ত্বিক দিকগুলি আলোচনা করুন। (Discuss the theoretical relation between education and philosophy.)

Ans. 24-25 পৃষ্ঠা দেখুন।

মহাত্মা গান্ধির জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন সম্বন্ধে লিখুন। (Write about Gandhiji's philosophy of life and society.)

Ans. 31-32 পৃষ্ঠা দেখুন।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কী ছিল? (What was the aims of education according to Rabindranath?)

Ans. 35-36 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the aims of education according to Aurovindo.)

Ans. 40-41 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শ্রীঅরবিন্দ কোন্ বিষয়গুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন? (Which subjects included in curriculum by Sri Aurovindo?)

Ans. 41-42 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করুন। (Discuss about teaching method and role of a teacher according to Aurovindo.)

Ans. 42-43 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষা ও জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা করুন। (Discuss about philosophy of education and life of Radhakrishnan.)

Ans. 49 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ রাধাকৃষ্ণণের মতে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কী ছিল? (What was the aims of education according to Radhakrihsnan?)

Ans. 49-50 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বুনিয়াদি শিক্ষার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি এবং তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। (Discuss the characteristics of economical and social bases of basic education.)

Ans. 59-60 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বুনিয়াদি শিক্ষার উপযোগিতাগুলি লিখুন। (Write the facilities of basic education.)

Ans. 60-61 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বুনিয়াদি শিক্ষার ত্রুটিগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the defects of basic education.)

Ans. 61-62 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কাঠামো আলোচনা করুন। (Discuss the Structure of University Education recommended by Commission.)

Ans. 72 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা করুন। (Discuss about reformation of examination process recommended by University Commission.)

Ans. 76-77 পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-10

▶ শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্কে ব্যাবহারিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করুন। (Discuss about relation of practical aspects between education and philosophy.)

Ans. 25-27 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন আলোচনা করুন। (Discuss about Vivekananda's philosophy of life.)

Ans. 28-30 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জন ডিউই-এর জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে লিখুন। (Write about Dewey's Philosophy of life and education.)

Ans. 44-46 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষাক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের অবদান আলোচনা করুন। (Discuss the contribution of Sir Ashutosh in the field of education.)

Ans. 54-55 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা ও কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। (Discuss about the relevance of Swamiji's philosophy of education and activities on Indian context.)

Ans. 56-57 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও কার্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। (Discuss about the relevance of Tagore's philosophy of education and activities in Indian context.)

Ans. 63-65 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যগুলি লিখুন। (Write the aims of higher education according to University Commission.)

Ans. 68-71 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। (Discuss in details about structure of University education.)

Ans. 72-74 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে স্যার আশুতোষ মুখার্জির শিক্ষাচিন্তা এবং কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। (Discuss the relevance of Sir Ashutosh Mukherjee's education thoughts in Indian context.)

Ans. 79-81 পৃষ্ঠা দেখুন।

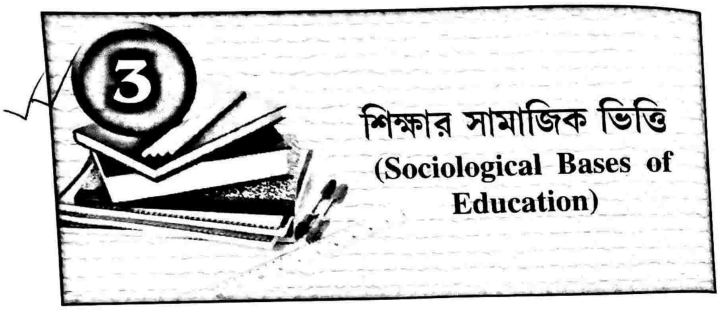

3 শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি (Sociological Bases of Education)

ভারতবর্ষের শিক্ষার সাংবিধানিক লক্ষ্য (Constitutional Goal for Education)

ভারতবর্ষের শিক্ষার সাংবিধানিক লক্ষ্য আলোচনা করার পূর্বে সংবিধানের সংজ্ঞা এবং প্রস্তাবনা জানা প্রয়োজন।

সংবিধানের সংজ্ঞা (Definition of Constitution)

লাতিন শব্দ 'Constitutus' থেকে 'Constitution' শব্দটি এসেছে। তবে সংবিধানের সংজ্ঞা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মার্কিন আইনবিদ **কুলি** ***(Cooley)*** সংবিধানকে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—সংবিধানের মধ্যে সেইসব নিয়মবিধি থাকে যার উপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয় এবং সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মাধ্যমেই স্থির হয় ব্যক্তির হাতে ওই ক্ষমতা অর্পিত হবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।

লর্ড ব্রাইস ***(Lord Bryce)***-এর মতে, সংবিধান হল সমাজকে সংগঠিত ও শাসন করা এবং ঐক্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও নিয়মের রূপদানকারী আইনের এক জটিল সমষ্টি। **লোয়েন স্টাইন** ***(Lowen Stein)***-এর মতে সংবিধান হল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের নিয়মবিধির একটি প্রধান অস্ত্র। **গিলক্রিস্ট** ***(Gilchrist)***-এর মতে, সংবিধান হল কতকগুলি লিখিত বা অলিখিত নিয়ম যাদের দ্বারা সরকার গঠিত হয় এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ও সকল বিভাগের কার্যভার নির্ধারণ করা হয়।

সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble to the Constitution)

ভারতীয় সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রণেতাগণ 1787 খ্রিস্টাব্দে গৃহীত মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রস্তাবনার মাধ্যমে সংবিধানের উৎস, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয় ব্যক্ত হয়েছে।

প্রণেতাগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপ দেওয়ার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং প্রতিটি ব্যক্তির সমান মর্যাদা ও সুযোগ এবং জাতীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রূপায়ণের কথা তাঁরা ঘোষণা করেন।

উপরে উল্লিখিত সংবিধানের সংজ্ঞা এবং প্রস্তাবনা উল্লেখ করার পরে ভারতবর্ষে শিক্ষার সাংবিধানিক লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করা হল।

❶ **বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (Free and Compulsory Primary Education):** সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির 45 নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সংবিধান প্রচলন হওয়ার দিন থেকে 10 বছরের মধ্যে রাষ্ট্র 14 বছর বয়সের সকল ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করবে। এখানে 'রাষ্ট্র' বলতে বোঝায় (ধারা 12) কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনসভা, রাজ্য সরকার ও বিধানসভা ও ভারত সরকারের শাসনাধীন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ।

এইভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সকলের সমন্বিত দায়িত্ব।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল—

(ক) সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ করা।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার উপর গবেষণা।

(গ) পাইলট প্রকল্প শুরু করা।

(ঘ) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য দূর করা এবং সমসুযোগ নিশ্চিত করা।

(ঙ) পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা।

রাজ্য সরকারের প্রধান দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন করা। রাজ্যগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়। সংবিধান অনুযায়ী 1960 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা হলেও আজও পর্যন্ত তা বাস্তবে পরিণত হয়নি।

❷ **সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার (Rights to Establishment and Management of Minority Institution):** মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে সংবিধানের 30 নং ধারায় সংখ্যালঘুদের পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার স্বীকৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 30(1) নং ধারায় বলা হয়েছে, সমস্ত ধর্মগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজেদের ইচ্ছামতো বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে। 30(2) নং অংশে বলা হয়েছে, ধর্ম ও ভাষার দিক দিয়ে সংখ্যালঘু এই অজুহাতে সাহায্যদানে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করবে না।

সংবিধানের 29(1) নং ধারায় বলা হয়েছে, ভারতের যে-কোনো স্থানে বসবাসকারী নাগরিকদের কোনো অংশের যদি পৃথক ভাষা বা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে তাহলে তাদের ওই সংস্কৃতি-সংরক্ষণের অধিকার থাকবে।

This E-Book Download From>> www.ebook.dascoachin g.in

29(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম সম্প্রদায়, ভাষা বা যে-কোনো একটি বিষয়ের অজুহাতে কোনো ভারতীয় নাগরিককে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

350(খ) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন বিষয়ের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারটি অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

❸ **সমাজে দুর্বল শ্রেণির শিক্ষা (Education of Weaker Section of Society):** দুর্বল শ্রেণির (অর্থাৎ সামাজিক এবং শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনজাতি ও উপজাতি) শিক্ষার স্বার্থে 15, 17 ও 46 নং ধারায় বক্তব্য আছে।

46 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ভারতের দুর্বলতর শ্রেণির বিশেষত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি শ্রেণির শিক্ষা ও আর্থিক স্বার্থে যাবতীয় উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করবে ও তাদের সকল প্রকার সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করবে।

15(3) নং ধারায় বলা হয়েছে, নারী এবং শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ সুবিধা প্রণয়ন করতে পারে।

❹ **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education):** সংবিধানের 25(ক) নং ধারায় সমস্ত নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মের অনুশীলন এবং প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের 28(1) নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি অনুদানে পরিচালিত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। আবার সংবিধানের 28(3) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র অনুমোদিত বা অর্থসাহায্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করে বা পূজার ব্যবস্থা করে, তাহলে সেখানে পাঠরত শিক্ষার্থীকে তার অথবা নাবালকের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

28(খ) নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো 'এনডাউমেন্ট' বা ট্রাস্ট কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

30 নং ধারায় বলা হয়েছে আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই তা সে ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন, কোনো পার্থক্য করা হবে না।

❺ **নারীশিক্ষা (Women Education):** সংবিধানের 15(ক) নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকার কোনো নাগরিককে লিঙ্গের ভিত্তিতে পার্থক্য করতে পারবে না।

16(ক) নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকারের অধীনে সমস্ত অফিসে নিয়োগ বা চাকরির ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ সকলেই সমান অধিকারী।

❻ **প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা (Mother-tongue in Primary Education):** সংবিধানে 351(ক) নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্য বা রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সন্তানরা যাতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবে। রাষ্ট্রপতি এই বিষয়ে নির্দেশ জারি করতে পারবেন।

❼ **হিন্দি ভাষার শিক্ষা (Hindi Language Education):** 351 নং ধারায় বলা হয়েছে, হিন্দি ভাষার উন্নতি ও প্রসার ভারত সরকারের দায়িত্ব। যাতে এই ভাষার মাধ্যমে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির উপাদানসমূহের সমৃদ্ধিকে গ্রহণ করতে ও প্রকাশ করতে পারে সেজন্য সংস্কৃত বা অন্য ভাষার শব্দ-সম্পদ চয়ন করা যেতে পারে। এই কাজে প্রতিভা, গঠনরীতি, প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গিমায় যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।

❽ **জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ (Preservation of National Culture):** সংবিধানের 49 নং ধারায় বলা হয়েছে, লোকসভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধ, শিল্প, ঐতিহাসিক নিদর্শনকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার নেবে।

❾ **অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বিদ্যালয়ে সাহায্য:** সংবিধানে 337 নং ধারায় বলা হয়েছে, সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে তিন বছর পর্যন্ত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে 1948 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যে সাহায্য দেওয়া হত তা দেওয়া হবে। তারপর প্রতি তিন বছর বাদে এই সাহায্য 10 শতাংশ হারে কমতে পারে। যেসব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুলে অন্য সম্প্রদায়ের 40 শতাংশ ছাত্র ভরতি করা হবে না সেখানে সাহায্য দেওয়া হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে উপরোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখের পরেও সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক লক্ষ্য আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন—

1. রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের ক্ষেত্রে "সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিসমূহ।"
2. "কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্কের" ক্ষেত্রে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

❶ রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের ক্ষেত্রে সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিগুলি হল—

সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- রাষ্ট্রকর্মের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত ও সহানুভূতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি ও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র অনধিক চোদ্দো বছরের বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।
- রাষ্ট্র দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির বিশেষ তফশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির শিক্ষার ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উপকার সাধন করবে এবং সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে।
- রাষ্ট্র জনসাধারণের খাদ্যের পুষ্টির পরিমাণ এবং জীবনধারণের মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করবে।
- একমাত্র ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার রাষ্ট্র নিষিদ্ধ করবে।
- শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায় তার জন্য রাষ্ট্রকে যত্নবান হতে হবে।

❷ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের। সপ্তম তপশিলে (ধারা 246) কেন্দ্রীয় স্তরে, রাজ্য স্তরে এবং যৌথ স্তরে ক্ষমতা বিভাজিত আছে। যেসব ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রের তাকে বলা হয় I নং তালিকা বা 'কেন্দ্রীয় তালিকা' (Union List)। রাজ্য স্তরে আইন প্রণয়নের বিষয়গুলিকে বলা হয় II নং তালিকা বা 'রাজ্য তালিকা' (State List)। তালিকা, III নং বা 'যৌথ তালিকার' (Concurrent List) ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে।

কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List)

কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট 97টি ধারার মধ্যে 7টি শিক্ষা সংক্রান্ত, যেমন—

- **ধারা 13:** এই অনুচ্ছেদে আছে বিদেশের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক।
- **ধারা 62:** এই অনুচ্ছেদে আছে সংবিধান শুরু হবার সময় থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার, ভারতীয় জাদুঘর, রাজকীয় যুদ্ধ বিষয়ক জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং ওই ধরনের অন্যান্য সংস্থা যা ভারত সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয় তাদের উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রের উপর।
- **ধারা 63:** সংবিধান চালু করার সময় বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুরূপ যেসব প্রতিষ্ঠান যা পার্লামেন্ট দ্বারা আইনসিদ্ধভাবে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে স্বীকৃত, তারা কেন্দ্রের পরিচালনায় থাকবে।

- **ধারা 64:** যেসব বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করে এবং যেগুলি পার্লামেন্ট দ্বারা আইনসিদ্ধভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত তাদের পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রের উপর।
- **ধারা 65:** ইউনিয়ন এজেন্সি এবং প্রতিষ্ঠান, যেমন—(ক) পেশাগত, বৃত্তিগত, কারিগরি ও শিক্ষণসহ পুলিশ অফিসারদের ট্রেনিং, (খ) বিশেষ পঠনপাঠন অথবা গবেষণার উন্নতি এবং (গ) অপরাধ অনুসন্ধান ও অপরাধী নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব কেন্দ্রের।
- **ধারা 66:** উচ্চশিক্ষা অথবা গবেষণাধর্মী বৈজ্ঞানিক কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগসাধন ও তাদের মান নির্ধারণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।
- **ধারা 67:** পার্লামেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শক যেমন—প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ এবং আর্কিওলজিক্যাল স্থান ইত্যাদি (তবে জম্মু ও কাশ্মীরে এটি বলবৎ হবে না)।

রাজ্য তালিকা (State List)

এই তালিকায় মোট 66টি ধারার মধ্যে মাত্র দুটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই দুটি ধারার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় রাজ্যের স্বাধিকারের কথাই বলা হয়েছে।

- **ধারা 11:** কেন্দ্র তালিকাভুক্ত 63, 64, 65, 66 এবং যৌথ তালিকাভুক্ত 25 নং ধারা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব শিক্ষার বিষয়ই রাজ্য তালিকাভুক্ত হবে।
- **ধারা 12:** রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত এবং আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগার, মিউজিয়াম ও একই ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ ও রেকর্ড (ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত) রাজ্য তালিকাভুক্ত হবে।

যৌথ তালিকাভুক্ত (Concurrent List)

এই তালিকার মোট 47টি ধারার মধ্যে 6টি ধারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত। ওইগুলি হল—

- **ধারা 20:** অর্থনীতি এবং সামাজিক পরিকল্পনা।
- **ধারা 25:** বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা।
- **ধারা 26:** আইন, মেকানিক্যাল এবং অন্যান্য পেশা।
- **ধারা 27:** সাহায্য এবং সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান।
- **ধারা 39:** সংবাদপত্র, পুস্তক এবং মুদ্রণশিল্প।
- **ধারা 40:** লোকসভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আর্কিওলজিক্যাল অঞ্চল।

শিক্ষার সামাজিক বিষয়সমূহ—বিশ্বায়ন, বহু সংস্কৃতিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্থায়ী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা
(Social Issues of Education—Globalization, Multiculturalism, Secularism, Education for Sustainable Development)

সমাজই শিক্ষার জনক এবং তাকে লালনপালন করে বর্তমানে একটি অবস্থায় উপনীত করেছে। যেহেতু সমাজ গতিশীল তাই শিক্ষাও গতিশীল। বর্তমানে যেসব সামাজিক বিষয়সমূহ আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং স্থায়ী উন্নয়নের শিক্ষা। নিম্নে এইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বিশ্বায়ন (Globalization)

গত দু-দশক ধরে যে হারে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হচ্ছে তা সারা পৃথিবী জুড়ে সংযোগসাধন প্রক্রিয়াকে অনেকটাই উন্নত করেছে। সমগ্র পৃথিবীই যেন মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। একজন ব্যক্তির কাছে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই যেন খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। তাই প্রত্যেক দিনই পৃথিবীব্যাপী জনগণের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন পণ্য ও সেবার আদানপ্রদান, অর্থ ও তথ্যের আদানপ্রদান ঘটছে। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এবং সংযোগসাধন এখন জীবনের সাধারণ দিকগুলিকে তুলে ধরছে। একেই আমরা সাধারণভাবে বিশ্বায়ন বলতে পারি। 'Globalization' শব্দটি অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন যে, বিশ্বায়ন হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক একাত্মবোধ যা সম্ভবপর হয় দুটি দেশের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান, ধ্যান-ধারণার আদানপ্রদান, প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা, অর্থ এবং জনগণের আদানপ্রদান ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন দেশের বহুমুখী বিষয়াদি, যেমন—সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বায়নের ফলে মানুষের মধ্যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মনির্ভরতা, ঐক্য ও সংযোগসাধন বেড়ে যায়—যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হয় এবং এর ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক স্তরে এক ধরনের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষাগত, আইনি নীতি ও সামাজিক আন্দোলনগুলি সংঘটিত হতে দেখা যায়।

Graham (1996)-এর বক্তব্যকে অনুসরণ করে বিশ্বায়নকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় "A set of processes by which the world is rapidly being integrated into one economic space via increased international trade, the internationalization of production and financial markets, the internationalization of a commodity, culture promoted by increasing networked global telecommunication system."

বর্তমানে বিশ্বায়নকে তুলে ধরার জন্য যে সংস্থা অবদান রেখেছে তা হল World Trade Organization, যা WTO নামে পরিচিত। এটি স্থাপিত হয় 1995-তে। এই সংস্থার মাধ্যমে 142টি দেশ সারাবিশ্বে 90% বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল সরল, পরিচ্ছন্ন, শুল্কমুক্ত এবং যথাযথ সরবরাহ অব্যাহত রাখা। এটি নিম্নলিখিত বিষয়াদির ব্যবস্থা করেছে—

- বাণিজ্যসংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান,
- বাণিজ্য নীতিগুলির পুনর্বিবেচনা,
- বাণিজ্য চুক্তিগুলি কার্যকরী করা,
- বাণিজ্য বিষয়ক সমঝোতার একটি মঞ্চ বা ফোরাম হিসাবে কাজ করা,
- অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা রচনা করা,
- উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বাণিজ্য নীতির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সাহায্যদান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নির্মাণ ইত্যাদি।

বিশ্বায়নের উপাদানসমূহ (Factors Contributing to Globalization)

(i) বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান কারণ হল বাজারের আয়তন বৃদ্ধি। বর্তমানে এমন সব ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান দেখা যাচ্ছে যারা কেবল একটি দেশের বাজারের উপর নির্ভর করে এই বাজার ব্যবস্থা পরিচালনা করে না।

(ii) বিভিন্ন দেশের উদ্‌বৃত্ত সম্পদগুলি যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব।

(iii) একটি দেশের সাময়িক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সহজে অন্য কোনো দেশ যেখানে সুগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান সেখানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা।

(iv) অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কম মূল্যে উৎকৃষ্ট মানের জিনিসপত্র প্রস্তুতিকরণ।

(v) দক্ষ অথচ অবিনিয়োগকৃত বাজারগুলিতে বিনিয়োগ ও বিস্তার ঘটানো।

(vi) সাংস্কৃতিক সঞ্চালন ও একতার পদ্ধতি অনুসরণ।

(vii) অন্য দেশ থেকে সস্তায় দক্ষ শ্রমিক ব্যবহারের মাধ্যমে জিনিসের উৎপাদন মূল্য কমানো ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ এবং বিশ্বায়ন (India and Globalization)

1991 খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে ভারতে বিশ্বায়ন শুরু হয়েছে। এই সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে বাধ্য করেছে। নিম্নলিখিত কতকগুলি কারণে 1991 খ্রিস্টাব্দে নরসিংহ রাও সরকার বিশ্বায়নের পথে হাঁটার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

(i) সরকারি ক্ষেত্র বা সরকার অধিকৃত ক্ষেত্রগুলিতে যে হারে বিনিয়োগ করা হয়েছে সে হারে লাভ পাওয়া যায়নি।

(ii) উপসাগরীয় যুদ্ধ, রপ্তানি সংস্থার কার্যকারিতা হ্রাস প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং ভারত বৈদেশিক ঋণভারে জর্জরিত হয়েছে।

(iii) অর্থনীতির উন্নয়নে বিভিন্ন স্তরে যেখানে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ প্রয়োজন সেখানে দেশীয় মূলধন পর্যাপ্ত নয়। এই কারণেও তখন ভারতে বিশ্বায়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল।

বিশ্বায়ন ও শিক্ষা (Globalization and Education)

উন্নয়নের যে-কোনো স্তরেই বিশ্বায়নের প্রভাব বিস্তার অপরিসীম। বিশ্বায়ন যেমন একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তার করে ঠিক তেমনই শিক্ষাব্যবস্থার উপরেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আর ঠিক সেই কারণেই শিক্ষার প্রক্রিয়া এবং অগ্রগতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করা প্রয়োজন। এখন শিক্ষার উপর বিশ্বায়ন কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি কীভাবে সাড়া দেওয়া উচিত সেগুলিকে কয়েকটি আঙ্গিক থেকে পর্যালোচনা করা যায়। একটি দিক হল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাঠক্রম, সমতা, চরম উৎকর্ষতা ইত্যাদি ব্যাপারে কী ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। আর অন্য দিকটি হল, বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি যা শিক্ষার ক্ষেত্র যেমন অর্থসংক্রান্ত বিষয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা আসন্ন আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটানোর জন্য যে ধরনের কৌশল প্রয়োজন সেগুলি নির্ধারণ করে। সাধারণ সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে বিশ্বায়নের আলোকে যেভাবে তত্ত্বগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয় তাতে বিশ্বায়নের প্রকৃতি সম্পর্কে এবং শিক্ষায় বিশ্বায়নের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। খুব কম গবেষক এবং তাত্ত্বিক বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়াদি এবং শিক্ষার নীতিসমূহ ও ব্যাবহারিক বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া ভারতবর্ষ বিশ্বায়নের নতুন ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে কেবল অনুসরণকারী না হয়ে নতুন কিছু চিন্তাভাবনার অবতারণা করতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলিও সেইভাবে স্থির করতে পারে, যাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন—জৈবপ্রযুক্তি শিক্ষা, নতুন শক্তির উৎস ইত্যাদি। সরকারকে অবশ্যই এই ক্ষেত্রগুলির উপর জোর দিতে হবে এবং গবেষণার মতো এই বিষয়গুলিতে যাতে আরও বেশি করে সুযোগ লাভ করতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

বিশ্বায়ন এবং পাঠক্রম (Globalization and Curriculum)

বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তি যেভাবে উন্নত হয়েছে তা জ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষা সঞ্চালনেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তথা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের দরজায় এনে দিয়েছে। তথ্যের সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

প্রযুক্তি কার্যকরী কাঠামো নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য এবং জ্ঞানের আদানপ্রদানকে তুলে ধরা হচ্ছে, ফলে মানুষ তার নিজের এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম কার্যকরী অংশ হল পাঠক্রম। সেই কারণেই পাঠক্রমের ধারাবাহিক প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির সাম্প্রতিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম গড়ে তোলা উচিত। এ ছাড়া পাঠক্রমে অপ্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বহীন বিষয়গুলিকে অবশ্যই বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

পাশাপাশি এই বিষয়গুলিতেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যে, শিক্ষা অবশ্যই নয়া মানবতাবাদী ধারণাকে তুলে ধরবে যার কতকগুলি আবশ্যিক নীতিগত উপাদান থাকবে এবং যা প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমৃদ্ধ হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সভ্যতার সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে, যা বিশ্বায়নের কেবল অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত দিকটি ছাড়া আরও অন্যান্য দিকগুলি তুলে ধরে। যৌথ মূল্যবোধের ধারণা নিয়ে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলে তা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে সহায়তা করবে। জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রক্রিয়ার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারের বিকাশ এবং তার ধারাবাহিক সংস্কারের প্রয়োজন। কারণ শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আর বিশ্বায়ন শিক্ষার এই দ্বারগুলিকে উন্মুক্ত করতে পারে।

বিশ্বায়ন এবং শিক্ষকের ভূমিকা (Globalization and Role of Teacher)

শিক্ষক এবং অন্যান্য যারা শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে জড়িত তাঁদের এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। তাঁদের সকলের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে মানবজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কিছু পরিণত ও সফলকাম শিক্ষকই অর্জন করে থাকেন।

বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষক শিক্ষণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন নতুন বিষয়বস্তু, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন কলাকৌশল। বর্তমানে বহু নতুন নতুন বিষয় ও প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে। সেগুলিকে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় শান্তি এবং সহনশীলতা, তথ্য ও সংযোগসাধন, প্রযুক্তি, মূল্যবোধ, নীতিশিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি অন্যতম আলোচ্য বিষয়ও একদিকে কেবল সাধারণ জনশিক্ষাকে যে বিনষ্ট করছে তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনগণের ধারণাকে অনেকটাই পালটে দিচ্ছে। কখনো-কখনো এই বিশ্বায়ন পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

সামগ্রিকভাবে বিশ্বায়ন এবং শিক্ষা উভয়ই উভয়ের উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সক্ষম। আসলে আমরা বিশ্বায়নের শিক্ষা, না শিক্ষার বিশ্বায়ন কোন্‌টা ঠিক চাইছি। তবে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে শিক্ষার বিশ্বায়নের অনেকগুলি ভালো ফলশ্রুতি আছে

তা স্পষ্ট নয়। সারা বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি, নতুন বিষয় শিক্ষণ, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বিশ্বায়ন সুপ্রভাব আনতে সক্ষম। তবে এ বিষয়ে দেশের শিক্ষানীতি প্রণেতা, শিক্ষা-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সকলেরই সক্রিয় অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছ চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটানোর প্রয়োজন আছে।

শিক্ষায় বিশ্বায়নের লক্ষ্যসমূহ (Objectives of Globalization of Education)

শিক্ষায় বিশ্বায়নের কতকগুলি লক্ষ্য বিদ্যমান। যেমন—

- বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষায় পাঠক্রম প্রণেতাগণের উদ্দেশ্য অনেকটাই স্বার্থহীন।
- তাঁরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেইসব দেশগুলিতে যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত।
- বিদেশি শিক্ষাদাতারা যে শিক্ষা তাঁদের নিজেদের দেশে প্রচলন করেছেন সেই শিক্ষাই অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত করতে চান।

AICTE অর্থাৎ All India Council of Technical Education বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দেশে অনুপ্রবেশে যে ধরনের নিয়মশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছে সেগুলি অনেকটাই এই লক্ষ্যগুলিকে তুলে ধরেছে। এর অন্যতম কারণ অনেক সময়ই উন্নত বিশ্বের দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তাদের ঔপনিবেশিক চরিত্রের জন্য শিক্ষা নিয়ে ব্যাবসা করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

যা হোক, বিশ্বায়নের যাঁরা সমর্থক তাঁরা বিশ্বায়ন সম্পর্কে নানা যুক্তি তুলে ধরেন। যাঁরা শিক্ষার অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা মনে করেন যে, এই ব্যবস্থাটি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী।

1. জীবিকা/কাজের সুযোগ এবং অর্থনীতির প্রয়োজনসমূহ শিক্ষার বিশ্বায়নের অন্যতম চালিকা শক্তি।
2. বর্তমানে বিভিন্ন জীবিকা ও কর্মের জন্য যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রকৌশলের প্রয়োজন বা চাহিদা বর্তমান তাও শিক্ষার বিশ্বায়নের প্রতি আলোকপাত করে।
3. মানবজীবনের অন্যতম লক্ষ্য হল কর্মজীবনে সফলতা অর্জন এবং তা যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।
4. প্রকৃতিগতভাবে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবিকা সন্ধানে অগ্রসর হয়।
5. সারা বিশ্বে একই ধরনের কাজের জন্য একই ধরনের প্রকৌশল, পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন।
6. বৈদিক সংস্থাগুলি প্রদত্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাগুলি যে সমস্ত মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত সেগুলির কোনোটিরই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বা মনোবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রয়োগ নেই।

যাঁরা শিক্ষার বিশ্বায়নের ধারণাটিকে সমর্থন করেন না তাঁরা বিষয়টির নেতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—

1. যে সমস্ত দেশে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য এক হতে পারে না। কারণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আর-একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের আদর্শ কখনোই এক হতে পারে না এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিফলন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হয়।
2. দেশ ও সংস্কৃতি ভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।
3. শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং বিদেশি শিক্ষায় যে সমস্ত সাংস্কৃতিক বিষয় বর্তমান সেগুলি অন্য সংস্কৃতির পক্ষে প্রযোজ্য নয়।
4. পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা এ দেশের সামাজিক পরিবেশে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে পারে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
5. যে সমস্ত শিক্ষার্থী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষালাভ করেছে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে খাপ খাওয়াতে না পারলে পরবর্তী সময়ে ভয়ানক মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা সৃষ্টি হবে।
6. শিক্ষার বিশ্বায়ন এক ধরনের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করতে পারে এবং যে সামাজিক ব্যবস্থায় একতা, সাম্প্রদায়িক প্রীতি, সামাজিক অগ্রগতি বিদ্যমান সেখানে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শিক্ষার বিশ্বায়ন প্রণেতাগণ অবশ্যই এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক চিন্তা করেই বিশ্বায়ন ভাবনায় অগ্রসর হবেন। এই বিশ্বায়নকে যেন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ সকলেই বিশ্বশান্তি, সামাজিক একতা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের মনোভাব, বৈচিত্র্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন।

বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism)

সংস্কৃতির বহুত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সংস্কৃতির অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃতির ইংরেজি শব্দ Culture শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে লাতিন শব্দ 'Colere' থেকে। এই লাতিন শব্দটির অর্থ হল কর্ষণ করা। সুতরাং সংস্কৃতি বা Culture হল কর্ষণের মাধ্যমে যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই অর্থে সংস্কৃতি হল শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা পরিশীলিত আচার-অনুষ্ঠান বা মার্জিত রুচি। আবার অন্যভাবে বল যায়, সাংস্কৃতিক অশিক্ষা ও অশিষ্টাচার বিরোধী আচার-আচরণ। **জন ডিউই** তার 'Democracy and Education' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ''Culture means at least something cultivates, something ripened, it is opposed to raw and crude'' অর্থাৎ সংস্কৃতি হল চর্চার দ্বারা কিছু প্রাপ্ত বা পরিপক্বতার বিষয় এবং এটি স্থূল এবং

অপরিপক্কতার বিরোধ। সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝায় সুশিক্ষা, সুনীতি, সু-আচার প্রভৃতি। তবে এটি হল সংস্কৃতির সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি হল মানুষের বৈষয়িক সম্পর্ক এবং মানব সম্পদের সংমিশ্রিত প্রকাশ। বৈষয়িক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হল যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সৃষ্টি ও কারুকলা। এগুলি মানবজীবনের মুক্ত-স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে সাহিত্য, ললিতকলা ধর্ম জ্ঞান প্রভৃতি হল মানব সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে মানুষের সৃষ্টি সমস্ত কিছুই হল সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

সাংস্কৃতিক বহুত্ব বলতে বোঝায় যে সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ মিলে-মিশে, এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে বাস করে এবং একে অপরের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে ও নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় না এবং প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন করে সেই অবস্থা। ভারতীয় সংস্কৃতি হল এই ধরনের সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শনা। ভারতবর্ষের বিভিন্নদিকে বহু ধরনের সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে, যেমন—প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতি, ধর্ম, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, শিল্প, নৃত্য সংগীত ইত্যাদি।

বহুসংস্কৃতিবাদ ও শিক্ষা (Multiculturalism and Education)

বহুসংস্কৃতিবাদের মূল কথাটি হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অন্বেষণ। ভারতীয় দর্শন এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। ভারতীয় দার্শনিকগণ যেমন রবীন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, অমর্ত্য সেন প্রমুখ বহুসংস্কৃতিবাদের কথা তাঁদের লেখনী এবং সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে মনুষ্যত্ব বহুসংস্কৃতির মূল বিষয়, ব্যক্তির মধ্যে সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে বহুসংস্কৃতিবাদের লক্ষ্যপূরণ করা হয়। তার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন যাতে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে বহুসংস্কৃতিবাদকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষ বহুসংস্কৃতিবাদের দেশ। তাই বহুসংস্কৃতিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য যেসব পাঠক্রমিক, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

পাঠক্রম: যেসব বিষয়ে সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে সেগুলিকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি যাতে বহুসংস্কৃতিবাদকে শক্তিশালী করে সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা ও ইংরেজির সঙ্গে আর-একটি ভারতীয় ভাষা শিখবে। ভিন্ন ভাষীদের পক্ষে যাতে ভাষা শেখা সহজ হয় তার জন্য প্রাদেশিক ভাষায় ব্যাকরণকে সহজ করতে হবে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি: সহপাঠক্রমিক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির (ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে) শিক্ষার্থীদের মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। যেমন—বিদ্যালয়ের

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহুসংস্কৃতিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য নাটক করা যেতে পারে, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অন্য রাজ্যগুলিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা প্রয়োজন। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের কৃষি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হবে এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

জনসংযোগ ব্যবস্থা: বহুসংস্কৃতিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য রেডিয়ো, সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলিতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের শিক্ষা: গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিকে সমমর্যাদা এবং স্বাধীনভাবে আচার-অনুষ্ঠানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞাত করতে হবে। এ ব্যতীত আমাদের গণতান্ত্রিক শিক্ষায় যে ধৈর্য, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও যাতে শিক্ষার্থীরা সেইগুলি অনুসরণ করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা: বহুসংস্কৃতিবাদকে দৃঢ় করে তোলার জন্য প্রয়োজন হল সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদারতা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না হওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং তা যাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাসমাধানে সাহায্য করে তাকে নিশ্চিত করতে হবে।

বহুসংস্কৃতিবাদের ইতিবাচক দিক (Positiveness of Multiculturalism)

বহুসংস্কৃতিবাদের ইতিবাচক দিকগুলি হল—

1. বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বলে বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য সৃষ্টি করে এবং এর চর্চার ফলে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির উন্নয়ন ঘটে।
2. বিভিন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থানের ফলে একদিকে যেমন বহুসংস্কৃতিবাদ দৃঢ় হয় তেমনি প্রতিটি সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়।
3. ব্যক্তির সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি, যেমন—সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সমন্বয়বোধ বিকশিত হয়।
4. ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ, যেমন—উদারতা, অনুভূতিশীলতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, সৎসাহস প্রভৃতি বিকশিত এবং শক্তিশালী হয়।
5. বহুসংস্কৃতিবাদে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যার ফলে তারা নিরাপত্তা বোধ করে।
6. বহুসংস্কৃতিবাদ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।
7. অনেক ক্ষেত্রে বহুসংস্কৃতিবাদের সুযোগ বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মিশ্রণের ফলে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে যা জনগণকে আনন্দ দেয় একই সঙ্গে সৃষ্টিশীলতাকে

উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরনের সংগীতের সুরকে মিশ্রণ করে একাধিক নতুন সুরের জন্ম দিয়েছে যা জনগণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে এবং সুরকারের সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করেছে। সংগীত ছাড়া সংস্কৃতির অন্যান্য দিক, যেমন—শিল্প, ভাস্কর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে-এর একাধিক উদাহরণ আছে।

ইউনেসকো এই বহুসংস্কৃতিবাদকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে যার ফলে কেবলমাত্র সহযোগিতার অভাবে পৃথিবীর বুক থেকে যেন কোনো সংস্কৃতি মুছে না যায়।

বহুসংস্কৃতিবাদ ও সমস্যা (Multiculturalism and Problems)

বহুসংস্কৃতিবাদ অনেক সময় সমস্যার কারণ হয়, ভারতবর্ষে এ ধরনের একাধিক উদাহরণ আছে। বিশেষ করে ভাষা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে, সমস্যাগুলি যাতে পুনরায় না ঘটে সেজন্য সরকার ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং আলোচনার মাধ্যমে সব কিছুর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। সংখ্যাগুরুদের দাবিতে যেন তাদের ভাষা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়, সংখ্যালঘুদের দাবি-দাওয়াগুলিকে যেন যুক্তিসংগত মর্যাদা দেওয়া হয়। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকলেও প্রতিটি নাগরিককে এই বিষয়ে সচেতন করতে হবে। এর জন্য সমস্ত প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ও ধারণা (Meaning and Concept of Secularism)

স্বাধীন ভারতবর্ষ এমন একটি সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক সমাজগঠন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যেখানে সকল শ্রেণির জনগণ তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ এবং সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল নাগরিক যাতে তাদের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করে নিজের এবং সমাজের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করার সংকল্প গ্রহণ করেছে।

1949 খ্রিস্টাব্দের 26 নভেম্বর ভারতীয় সংবিধানকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার সময় 'Secularism' শব্দটি উল্লিখিত হয়নি। তবে পরবর্তীকালে অর্থাৎ 1976 খ্রিস্টাব্দে 42তম সংশোধনীতে এটিকে 'Preamble'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'Secularism' শব্দটি লাতিন শব্দ 'Seculam' থেকে এসেছে যার অর্থ হল This Present age অর্থাৎ বর্তমান সময়। বিংশ শতাব্দীতে ***George Jacob Holyoake*** সেকুলারিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। Holyoake 'সেকুলারিজম'-কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত সামাজিক এবং নৈতিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

1. মানুষের বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
2. যে-কোনো উপায়েই হোক সত্যের অনুসন্ধান এবং তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। তবে এই উপায়টি অবশ্যই পরীক্ষাযোগ্য হবে এবং মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হবে।
3. বর্তমান সময় বা বিশ্বের কল্যাণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
4. সব কিছুই যুক্তিভিত্তিক হবে কোনো অলৌকিক বা আধিভৌতিক বিশ্বাসের উপর নয়।
5. এইভাবে সেকুলারিজম অথবা ধর্ম নিরপেক্ষতার অলৌকিক বা 'ডিভাইন' ক্ষমতার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

অক্সফোর্ডের অভিধান অনুযায়ী 'Secularism' means the doctrine that morality should be based solely in regard to well-being of mankind in the present life to the exclusion of all consideration drawn from belief in God.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হল একমাত্র বর্তমান মানবজীবনের কল্যাণ এবং যেখানে ঈশ্বরের আদেশ বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আদৌ বিবেচনা গ্রাহ্য নয়। Chamber's অভিধান অনুযায়ী 'Secularism' as the ''belief that the state, moral, education, etc. should be independent of religion'' অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা হল একটি বিশ্বাস যা মনে করে রাষ্ট্র, নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রকৃত সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত নয় এবং সবরকম অযৌক্তিকতার বিরোধী।

ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism in Indian Concept)

ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী সেকুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ হল রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম নেই। রাষ্ট্র সব ধর্মকেই সমান গুরুত্ব দেয়।

ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি 1976 খ্রিস্টাব্দে অন্তর্ভুক্ত হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের ঐতিহ্যের স্তম্ভরূপ। সম্রাট অশোকের ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নয়, সম্ভবত মানব সভ্যতার একটি বিশেষ দিক। সম্রাট অশোক-ই সব ধরনের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং ধৈর্যশীল ছিলেন। সংবিধান রচনার মূল শিল্পী **ড. বি আর আম্বেদকর** ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে বলেছেন—সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বলতে জনগণের ধর্মের প্রতি অনুভূতিশীলতার অভাব বোঝায় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় কোনো বিশেষ ধর্ম অবশিষ্ট জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া পার্লামেন্টের ক্ষমতাভুক্ত নয়। ***Brubacher***-এর মতে—ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো ধর্মীয় ভিত্তি নেই। এটা হল নৈতিক শিক্ষার বিষয়। যদি সেকুলার রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকে, তা হল ধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমানসমূহ এবং বৈজ্ঞানিকগণ হল উচ্চস্তরের ধর্মীয় গুরু।

ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি **ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ** ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করেছেন—অনেকে মনে করেন যেহেতু আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ সেজন্য ধর্ম বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে আমরা বিশ্বাসী নই। কিন্তু এটা ঠিক নয়, প্রকৃত ঘটনা হল আমাদের দেশে সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং তার পছন্দ অনুযায়ী চলতে পারে। আমরা চাই সকল ধর্মের মঙ্গল। প্রতিটি ধর্ম তার নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে বিকশিত হোক। যেহেতু ভারতবর্ষ বহুধর্মীয় লোকের বাস সেইজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাই হল গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চলার পথে উৎকৃষ্ট উপায়।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী **পণ্ডিত জহরলাল নেহরু** ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—ধর্মে স্বাধীনতা সকলেরই থাকবে, রাজ্যগুলিতে ধর্মের প্রচার এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির স্বাধীনতা থাকবে। প্রতিটি ধর্মকেই নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং সমস্ত নাগরিকদের মধ্যেই সহযোগিতা এবং ধৈর্যের মানসিকতা থাকবে। এইভাবেই ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণেতাগণ ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা, সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ebook.dascoaching.in

সংবিধানের বক্তব্য (Constitutional Rights)

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছে। আমাদের সংবিধানে সব নাগরিকদের তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বক্তব্যগুলি হল—

1. সংবিধানের 25(1) নং ধারায়, সমস্ত নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্মের অনুশীলন এবং প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে।
2. সংবিধানের 28(1) নং ধারায়, বলা হয়েছে সরকারি অনুদানে পরিচালিত বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। আবার সংবিধানের 28(3) নং ধারায়, বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র অনুমোদিত বা অর্থসাহায্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করে বা পূজার ব্যবস্থা করে, তাহলে সেখানে পাঠরত শিক্ষার্থীকে তার অথবা নাবালকের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।
3. সংবিধানের 30 নং ধারায়, বলা হয়েছে, আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই তা সে ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন, কোনো পার্থক্য করা হবে না।

কোঠারি কমিশন (Kothari Commission 1964-66)

ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি কোঠারি কমিশনের বক্তব্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

1. রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন ও ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশমতো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বেসরকারি বিদ্যালয়েও এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বলে আশা করা যায়।
2. বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ কী করে ধর্মের মূল নীতিগুলি কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সেজন্য শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থ রচনা করবে।
3. বহুধর্মাবলম্বী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরধর্মসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব থাকলে সেখানে নাগরিকগণ মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে পারে। সমস্ত প্রধান ধর্মের মূল নীতি ও প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে হবে। সমগ্র দেশের বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে একই শিক্ষা দেওয়া হলে সর্বধর্মের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাবান হবে।
4. বিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করে যা আমাদের অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোভাবসম্পন্ন করে তুলবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য

(The Educational Implication of Secularism)

সংবিধানের নির্দেশানুযায়ী ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা যাতে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা জাগ্রত করে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষার যাবতীয় কর্মসূচিগুলিকে সঠিকভাবে রূপ দিতে হবে। এর জন্য যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন মুক্তমনের অধিকারী হওয়া, স্বাধীনচিন্তা, যুক্তিভিত্তিক চিন্তন, কুসংস্কারমুক্ত, সর্বধর্মকে শ্রদ্ধা করা, অন্যধর্মের প্রতি সহনশীলতা ইত্যাদি।

শিক্ষার সাহায্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করতে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হল—

শিক্ষার লক্ষ্য: নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রচিত হবে। যেমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা, মুক্ত চিন্তার প্রতি আস্থা, বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, ধৈর্য, মানবিকতাবোধ, সকলের প্রতি সমব্যবহার ইত্যাদি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংগঠন এবং পরিচালনা: ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রয়োজন হল এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, প্রমোশন এবং অন্যান্য সমস্ত প্রশাসন সংক্রান্ত কর্মে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং যুক্তিপূর্ণ মাপকাঠির ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু: শিক্ষার সর্বস্তরের পাঠক্রমে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না এবং কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সবধর্মের মূলনীতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যদিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন। বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা কোনো ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা উচিত। নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মকেই সমগুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের গুরুত্ব: ধর্মনিরপেক্ষতা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। কুসংস্কার এবং অলৌকিকতার পরিবর্তে যুক্তিশীল চিন্তনের উপর জোর দিতে হবে।

শিক্ষকের ভূমিকা: ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার শিক্ষকের অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষক নিজের আচার-আচরণে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরবেন।

স্থায়ী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা (Education for Sustainable Development)

বর্তমান শতাব্দীতে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত শব্দ হল স্থিতিশীল উন্নয়ন (বা যে উন্নয়নকে ধরে রাখা হয়), তবে আজ পর্যন্ত কোনো পরিবেশ বিজ্ঞানী স্থিতিশীল উন্নয়নের নির্দিষ্ট কোনো মডেল বা নীতি-নির্দেশিকা দিতে পারেননি। এমনকি স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাটিও ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এর প্রধান কারণ হল পৃথিবীর শিল্পোন্নত উন্নয়নের দেশগুলির পরিবেশ সমস্যা ও পরিবেশ ভাবনার সঙ্গে অল্পোন্নত দরিদ্র দেশগুলির সমস্যা ও ভাবনার বিপুল পার্থক্য। উন্নত দেশের মূল চেষ্টা সাসটেনএবিলিটি (sustainability) অর্থাৎ বর্তমানের পরিবেশগত বাধাগুলিকে দূর করে জীবনযাত্রার মানকে কীভাবে বজায় রাখা যাবে। শিল্প-সংক্রান্ত দূষণ দূরীকরণ বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের নিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরকে বজায় রাখা তাঁদের প্রধান দুশ্চিন্তা। গ্রিনহাউস গ্যাসের দ্বারা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের (CFC) ফলে ওজোন স্তরে ছিদ্র—এগুলি তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ দরিদ্র, তাদের বাঁচা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের জোগান কোথা থেকে কীভাবে আসবে, তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

অন্যদিকে অনুন্নত বা অল্পোন্নত দেশগুলিতে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা অর্থনীতি ও পরিবেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন দরিদ্র মানুষের কাছে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সমস্যার কথা তুলে লাভ নেই। আশু অর্থনৈতিক সমস্যা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের সঙ্গে আঞ্চলিক পরিবেশ অবনমনের মোকাবিলা করা তাঁদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয়।

স্থিতিশীল পৃথিবী (Sustainable World)

পরিবেশকে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হল স্থিতিশীল এক বিশ্ব গড়ে তোলা (to create a sustainable world), যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখনকার উন্নত জীবনযাত্রার ও স্বাস্থ্যের মান নিয়ে মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় থাকবে। ধারণযোগ্য মানে 'অপরিবর্তনশীল' নয়; এর অর্থ হল মানুষের জীবন ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু, পৃথিবী থেকে তা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে। যেমন ধারণযোগ্য পৃথিবীতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অন্নসংস্থানের জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে, একই সঙ্গে মাটির উর্বরতাও অক্ষুণ্ণ থাকবে যাতে পরের বছর আবার যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করা যায়। প্রতিটি মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিচ্ছন্ন জল সরবরাহ করা হবে, আবার সেই সঙ্গে এ-ও দেখতে হবে যাতে পরের বছরে একই পরিমাণে পানীয় জল পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় নষ্ট না করেও দেশ ও দশের মঙ্গল করা যায় তাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে।

স্থিতিশীল বা সহনশীল বা স্থায়ী উন্নয়নের সংজ্ঞা (Definition of Sustainable Development)

অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যেমন—

1. বিশ্বপরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশন বা ব্রান্টল্যান্ড কমিশন (Bruntland Commission)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টায় কোনো বাধা সৃষ্টি না করে, বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে। অর্থাৎ যে উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভাণ্ডারকে অটুট রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটায় তাই হল স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়ন (Development that needs the present without compromising the ability of future generations to much their own needs)।
2. **রবার্ট রিপিটো** তাঁর 'Global Possible' পুস্তকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে সেই জাতীয় উন্নয়ন পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা বৈদেশিক ঋণের বোঝা থেকে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মুক্ত করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলি বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশের অবনতি ও সম্পদ হ্রাস রোধ করে।
3. **ড. ইউদো আর্নেস্ট সিমোনিস** ***(Dr. Udo Ernst Simonis)***-এর মতে, স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে সেই উন্নয়ন প্রকল্পকে বোঝায় যার মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের গুণমান ও কার্যকারিতা বজায় রেখেও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা যায়।

স্থিতিশীল উন্নয়নের উপাদান (Factors of Sustainable Development)
স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি একটি চিত্রাকারে সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হল।

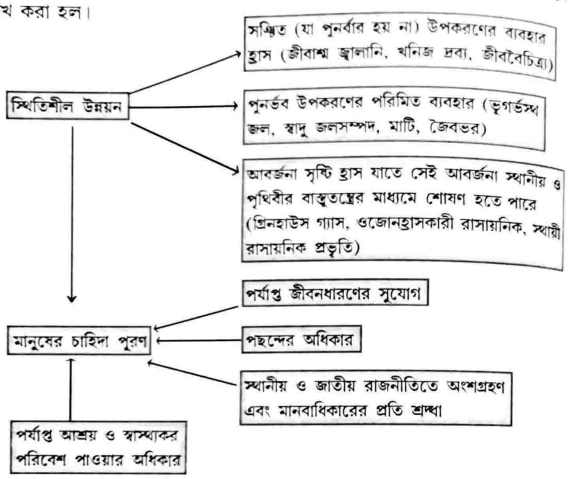

স্থিতিশীল উন্নয়নের চিন্তাধারা (Thoughts of Sustainable Development)
স্থিতিশীল উন্নয়নের মূলে আছে দুটি পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা। একদল পণ্ডিত মনে করেন প্রকৃতির উপকরণ জোগানোর সীমা আছে, অন্যদল মনে করেন এই সীমাবদ্ধ প্রকৃতির থেকেই উন্নয়নের সম্ভাবনা খুঁজে পেতে হবে। স্থিতিশীল উন্নয়ন মানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতা—এই দুই-এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়ে তোলা। স্থিতিশীল উন্নয়নকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে সামাজিক দিকটি গুরুত্ব পায়। অর্থাৎ সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা শ্রেণির মানুষের হাতে অসমভাবে বণ্টিত। এই গোষ্ঠী বা শ্রেণিগুলি কোন্ উপকরণ কতখানি ব্যবহার করছে, তার কুফল ও সুফল কতখানি পাচ্ছে, উন্নয়নের ফলে এই অনুপাতে কী ধরনের পার্থক্য ঘটছে—এই বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল কথা হল প্রকৃতি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে—তা নয়, সমাজের কোন্ শ্রেণির মানুষ, প্রকৃতি ব্যবহারের ধরন নির্ধারণ করে তার উপর। শুধু তাই নয়, স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন করলে তা হবে স্থিতিশীল উন্নয়ন।

স্থিতিশীল উন্নয়নের সঙ্গে মিশে আছে 'গভীর বাস্তুসংস্থান' (Deep ecology)-এর তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হয় যে, অন্যান্য জীব প্রজাতি ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের ঐক্যকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। গভীর বাস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসীরা মনে করেন অন্যান্য প্রজাতিরও স্থিতিশীল অস্তিত্বের অধিকার আছে, মানুষের কাছে তার মূল্য থাক বা না থাক। এই তত্ত্ব আবার স্থিতিশীল উন্নয়নকে দ্বিধায় ফেলে দেয়—স্থিতিশীল উন্নয়ন মানুষের জন্য না সমগ্র জীবমণ্ডলের জন্য? সামাজিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন ও বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে সঠিক পরিচালনা পদ্ধতি বেছে নিয়ে পরিবেশ উন্নয়ন (Eco-development) সম্পর্কে এই বিরোধ কিছুটা মেটানোর চেষ্টা করে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের উপায় (Ways of Sustainable Development)
পৃথিবীর অল্পোন্নত দেশগুলি চেষ্টা করছে বর্তমানের পরিবেশের বাধাগুলি দূর করে তাদের অধিবাসীদের সেই দেশগুলির সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে যাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। এর থেকেই 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' কথাটি এসেছে। শুধু তাই নয় স্থিতিশীল উন্নয়ন কীভাবে হবে তা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। একদল পরিবেশবিদের মতে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পাশ্চাত্য মডেল আমাদের সামনে আছে তাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলা চলে না; এপথে উন্নয়ন করতে গেলে পরিবেশের অবনমন ঘটবেই এবং এমন একটা সময় আসবে যখন উন্নয়ন ব্যাহত হবে। অন্যদের বক্তব্য হল একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই বর্তমানে এসব দেশের প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারের ধরন বদলানো সম্ভব। কেউ কেউ এ-ও মনে করেন যে দারিদ্র্যই পরিবেশ অবনমনের জন্য দায়ী। আবার অন্যদের মতে পৃথিবীর ধনী দেশগুলির কাজকর্মের জন্যই গরিব দেশগুলির পরিবেশের অবনমন ঘটছে।

বর্তমানে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাকে কোনোমতেই স্থিতিশীল বলা চলে না। জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে গিয়ে বা ধনী দেশগুলির উঁচু জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে গিয়ে আমরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে নির্বিচারে ক্ষয় করে চলেছি। পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস, কাঠ ও খনিজদ্রব্যের পরিমাণ দ্রুতহারে ক্ষয় পেয়ে চলেছে। এগুলির পরিবর্ত দ্রব্য উদ্ভাবন না করতে পারলে এবং এগুলিকে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আমাদের জীবন রক্ষা করা কঠিন হবে। সুতরাং আমাদেরও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে এখন থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে পরিবেশের অবনমন ঘটে, মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে না পড়ে।

'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শুধু একটা বিমূর্ত ধারণা বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নয়। 1960 খ্রিস্টাব্দ থেকে ধীরে ধীরে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বজুড়ে যে তীব্র বিতর্ক গড়ে ওঠে এটি তারই ফল। এর মধ্যে দুটি আঙ্গিক রয়েছে—উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ (অর্থাৎ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য, যেমন অর্থনৈতিক বিকাশ, মৌলিক চাহিদা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ইত্যাদি); এবং উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ।

ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন স্ট্রাটেজি (World Conservation Strategy, 1980) সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। এই কর্মপদ্ধতির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল— (i) মানুষের অস্তিত্বরক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বাস্তুসংস্থানিক প্রক্রিয়াগুলিকে সচল রাখা; (ii) জীবজগতের জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং (iii) প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীল ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। লক্ষ করার বিষয় হল এই যে, ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকগুলিকে উল্লেখ না করে কেবলমাত্র বাস্তুসংস্থানিক স্থিতিশীলতার (Ecological Sustainability) উপরে জোর দেয়। স্থিতিশীল নয় এমন উপকরণের ব্যবহার মানুষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে করে বা করতে বাধ্য হয় তার দিকেও এটি দৃষ্টি দেয়নি।

ব্রান্টল্যান্ড কমিশন (Brundtland Commission, 1987)

1983 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জ 'ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (World Commission on Environment and Development) নামে একটি সংস্থা গঠন করে। **গ্রো হারলেম ব্রান্টল্যান্ড** (***Gro Harlem Brundtland***) ছিলেন সভাপতি। 1987 খ্রিস্টাব্দে এই কমিশন (যা ব্রান্টল্যান্ড কমিশন নামে সুপরিচিত) প্রথম তার রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের নাম ছিল 'আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ' (Our Common Future)। এই রিপোর্টে কমিশন সদস্যরা পৃথিবীর সমস্ত দেশকে আহ্বান করেন 'স্থিতিশীল উন্নয়নকে' তাঁদের লক্ষ্য করে তুলতে এবং এর জন্য নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি গ্রহণ করতে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পুনর্জাগ্রত করা: পরিবেশের অবনমনের মূল কারণ হল দারিদ্র্য। বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে উপকরণের ভিত্তিকেও বাড়াতে হবে। পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলি এই অর্থনৈতিক জাগরণে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুণমান বদল করা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য স্থিতিশীল উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়, নিরাপত্তা ও সাম্য প্রভৃতি। আয়ের সুষম বণ্টন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রাযুক্তিক ঝুঁকিতে কম ক্ষতি, উন্নত স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা—এগুলির মাধ্যমে উন্নয়নের গুণমান বৃদ্ধি পাবে।

উপকরণের ভিত্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা: উন্নয়নকে স্থিতিশীল হতে গেলে পরিবেশগত উপকরণগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন পরিচ্ছন্ন বায়ু, জল, বন এবং মাটি, জীবজগতের বৈচিত্র্য ইত্যাদি। এ ছাড়া, এনার্জি, জল ও কাঁচামাল ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে হবে। উৎপাদন-দক্ষতা বাড়িয়ে মাথাপিছু প্রাকৃতিক উপকরণ ভোগের পরিমাণ কমাতে হবে এবং দূষণ ঘটায় না এমন পণ্য ও প্রযুক্তির দিকে ক্রমশ গুরুত্ব দিতে হবে।

স্থিতিশীল জনসংখ্যা বজায় রাখা: দেশের জনসংখ্যানীতি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে জনসংখ্যা স্থিতিশীল স্তরে থাকে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং গরিবদের জীবনযাপনের সুযোগ বাড়ানোর জন্য নয়া অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে জনসংখ্যা নীতিকে মেলাতে হবে।

প্রযুক্তির মোড় ফেরানো এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশে প্রাযুক্তিক উন্নয়নের দিক পরিবেশ-অভিমুখী করে তুলতে হবে। এর ফলে প্রযুক্তি ব্যবহারের ঝুঁকি কমে যাবে। এ ছাড়া পরিবেশগত এবং উন্নয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের সরবরাহ বাড়ানো দরকার।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবেশ ও অর্থনীতিকে মেলাতে হবে: দেশের নীতি সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের শুধুমাত্র আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে, পরিবেশগত লাভ-ক্ষতির হিসাবও করা দরকার। তাঁরা পরিবেশগত সমস্যার লক্ষণগুলিকে নয়, মূল উৎসগুলিকে খুঁজে বার করবেন।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনর্গঠন: উন্নতিশীল অনেক দেশের পক্ষেই আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণ করা কঠিন; এদের হাতে আন্তর্জাতিক স্তরের পুঁজি এবং উন্নত প্রযুক্তি অনেক সময়ে পৌঁছোয় না। এসব দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভিত্তিকে প্রসারিত করতে হবে এবং স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহায়তা বাড়াতে হবে: আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে পরিবেশগত সমীক্ষা, মূল্যায়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উপকরণ পরিচালনার উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এরজন্য প্রতিটি দেশকেই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনগুলি ঠিকমতো পালন করতে হবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিবেশগত ব্যাপারে গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা বাড়াতে হবে।

ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের সদস্যবৃন্দ
(Members of Brundtland Commission)

চেয়ারম্যান: ***Gro Harlem Brundtland*** (Norway)
ভাইস চেয়ারম্যান: ***Mansour Khalid*** (Sudan)
সদস্য: *Susanne Agnelli* (Italy)
Sahel.A.Al Aithel (Soudi Arab)
Bernard Chidzero (Zimbabwe)
Volker Hauff (Federal Republic of Germany)
Istvan Lung (Hungary)
Ma Shijun (People's Republic of China)
Nagendra Singh (India)
Saburo Okita (Japan)

Shridath S. Ramphal (Guyana)
William D. Ruckelshaus (USA)
Mohammad Sahnoun (Algeria)
Emil Salim (Indonesia)
Jamez Stamovnik (Yugoslavia)
Maurice Strong (Canada)
Paulo Nogueidra Neto (Brazil)

ebook.dascoaching.in

ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের কাজ ও সুপারিশ
(Functions and Recommendations of Brundtland Commission)

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ব্রান্টল্যান্ড কমিশন (Brundtland Commission) স্থাপিত হয় যার নাম দেওয়া হয়েছে World Commission on Environment and Development। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রান্টল্যান্ড (Gro Harlem Brudtland)-এর নেতৃত্বে 1987 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'আওয়ার কমন ফিউচার' (Our Common Future) বইটি। এই কমিশনের কাজ ছিল।

- পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলিকে পুনর্বার পরীক্ষা করে উদ্ভাবনী ও বাস্তব কর্মপ্রকল্পের রূপরেখা দেওয়া;
- পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সহায়তা বৃদ্ধি এবং বর্তমান ধারার বাইরে নতুন ধরনের সহযোগিতার পথ বার করা যাতে প্রয়োজনীয় দিকে সরকারি নীতির মোড় ফেরানো যায়; এবং
- ব্যক্তির ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে, গবেষণা সংস্থার ক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহদান।

ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রধান সুপারিশগুলিকে টোকিও ডিক্লারেশন (Tokyo Declaration) বলে। এগুলি হল—

- **উন্নয়নের পুনরুজ্জীবন:** পরিবেশ অবনমনের প্রধান উৎস হল দারিদ্র্য, সুতরাং উন্নতিশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়াতে হবে এবং উপকরণভিত্তিকে প্রসার করতে হবে। শিল্পোন্নত দেশগুলি, যাদের এই ক্ষমতা আছে, তাদের সমস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবদান রাখতে হবে।
- **উন্নয়নের গুণমানের পরিবর্তন আনতে হবে:** পুনরুজ্জীবিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণযোগ্য হবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে সামাজিক সাম্য, সামাজিক সুবিচার এবং নিরাপত্তা বিধান। এজন্য শক্তির ব্যবহার পরিবেশগত দিক থেকে নিরাপদ ও ধারণযোগ্য হবে। আয়ের সুবণ্টন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং প্রযুক্তিগত ঝুঁকি কমানো, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা—উন্নয়নের গুণমান বাড়াতে এগুলির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ।

- **প্রযুক্তির মোড় ফেরানো এবং বিপদের ঝুঁকি কমানো:** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের গতি বাড়াতে হবে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সকল দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মোড় ফেরাতে হবে এবং পরিবেশগত বিষয়গুলির প্রতি সুবিচার করতে হবে। আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সুবিধা বাড়াতে হবে। এভাবে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে নিশ্চিত করতে হবে।
- **পরিবেশ ও অর্থনীতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে মেলাতে হবে:** সরকারি ও রাজনৈতিক স্তরে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (যেমন নদীতে বন্যা প্রতিরোধের জন্য কী করা হবে), তার পরিবেশগত প্রভাব কী হতে পারে সেটা জানা দরকার। পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলির মূল উৎস কী তা খুঁজে বার করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
- **আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির সংশোধন:** উৎপন্ন দ্রব্য সহজে বাজারে পৌঁছোবার ক্ষমতা গড়ে তোলা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, আন্তর্জাতিক ঋণ প্রভৃতি দিক থেকে উন্নতিশীল দেশগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এসব দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভিত্তির প্রসার ঘটাতে হবে এবং নির্ভরতা গড়ে তুলতে হবে।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করে তুলতে হবে:** আন্তর্জাতিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় রাখা, নিয়মিত পরীক্ষা করা, মূল্যায়ন করা, গবেষণা ও উন্নতি, উপকরণ ব্যবস্থাপনার উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর জন্য সকল দেশকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে এবং বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে স্থিতিশীল মানবিক বিকাশ করতে হবে।
- **স্থিতিশীল উন্নয়ন:** উন্নয়নকে স্থিতিশীল হতে গেলে তাকে অর্থনৈতিক ছাড়াও সকল সামাজিক ও বাস্তুতান্ত্রিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, সকল জৈব ও অজৈব উপকরণ-ভিত্তিকে গণ্য করতে হবে, স্বল্পকালীন ছাড়াও দীর্ঘকালীন উপকারিতা ও অপকারিতার কথা খেয়াল রাখতে হবে এবং বিকল্প কর্মপদ্ধতি-গুলিকে বিচার করার পরে সঠিক পথটি খুঁজে নিতে হবে।
- **পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক:** পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এদের সমাধানও তাই পরস্পরনির্ভর। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ করে (Sectoral fragmentation) সেগুলির উদ্দেশ্য হিসাবে চিরকাল বিচার করা হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর বহু পরিবেশ ও উন্নয়ন সমস্যার উৎস এই ক্ষেত্রবিভাগের মধ্যে নিহিত আছে। যেমন—কৃষিদপ্তর

কৃষি উন্নয়ন বিষয়টি দেখবে, সেচদপ্তর সেচ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ মাপ করবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ না করে সামগ্রিকভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

- **উপকরণ-ভিত্তিক সংরক্ষণ ও প্রসার:** পরিচ্ছন্ন বাতাস, জল, অরণ্য এবং মৃত্তিকা জৈববৈচিত্র্য বজায় রাখা এবং এনার্জি-জল-কাঁচামালকে দক্ষভাবে ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে উন্নয়নকে স্থিতিশীল করে তোলা সম্ভব। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হবে এবং ক্রমশ দূষণবিহীন দ্রব্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে ঝোঁক বাড়াতে হবে।
- **স্থিতিশীল জনসংখ্যা বজায় রাখতে হবে:** জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এমন হতে হবে যে সেগুলি অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঙ্গে সুসংবদ্ধ। শিক্ষা এবং দরিদ্র শ্রেণির জীবনধারণের সুযোগ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিতে হবে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

(Other Important Recommendations for Sustainable Development)

লন্ডনের **সাসটেনএবিলিটি লিমিটেড** (Sustainability Ltd.) উপভোক্তাদের উদ্দেশ্যে একটি নীতির তালিকা প্রকাশ করে। এতে বলা হয় ভোক্তারা এমন দ্রব্য ব্যবহার করবেন না যা তো—

- নিজের বা অপরের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- উৎপাদন, ব্যবহার বা পরিত্যাগের সময়ে পরিবেশের বিশেষ ক্ষতি করে;
- উৎপাদন, ব্যবহার বা পরিত্যাগের সময়ে বিপুল পরিমাণে এনার্জি ব্যবহার করে;
- অপ্রয়োজনীয় অপচয় হয়;
- বিলুপ্তির মুখে এমন প্রাণী বা পরিবেশ থেকে কাঁচামাল গ্রহণ করে;
- পরীক্ষামূলকভাবে হলেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে পশুদের উপরে নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তৈরি; এবং
- অন্যান্য দেশকে, বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারিত হয় 1992 খ্রিস্টাব্দের রিও দি জেনেইরোর আর্থ সামিট বা ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এ (UNCED)। এই মূলনীতিগুলিকে রিও ডিক্লারেশন (Rio Declaration) বলে। এই ডিক্লারেশন স্টকহোমের পরিবেশ সম্মেলনের ঘোষণাগুলিকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয় এবং তার উপরে নতুন নীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে সমঝোতা ও সমান অংশীদারীর মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের মধ্যে নতুন স্তরের যৌথ প্রচেষ্টা গড়ে তোলা।

কতকগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করা যাতে সকলে স্বার্থ বজায় রেখে বিশ্বের পরিবেশ ও উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। পৃথিবীর সুসংহত, পরস্পরনির্ভর প্রকৃতিকে স্বীকার করে এই সম্মেলন ঘোষণা করে যে—

- স্থিতিশীল উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার মূলে আছে মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকার তাদের আছে।
- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মানুসারে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব পরিবেশগত ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ করার এবং নিজস্ব উপকরণ উত্তোলন ও ব্যবহারের অধিকার আছে। সেই সঙ্গে তাদের দায়িত্ব হল নিজ রাষ্ট্রের সীমানার ভেতরের কার্যাবলি যাতে সীমানার বাইরের কোনো রাষ্ট্র বা এলাকার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে তা সুনিশ্চিত করা।
- উন্নয়নের অধিকার এভাবে পূরণ করতে হবে যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকলের উন্নয়নগত এবং পরিবেশগত প্রয়োজনগুলি সমানভাবে পূরণ হয়।
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গী অংশ হল পরিবেশগত সুরক্ষা।
- প্রতিটি রাষ্ট্র কার্যকরী পরিবেশগত আইনকানুন তৈরি করবে। পরিবেশের নাম, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকারগুলি রাষ্ট্রের পরিবেশগত এবং উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলিত হবে। এক দেশের মান অন্য দেশের বেখাপ্পা বা প্রয়োজনীয় হতে পারে, বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে এর ফলে সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই দেশের পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী নিয়মগুলি তৈরি হবে।
- প্রতিটি রাষ্ট্র সাহায্যকারী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে। একতরফা চেষ্টার মাধ্যমে নিজের এলাকার বাইরের পরিবেশগত সমস্যার মোকাবিলা না করাই ভালো। পরিবেশগত উদ্দেশ্যে বাণিজ্যনীতি এমন হতে হবে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর অযৌক্তিক বাছবিচার বা ছদ্ম-নিয়ন্ত্রণ না থাকে।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ হল স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল কথা। সেই উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাষ্ট্র ও প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মানের তারতম্যগুলি দূর করা এবং পৃথিবীর মানুষের বৃহত্তর অংশে প্রয়োজনগুলি মেটানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন।
- উন্নতিশীল দেশগুলির বিশেষ অবস্থা এবং প্রয়োজনগুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত এবং পরিবেশগতভাবে বিপদের সম্মুখীন দেশগুলির কথা ভাবতে হবে। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে সব দেশগুলির স্বার্থ ও প্রয়োজনের কথা খেয়াল রেখে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন করতে হবে।
- পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রকে সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং পুনস্থাপন করার জন্য সমস্ত রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব

আলাদা হবে। উন্নত দেশগুলির প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ফলে যেসব সমাজ বিশ্বের পরিবেশের উপরে যে চাপ দিচ্ছে তার দায়িত্ব স্বীকার করে স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ খুঁজতে হবে।

- স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং সকল মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার মান পেতে গেলে প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল নয় এমন উৎপাদন এবং ভোগের ধরন কমাতে বা বাতিল করতে হবে এবং উপযুক্ত জনসংখ্যানীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রতিটি রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থিতিশীল উন্নয়ন করার জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা গড়ে তুলবে। তা সম্ভব হবে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক জ্ঞানের আদানপ্রদান, প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামঞ্জস্যসাধন, প্রসার এবং হস্তান্তরের মাধ্যমে।
- বিশেষ স্তরে সকল নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যাগুলির শ্রেষ্ঠ সুরাহা সম্ভব। জাতীয় স্তরে প্রতিটি ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক সরকারি তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রগুলি সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং অংশগ্রহীতায় উৎসাহ প্রদান করবে। বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি সাধারণ মানুষের সমস্ত সমস্যা সুরাহার ব্যবস্থা থাকবে।
- প্রভাবিত হতে পারে এমন দেশসমূহকে প্রতিটি রাষ্ট্র সময়মতো সতর্কবাণী এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি দেবে যা তাদের নিজের দেশের সীমানার মধ্যের কার্যাবলি বিষয়ে বা সীমানার বাইরে অন্যান্য দেশের পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। স্থিতিশীল উন্নয়ন করতে গেলে সেজন্য তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ অপরিহার্য।
- বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টিশীলতা, আদর্শ এবং সাহসকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বজোড়া সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য শ্রেয়তর এক ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে হবে।
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের বিষয়ে আদিবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়গুলি এবং অন্যান্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিজস্বতা, সংস্কৃতি ও স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তারা যাতে প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে তা দেখা।
- দমিত-পীড়িত মানুষের এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারীদের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে সুরক্ষা করতে হবে।
- স্থিতিশীল উন্নয়নের পরিপন্থী হল যুদ্ধবিগ্রহ। সেজন্য প্রতিটি রাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে পরিবেশের সুরক্ষামূলক আন্তর্জাতিক আইনগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সেগুলিকে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করবে।
- পরিবেশগত ক্ষতি ও দূষণের দায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে রাষ্ট্রগুলি জাতীয় আইন গড়ে তুলবে। এ ছাড়া তাদের এলাকার মধ্যে কার্যাবলির জন্য পরিবেশগত

ক্ষতির দায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আরও সুনিশ্চিত আন্তর্জাতিক আইন গড়ে তুলতে হবে।

- মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে বা পরিবেশের ক্ষতি করে এমন কাজকর্ম বা পদার্থ এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহযোগিতা করবে।
- প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ ক্ষমতানুযায়ী পরিবেশগত ঝুঁকি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করবে। যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবকে কারণ হিসাবে দেখিয়ে যেন পরিবেশগত অবনমনকে দীর্ঘায়িত হতে না দেওয়া হয়।
- প্রতিটি রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করবে যে দূষণকারী দূষণের ব্যয়ভার বহন করবে। এর জন্য সবরকমের পরিবেশগত ব্যয়কে ব্যয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment) করা আবশ্যিক করতে হবে। এর জন্য প্রতিটি দেশকে সুদক্ষ সংস্থা গঠন করতে হবে।
- প্রতিটি রাষ্ট্র কোনো বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যা অন্য দেশের পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে সে বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রকে অবিলম্বে সূচনা দেবে। আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলিকে সকল রকম সহায়তা দেওয়া হবে।
- শান্তি, উন্নয়ন ও পরিবেশের সুরক্ষা—এই তিনটি বিষয় পরস্পরনির্ভর এবং অবিচ্ছেদ্য।
- প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের সমস্ত পরিবেশগত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে এবং উপযুক্ত উপায়ে সম্মিলিতি জাতিপুঞ্জের চার্টার অনুযায়ী মেটানোর চেষ্টা করবে।
- বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং স্থিতিশীল সেখানকার অধিবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রেরণার মাধ্যমে এই ডিক্লারেশনে বর্ণিত নীতিগুলির আদর্শ পূরণে কাজ করবে এবং উন্নয়নের জন্য আরও আন্তর্জাতিক আইন গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। এ ছাড়া রিও সম্মেলনে গৃহীত হয় এজেন্ডা 21 (Agenda 21)—একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে স্থিতিশীল উন্নয়নে পৌঁছোবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি। 500 পাতারও বেশি এই নথিতে চারটি মূল রাজনৈতিক প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিত হয়—
  - সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
  - প্রাকৃতিক উপকরণ, ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র এবং তৎসম্পর্কিত মানবীয় কাজকর্ম, শিল্পের উপজাত দ্রব্য।
  - প্রধান গোষ্ঠীসমূহ; এবং
  - রূপায়ণের উপায়।

স্থিতিশীল উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়
(Sustainable Development and Social Justice)

স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণায় অপর একটি ধারণা নিহিত আছে—তা হল সামাজিক ন্যায়ের ধারণা। অর্থাৎ উন্নয়নের ফল সমাজের সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হতে হবে। রিও ডি জেনেইরোর সম্মেলনেও এই বক্তব্য জোর দিয়ে রাখা হয়েছে। পরিবেশগত সংকট সমাজের সকলকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না; অনেক সময়ে দেখা যায় যে যারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এবং অসহায়, তাদের জীবনধারণের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ অবনমনের মাধ্যমে। যেমন ধরা যাক বড়ো বাঁধগুলি আদিবাসী-অধ্যুষিত পাহাড়-বনাঞ্চলের মূল্যবান জমি ভাসিয়ে দেয়, উচ্ছেদ করে হাজার হাজার মানুষকে এবং তাদের চিরাচরিত জীবিকা থেকে সরিয়ে এনে 'পরিবেশগত উদ্‌বাস্তুতে' (Environmental refugee) পরিণত করে। অথচ সমভূমি অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়েরা এসকল বাঁধ-খাল-সেচ প্রকল্প থেকে লাভবান হয়। এখানেও গরিব চাষিরা পুঁজিবাদী কৃষির অত্যধিক ব্যয় বহন করতে না পেরে জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। খনি অঞ্চলে খননকার্যের ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেলে সবেচেয়ে আগে শুকিয়ে যায় অগভীর ডোবা, পুকুর ও কাঁচা কুয়োগুলি; এগুলি পানীয় জলের উৎস হিসাবে স্নান, বাসন ধোওয়া ও কাপড় কাচা প্রভৃতি গৃহস্থালির প্রয়োজনে ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির গ্রামবাসীরা। এদের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় উচ্চশ্রেণির ধনী চাষিরা। একারণে আধুনিককালে পরিবেশের অবনমনের আলোচনায় সামাজিক সাম্যের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে এসে পড়ে।

পরিবেশের অবনমন (Degradation of Environment)

প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি মানুষকে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে। এর ফলে প্রাকৃতিক উপকরণগুলি উত্তোলন ও ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে গেছে। মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, জীবনযাত্রার মান ক্রমশ উঁচু হচ্ছে, কলকারখানার সংখ্যা বাড়ছে, শহরগুলি প্রসারিত হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক উপকরণের চাহিদা বাড়ছে এবং প্রকৃতিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষ নিজের প্রয়োজনগুলি মেটাচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পরিবর্তনগুলি আসছে তা স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজে থেকেই ক্ষতিপূরণ হয়ে ঠিক হয়ে যেতে পারছে না। পরিবর্তিত পরিবেশ সমস্ত জীবজগতকেই প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করছে।

সুতরাং পরিবেশের অবনমন বলতে বোঝায় মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে পরিবেশের মূল গঠনে প্রতিকূল পরিবর্তনের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবেশের গুণ হ্রাস পাওয়া। পরিবেশের অবনমন বলতে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়াকেও বোঝায়। বর্তমান যুগে পরিবেশের অবনমন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাকে পরিবেশগত সংকট বলা হয়। এই সংকটের মূল দিকগুলি হল পরিবেশদূষণ, প্রাকৃতিক উপকরণের ক্ষয়, শিল্প-কৃষির

প্রসারের ফলে জীবজগতের আবাসস্থলের বিনাশ, অরণ্য নিধন এবং নানা জীবপ্রজাতির ধ্বংস। পরিবেশের অবনমনের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে সংকটের চেয়েও গভীর কিছু। কারণ সংকট হল অস্থায়ী একটা অবস্থা যা যে-কোনো সময়ে দূর হতে পারে। পরিবেশের অবনমন কিন্তু মানবজাতির জন্য স্থায়ী কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যাগুলির আশু সমাধান না হলে পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন উঠতে পারে।

পরিবেশের অবনমনের কারণ (Causes of Environmental Degradation)

পরিবেশবিদ **কার্সচেনের (Kirschen, 1974)** মতে পরিবেশের অবনমনের তিনটি মূল কারণ হল—

1. প্রাকৃতিক উপকরণের অতি দ্রুত হারে উত্তোলন ও ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনের বৃদ্ধি;
2. অধিক এনার্জি ব্যবহারকারী বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনের দ্রুত হার; এবং
3. ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহার এবং উচ্চ জন্মহারের ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি।

অন্যান্য পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে আরও কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করেন। এগুলি হল—

(i) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে বৃহদায়তন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়নমূলক প্রকল্প গঠন (যেমন—ব্রাজিলের বৃষ্টি-অরণ্যের মধ্য দিয়ে হাইওয়ে-নির্মাণ; বড়ো বড়ো বহুমুখী নদী-প্রকল্প);

(ii) দ্রুত প্রসারমান খনিজ উত্তোলন, শিল্প, ছড়িয়ে-পড়া শহরের বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিণত হচ্ছে মানুষের হাতে গড়া কাঠামোতে;

(iii) কৃষির প্রসার—বন কেটে পরিষ্কার করে চাষবাস প্রসারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা হ্রাস, অধিক পরিমাণে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ;

(iv) সমাজের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি আচরণ বদলে যাচ্ছে; এবং

(v) প্রকৃতি থেকে দূরে বড়ো হওয়া, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

পরিবেশ অবনমন ও সামাজিক সাম্য
(Environmental Degradation and Social Equality)

মানবজাতি অতীতকাল থেকে যে উন্নয়নের পথ ধরে এসেছিল, তাতে পরিবেশের উপর তেমন কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়ত না। কিন্তু ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে মডেল গড়ে উঠেছে, আধুনিককালে উন্নতিশীল দেশগুলি সেই মডেলের অনুসরণে চলতে শুরু করেছে। এই মডেলের ভিত্তি হল প্রাকৃতিক উপকরণের

আরও বেশি উত্তোলন ও ব্যবহার, এনার্জি-নিবিড় জীবনযাত্রা ও কলকারখানা, বড়ো বড়ো রাস্তাঘাট ও শহর প্রভৃতি নির্মাণ।

এর ফলে যে প্রশ্নটি আধুনিককালে বড়ো হয়ে উঠেছে তা হল 'পরিবেশের বিনাশ না ঘটিয়ে মানবজাতি কি উন্নয়নের পথে এগোতে পারে?' পরিবেশ সম্পর্কে চেতনা এবং অর্থনৈতিক প্রগতি যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দুই যোদ্ধা, এদের একত্রে মেলানো কঠিন। একদিকে মানবজাতি বিপুল প্রাযুক্তিক উন্নতি ঘটিয়েছে; অন্যদিকে এর মূল্য দিতে হচ্ছে বিপুল পরিবেশগত সমস্যার মধ্য দিয়ে। এরই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর জনসংখ্যার নানা অসাম্য—উপকরণ ও সম্পদ বণ্টনে এবং পরিবেশগত সমস্যার ভুক্তভোগী হিসাবে সকল গোষ্ঠী সমান নয়।

পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত উন্নত, ধনী দেশগুলির অধিবাসীরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ অথচ পৃথিবীর মোট এনার্জির অধিকাংশই ভোগ করে। পৃথিবীর মোট সম্পদের আশি শতাংশ এসব দেশের নিয়ন্ত্রণে, এরাই পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে এবং সর্বাধিক পরিমাণে আবর্জনা (বর্জ্য পদার্থ) সৃষ্টি করে। আজ যে সকল গ্রিনহাউস গ্যাস ও কেমিক্যাল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, সেগুলি প্রধানত সেই শিল্পোন্নত দেশ থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

অন্যদিকে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির অধিবাসীরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ। অথচ পৃথিবীর মোট সম্পদের এক-চতুর্থাংশের মালিকানা তাদের হাতে। তবে উন্নতিশীল দেশগুলির কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ পরিবেশের অবনমন ঘটায় না একথাও ঠিক নয়; জীবনধারণের প্রয়োজনে গাছ কেটে, মাটির ক্ষয় ঘটিয়ে তারাও পরিবেশের বিনাশ ঘটায়।

সুতরাং, পরিবেশের অবনমন প্রসঙ্গে সাম্যের প্রশ্নটিকে অগ্রাহ্য করা চলে না। পৃথিবীর ধনী ও গরিব দেশগুলির মধ্যে তারতম্য আছে বলেই প্রশ্ন ওঠে, 'পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে ঠিক কোন্ পথে উন্নয়ন করা উচিত?' মানবজাতিকে কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দূষিত পরিবেশের উত্তরাধিকার পেতেই হবে? একারণে বর্তমানকালে 'স্থিতিশীল উন্নয়নের' ধারণা গড়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশের সরকার, নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক নেতারা 'স্থিতিশীল উন্নয়নের' তাৎপর্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন।

'স্থিতিশীল উন্নয়ন' ধারণার সমালোচনা
(Criticism of the Concept of Sustainable Development)

ব্রান্টল্যান্ডের 'আওয়ার কমন ফিউচার' বইটিতে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা প্রকাশিত হওয়ার পরে এটির প্রচুর সমালোচনাও হয়েছে। এই সমালোচনার মূল যুক্তিগুলি এরকম—

ধারণাটি ধোঁয়াটে: স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা প্রস্তাব করে বর্তমান উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে। কী রকম এই উন্নয়ন? এই উন্নয়ন পাশ্চাত্যমুখী, ধনতান্ত্রিক আদর্শে গড়া, বিশ্বায়নের

সমর্থনকারী একক এক বিশ্ব-বাজার ভিত্তিক উন্নয়নের মডেল। এই মডেলেই বর্তমানযুগের পরিবেশে সমস্যাগুলি সৃষ্টি করেছে। সুতরাং স্থিতিশীলতা আনার অর্থ হল প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলিকে আরও নতুনতর, উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্যে সংশোধন করা এবং দারিদ্র্যের ফলে ওই প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাতে হ্রাস না পায়, তা দেখা।

ধারণাটি পরিবেশ ও উন্নয়নের একক অর্থনৈতিক রূপ কল্পনা করে: পরিবেশ যেন একটি 'উপকরণ' মাত্র, এই উপকরণকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা দরকার—স্থিতিশীল উন্নয়ন যেন একথাই বলতে চায়। এই লক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে পরিবেশের অর্থনৈতিক ছাড়া অন্যান্য সম্পর্কগুলি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে ত্রিমুখী সম্পর্কের কল্পনায় এ কথা মনে রাখা হয় না যে সমাজেরই অংশ হল অর্থনীতি। কিন্তু অর্থনীতি ও সমাজ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়।

স্থিতিশীল উন্নয়ন বর্তমানের অসাম্য দূরীকরণের উপায় নির্দেশ করে না: বর্তমানে অনেক অল্পোন্নত দেশ, অঞ্চল বা গোষ্ঠীর মানুষেরা উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন, কিংবা উপকরণ ব্যবহারের অধিকার তাঁদের নেই। স্থিতিশীল উন্নয়ন এই সমস্যার দিকে আলোকপাত করে না।

ধারণাটি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন: 'ভবিষ্যৎ' বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। স্থিতিশীল যে 'ভবিষ্যৎ'-এর কল্পনা করা হয় তা সুদূরপ্রসারী পাশ্চাত্য ধারণা। প্রাচ্যের ধীর গতিতে চলা প্রাচীন সমাজগুলিতে 'সময়ের' সম্পর্কে ধারণা এক নয়।

ইউনেস্কো এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন
(UNESCO and Sustainable Development)

স্থিতিশীল উন্নয়নে ইউনেস্কোর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে 1976 খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেড চার্টার নামে UNESCO Environment Programme এবং 1977 খ্রিস্টাব্দে জর্জিয়ায় (USSR) Tiblisi Declaration বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে পরিবেশবিদ্যার লক্ষ্য হিসাবে 5টি ধারণার কথা বলেন। এগুলি হল বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem), জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তি, পরিবেশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং পরিবেশ নৈতিকতা।

Tiblisi Declaration-এ পরিবেশ বিদ্যার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উল্লেখ করা হয়।

Tiblisi ডিক্লারেশনে পরিবেশ শিক্ষার নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ব্যক্ত করা হয় (Objectives of Environmental Education):

- **সচেতনতা:** সামগ্রিক পরিবেশ এবং তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিসকল এবং সামাজিক গোষ্ঠীদের সচেতনতা অর্জনে সাহায্য করা।
- **জ্ঞান:** পরিবেশ এবং এর সমস্যাবলি সম্পর্কে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং মৌলিক জ্ঞান অর্জনে ব্যক্তিসকল এবং সামাজিক গোষ্ঠীকে সাহায্য করা।

- **দৃষ্টিভঙ্গি:** পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যবোধ এবং অনুভূতি গড়ে তুলতে সাহায্য করা এবং পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে ব্যক্তিসকল এবং সামাজিক গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করে।
- **দক্ষতা:** পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলিকে নির্দিষ্ট করা এবং তার সমাধানে ব্যক্তিসকল এবং সামাজিক গোষ্ঠীকে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।
- **অংশগ্রহণ:** পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাসমাধানের সব ধরনের কর্মসূচিতে সকল স্তরের জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণে সুযোগ সৃষ্টি করা।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতীয়তার অর্থ (Meaning of Nationalism)

যখন জাতি, রাজনীতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে প্রাক্ষোভিক অনুভূতি দ্বারা দেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় তখন আমরা তাকে জাতীয়তাবাদ বলতে পারি।

Humaun Kabir-এর মতে, "Nationalism is that which depends on we feeling towards the nation." দেশের নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য হল দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং দেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ঐক্যকে বজায় রাখা এবং যখন দেশের জনগণের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব থাকে তখন তারা খুব সহজেই দেশের জন্য নিজেদের সম্পদ, প্রাণ এগুলি বিসর্জন দিতে পারে। তাই বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ হল সেই ধারণা যার মাধ্যমে দেশের জনগণ সংকীর্ণ পার্থক্যগুলির অনেক ঊর্ধ্বে উঠে দেশের বিকাশের জন্য একাত্মভাবে কাজ করতে পারে। জাতীয়তাবাদ হল সমস্ত হৃদয় দিয়ে দেশের প্রতি প্রশ্নাতীতভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা যা দেশকে গৌরবময় ভবিষ্যৎ প্রদান করতে পারে।

জাতীয়তার ধারণাকে ***Jawaharlal Nehru*** বলেছেন, "Nationalism is such a strange element which while it instills life development energy and integration, at the same time makes it narrow because on account of it a person thinks about his own country as separate from other countries of the world."

উপরের এই বক্তব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের অন্য একটি দিককে তুলে ধরা যায়, তা হল জাতীয়তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ—অন্যান্য দেশের প্রতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে বৈরী মনোভাব পোষণ। আবার জাতীয়তাবাদের এই ধারণাকে ভিত্তি করে অনেক দেশ তাদের জাতীয়তাবাদকে অন্যান্য দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চায় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় আমেরিকা বা ব্রিটেনের জাতীয়তাবাদের কথা।

জাতীয় সংহতির অর্থ (Meaning of National Integration)

একটি দেশের সমস্ত নাগরিক যখন তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যতিরেকে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি শক্তিশালী ইতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করে তখন তাকে আমরা জাতীয় সংহতি বলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতি কোনো ধারণা নয়, এটি একটা ক্রিয়া বা কর্ম যা যৌথভাবে একটা দেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা হয়। তাই জাতীয়তারই একটা প্রকাশ হল জাতীয় সংহতি। তাই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, জাতীয় সংহতি হল একটি প্রক্রিয়া আর জাতীয়তা হল তার বহিঃপ্রকাশ বা ফলশ্রুতি।

জাতীয় সংহতির সমস্যাসমূহ (Problems of National Integration)

সাধারণত যে সমস্ত দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত বা ধর্মীয় বিভেদ নেই সেই সেই ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির কোনো সমস্যা দেখা যায় না। সেই কারণে যে-কোনো দেশের সামাজিক ও জাতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি বিষয়ে ঐক্য বজায় রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের মতো দেশে জাতীয় সংহতি একটি অন্যতম সমস্যা। এর অন্যতম কারণগুলি হল—

(i) ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। কিন্তু যারা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ভোগে তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ বর্তমান।
(ii) পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের জাতিগোষ্ঠীর সন্ধান এখানে পাওয়া যায়।
(iii) ভারতে প্রায় একশোর বেশি ভাষা ব্যবহার করা হয় যার রূপ অঞ্চলভেদে আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।
(iv) ভারতের জনগণ বহু ধরনের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেছে।
(v) ভারতে প্রতিদিন গাছের শাখাপ্রশাখার মতো রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বাড়ছে।
(vi) ভারতে কয়েক শত জাতি আছে, যাদের আবার বহু উপজাতি বর্তমান।
(vii) ভারতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ফলশ্রুতি এখানে সমভাবে বণ্টিত হয়নি।
(viii) সমাজে উচ্চ শ্রেণি এবং অধিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণ মানুষের জন্য জায়গা ছাড়তে চায় না।
(ix) ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা গেলেও সরকার এ বিষয়ে কোনো সুদৃঢ় প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।
(x) রাজনৈতিক স্বার্থ, সংঘাত, আঞ্চলিকতাবাদ, অবাধ অনুপ্রবেশ, বিদেশি মদতপুষ্ট অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী সংগঠনগুলিও ভারতের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ভয়ংকর সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in

জাতীয় অসংহতির গুরুত্বপূর্ণ উৎসসমূহ
(Important Sources of National Disintegration)

1. ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজন: 1947 খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও বহু মুসলিম ভারতে থেকে যান যাঁদের পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনায় কিছু কিছু ভারতীয় গোঁড়া মুসলিম এবং গোঁড়া হিন্দুদের মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছে।

2. বহু ধর্মের উপস্থিতি: ভারতবর্ষ সাংবিধানিক নীতিগত দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। আর ভারতে বহুধর্মের একত্র অবস্থান দেখা যায়। যেমন—হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, পারসি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ধর্মের বহু শ্রেণিবিভাজন। এই ধর্মগুলির মধ্যে আবার মতাদর্শগতভাবে নানা অমিল দেখা যায়। কারণ অনেকেই একে অপরের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব বজায় রাখে, ফলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়।

3. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য: ভারতীয় সমাজ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি শ্রেণি আবার অর্থনৈতিক সুবিধার এবং দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করেছে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে সামাজিক অসাম্য। দেশের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর অসম বণ্টনও এর জন্য অনেকটাই দায়ী। দিন দিন ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য আরও বাড়ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য আবার শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে আসছে, ফলে ধনী-দরিদ্র বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে।

4. আঞ্চলিকতাবাদ বা আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা: স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে ভাষাভিত্তিক বহু রাজ্য পুনর্গঠিত হয়েছে। যেমন—তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত আরও নানা রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড় এবং সকলেই সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বলে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। অনেকে আবার আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দুর্বল শ্রেণি মনে করে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম আঞ্চলিকতাবাদের জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গ সহ অসম, নাগাল্যান্ড বা জম্মু-কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ গড়ে তুলছে।

5. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য: ভারত বহুবিধ সংস্কৃতির মিলনের দেশ। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবার বহুক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক। মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরের মধ্যেই এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। যুগ যুগ ব্যাপী ভারতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসক শাসন করেছেন। তাঁরা অনেকেই দেশের সকল মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় এমন

নিম্ন সংস্কৃতির প্রচলন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মোগল সম্রাট আকবরের কথা বলা যায়। ব্রিটিশ শাসকরাও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া এনেছিলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ভারতীয় জনগণ তাদের আদি অকৃত্রিম সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার তা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব—যা সামাজিক বিভাজনকে প্রকট করে তুলেছে।

6. সাধারণ ভাষার অনুপস্থিতি: ভারতবর্ষে বসবাস করে অজস্র ভাষাভাষীর মানুষ। এদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 20টি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হিন্দিকে জাতীয় ভাষা এবং ইংরেজিকে সরকারি ভাষা চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় 50% হিন্দিভাষী। ভারতের বহু রাজ্যেই ইংরেজি বা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়। আবার ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষারই চলন দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা সাধারণ ভাষার প্রচলন করা সম্ভব হয়নি। ভাষার ঐক্যের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি সম্ভব।

7. অযোগ্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব: অতীতের রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদী নেতা যেমন গান্ধিজি, সুভাষচন্দ্র, নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ প্রমুখের ন্যায় আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক বর্তমানে আর দেখা যায় না। অতীতের চিরবরেণ্য নেতাগণ শক্ত হাতে, দৃঢ় মতাদর্শকে সামনে রেখে সমগ্র সমাজকে মহামিলনের একটি সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান নেতারা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে এমন অনেক কার্যকলাপ করছে যার অনেকটাই সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এরা কেউই মানবিকতার খাতিরে সমগ্র সমাজকে মেলাতে চায় না।

8. ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অভাব: শিক্ষা শৈশবকাল থেকেই শিশুর ব্যবহার এবং আচরণের মান নির্ধারণ করে। শিশুকে যে-কোনো একটি সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে যে-কোনো জিজ্ঞাসাকে বোঝাতে শেখায়। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে সার্বিকভাবে কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তুর শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ বা সংস্কৃতি নিরপেক্ষ না হওয়ায় নানা সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

9. বহুদলীয় ব্যবস্থা: ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বৈষম্য বা আঞ্চলিক চাহিদা যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল বহুদলীয় ব্যবস্থা। অনেক সময় আঞ্চলিক চাহিদাগত পার্থক্যের কারণে আবার কোনো কোনো সময় কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরে কোনো রাজ্য এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না দেখাতে পারায় মিলিজুলি সরকার তৈরি হয়েছে। ফলে এই ধরনের স্থিতিহীন সরকার কোনো জাতীয় নীতিগুলির দিকে নজর না দিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে—যা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে।

10. সরকারি চাকুরিতে নিয়োগে অসদুপায় অবলম্বন: বর্তমানকালে সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণ এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়া জাতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি অন্যতম সমস্যার আকার ধারণ করেছে। এটি যুব সম্প্রদায়ের মনে এক তরফে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার ঘটাচ্ছে। ঠিক আবার তেমনি মহিলাদের জন্য চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণও নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে মোটেই অভিপ্রেত নয়।

11. জাতিভেদ প্রথা: ভারতীয় সমাজের একটি অন্যতম সমস্যা হল জাতিভেদ প্রথা। জাতিভেদকে যদি সাধারণ বংশানুক্রমিক বিভাজন হিসাবে ধরা হয় তবে তা কখনও সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যদি একে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয় তবে অবশ্যই তা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি গোষ্ঠীর নেতা নিজস্ব গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করতে গেলে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে জাতিদাঙ্গা সৃষ্টি হতে পারে।

12. সাম্প্রদায়িকতা: ভারতের ধর্মনিরপেক্ষক তার সবথেকে বড়ো শত্রু হল সাম্প্রদায়িকতা। সাধারণত এটি হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠের লড়াই। এর দ্বারাও ভারতের সংহতি বহুলাংশে বিপন্ন হচ্ছে।

জাতীয় সংহতিকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা
(Role of Education to Ensure National Integration)

ভারতকে যদি আমরা শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ দেশ রূপে গড়ে তুলতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষাই নাগরিকদের চরিত্র গঠন করতে পারে এবং তার আচরণকেও যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারে। একটি শিশু তার জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই সামাজিক আচার ও বিধিগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। ভারতে বহু জাতির লোক বসবাস করে, তাই প্রতিটি জাতি কেবল তাদের ভূখণ্ডগত ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে এমন কথা সঠিক নয়। তাই সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষাকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

1. বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত সমস্ত বিষয়গুলির পাঠ্যপুস্তককে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। আলোচ্য সমস্ত কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে এবং কোনো সংস্কৃতির আলোচনাকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে তুলতে হবে যে, সমস্ত নাগরিকদের নিয়েই ভারত রাষ্ট্র গঠিত, কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতিকে নিয়ে নয়। পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে পাঠ্যবইতে যে সমস্ত জাতীয়তাবিরোধী বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়গুলি বর্জন করতে হবে।

2. জাতীয় উৎসবগুলিতে যাতে সকলে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। এই উৎসবগুলি অবশ্যই সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজন করতে হবে। বিভিন্ন সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানগুলি স্মরণ রাখার জন্য তাঁদের নিয়ে অনুষ্ঠান, জন্মতিথি পালন ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি সংগঠিত করতে হবে।
3. বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতির ব্যাপারে এবং সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের নীতি জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করতে পারে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং জনগণ যাতে এটা মনে করে, যে-কোনো সময় রাষ্ট্র তাদের পাশে আছে এবং নিরাপত্তা প্রদান করছে সেইভাবে বিষয়টিকে পরিচালনা করতে হবে।
4. ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনায় ঐতিহাসিক শাসকদের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। কোনো বিশেষ জাতির প্রতিনিধিরূপে নয়।
5. সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে, তা সরকারি হোক অথবা বেসরকারি হোক, সবক্ষেত্রেই ত্রিভাষা নীতি অনুসরণ করে হিন্দি জাতীয় ভাষা, ইংরেজি সরকারি ভাষা এবং একটি আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।
6. শিক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব কোনো ব্যক্তির উপর অর্পণের পূর্বে জাতীয়তার সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করতে হবে।
7. বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আগত ছাত্রছাত্রী যাতে বিদ্যালয়ে একে অপরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে তার অবাধ সুযোগ থাকতে হবে।
8. প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার বিষয়সমূহ যাতে জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায়ক হয় সেইভাবে তার বিষয়বস্তুগুলিকে পরিচালিত করতে হবে। সাক্ষরতা, জনসচেতনতা প্রভৃতি বিষয়বস্তুগুলিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সেগুলি জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে পরিপূরক হয়।
9. সারাদেশে ভারতীয় সমাজের জাতীয় চরিত্রকে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন নাটক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আলোচনা সভা, বিতর্ক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে তাতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।
10. গণমাধ্যমগুলি শিক্ষামূলক নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করে জাতীয় সংহতি অটুট রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী যাঁরা এই গণমাধ্যমগুলিতে কাজ করেন তাঁরাও এই চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তবে বলা যায়, এই সংস্থাগুলির কর্ণধারও যেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হন। কারণ তিনি যদি সংকীর্ণমনা হন তাহলে সেটি তাঁর চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হবে। যা তাঁর সংস্থার পক্ষে বিপজ্জনক।

11. শিক্ষকরাই শিশুদের প্রশিক্ষণ দান করবেন, সেই কারণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ যাতে যথাযথ হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা যাতে পক্ষপাতিত্বহীনভাবে নিজস্ব কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারেন সেটাও দেখতে হবে।

এই বিষয়গুলি কোঠারি কমিশনের একটি বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়—"Educational system must make its contribution to the development of habits, attitudes and qualities of character which will enable its citizens to bear and to counter act all those fissiparous tendencies which hinder the emergence of a broad national and secular outlook."

জাতীয় সংহতি কমিটি (National Integration Committee)

1967 খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির চেয়ারম্যানশিপে জাতীয় সংহতি কমিটি নির্মিত হয়। এর প্রথম অধিবেশন হয় শ্রীনগরে 1968 খ্রিস্টাব্দে। এই প্রথম অধিবেশনে জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার কী ভূমিকা হতে পারে তা আলোচনা করা হয়। তার সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্ন যে জড়িত সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় সংহতি সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আরও তিনটি উপকমিটি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা, আঞ্চলিকতাবাদ প্রতিরোধ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য সংগঠিত করার কথা বলা। এই বিষয়গুলির উপর সহযোগী কমিটিগুলি তাদের আলাপ-আলোচনায় উদ্ভূত বক্তব্য পেশ করেছে এবং জাতীয় সংহতি কমিটি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেছে। তবে এই বৃহৎ কার্যভার যে কেবল সরকার দ্বারা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় সে বিষয়েও সকলে একমত। এখানে সম্মিলিত জনতা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এই সংস্থা যেসব মতামত দিয়েছে সেগুলি হল—

1. শিশুদের মধ্যে দেশের প্রতি আত্মত্যাগের চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে।
2. জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সার্বিক দিক সম্পর্কে শিশুরা অবগত থাকবে।
3. শিশুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে।
4. স্বাধীনতা সংগ্রাম, সংগঠিত বিভিন্ন বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে হবে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলি পালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে হবে।

সর্বোপরি শিক্ষার এই ভূমিকাগুলি ছাড়াও আরও যে বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হবে, সেগুলি হল—দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন। নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র, মানসিক একতা ইত্যাদি যাতে সুদৃঢ় হয় তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সকল নাগরিকদের প্রতি সৎ ও পক্ষপাতিত্বহীন মনোভাব বজায় রাখা ইত্যাদি অটুট রাখতে হবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ (Universalisation)

বর্তমান যুগকে বলা হয় পারমাণবিক শক্তির যুগ। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাও ভীষণ আকার ধারণ করেছে। যা হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধারণার ফল। নিজের জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং অন্যান্য জাতিকে হীন নজরে দেখার এক ঘৃণ্য মানসিকতা। নিজের রাষ্ট্রের প্রতি ভালোবাসা একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, কিন্তু অন্য রাষ্ট্রকে ঘৃণা করাও একটি জঘন্যতম বিশ্বজনীন অপরাধ। তাই ***Bertrand Russel*** বলেছেন, "Patriotism in its common form is the worst vice from which the modern world suffers"। সেই কারণেই এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ উচ্চ পর্যায়ের মানবিক সম্পর্ক, পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগী মনোভাব ইত্যাদির পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, ভয়াবহতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

দেশে দেশে সংকীর্ণতার ঘৃণ্য অনুভূতি দমনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোনো দেশই অন্য দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। একটি দেশ অন্য প্রতিটি দেশকেই সহমর্মিতার চোখে দেখবে। UNESCO-র প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর ***Dr. Walter H C Lewis*** 1956 খ্রিস্টাব্দে **American Association of Teacher Education**-এ মন্তব্য রেখেছেন, "International understanding is the ability to observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere to teach each other irrespective of nationality or culture to which they may belong. To do this one must be able to detach oneself from one's own particular cultural and national prejudices—and to observe men of all nationalities cultures and races on equally important varieties of human beings inhabiting this earth."

আবার অনেকেই আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের উদ্ভূত অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এবং সমস্যাগুলিকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা। সমাজবিজ্ঞানীরা একেই সহমর্মিতা বলে থাকেন। তাঁদের মতে, প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই হওয়া প্রয়োজন যেখানে একটি শিশু বিশ্বনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে ***Dr. Radhakrishnan*** বলেছেন, "If human race is to survive, we have to subordinate national pride to international feeling." সেই কারণে প্রত্যেকটি মানুষকেই মানবিকতায় বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে 'Live and Let Live' এই মূলনীতিটি অনুসরণ করতে হবে। কোনো দেশই নিজেকে অন্য দেশের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা দেশের ক্ষেত্রে বিভেদ রচনা করা যাবে না। অন্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যেককে সঠিক এবং স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে, শ্রদ্ধাপূর্ণ মানসিকতা পোষণ করতে হবে।

UNESCO আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যটির বিস্তার ঘটানোর জন্য নিম্নলিখিত কার্যাবলি অনুসরণের কথা বলেছেন—

1. এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিস্তার ঘটানো হবে।
2. এই সংস্থাটি বিভিন্ন চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, শিল্পী প্রমুখ মানুষের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান ঘটাতে সাহায্য করবে এবং নিজস্ব সৃজনাত্মক নব নব পরিকল্পনার দ্বারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচার বজায় রাখতে সহায়তা করবে।
3. বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ভীতি, যুদ্ধের আশঙ্কা, দুর্বল মনোভাব প্রভৃতি হ্রাস করতে হবে।
4. পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল দেশগুলিকে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে।
5. বিভিন্ন দেশে শিক্ষার জন্য বিষয়বস্তুর সংস্কার করবে এবং আন্তর্জাতিক মানের পুস্তক রচনার উপর গুরুত্ব দেবে। কিন্তু কীভাবে দরিদ্র দেশগুলিতে সাহায্যের মাধ্যমে নিরক্ষরতার অপসারণ ঘটাবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
6. আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য UNESCO অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে যাতে বিভিন্ন শিক্ষকদের মধ্যে তাঁদের চিন্তাধারা ও মতামত তাঁরা আদানপ্রদান করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা
(Need for International Understanding)

বর্তমানকালে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষে মানুষে মনের সংযোগ গাঢ়তর হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের যাবতীয় ঘটনা আজ সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয়। সেই কারণেই মানুষের জীবনকে আরও সহজ, আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন, আর তার জন্যই প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া।

বর্তমানে আমাদের জীবনধারণের প্রকৃতি অনেকটাই বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে যেখানে বিশ্বজোড়া গ্রামের কথা বলা হচ্ছে সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে যেখানে খুশি সহাবস্থান করবে এবং বিশ্বের প্রতিটি সম্পদে তারও অধিকার আছে—এই নিশ্চিত চিন্তাধারা রেখে স্বচ্ছন্দে সে জীবনধারণ করতে পারবে এবং যাবতীয় সুযোগ ভোগ করতে পারবে। এর জন্যও দরকার আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া।

এক জাতি এক রাষ্ট্রের ধারণা বর্তমানে বিশ্বজনীন ধারণায় পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ বর্তমানে সকলের মধ্যে সমতার ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সকলের যে সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সমাজে সুযোগসুবিধার প্রয়োজন আছে, সেখানে এই সত্য

সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই প্রতিটি দেশের মধ্যে সহাবস্থান ও বোঝাপড়া প্রয়োজন।

শোনা যায়, বৈদিক যুগের ভারতবর্ষে প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করত। সেই সময় আন্তর্জাতিক সহাবস্থান যেভাবে বজায় ছিল তা অনুসরণ করে বর্তমানের বিষয়টিকে নতুনভাবে ভাবা যায় এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ভিতটিকে আরও মজবুত করা যায়।

বর্তমানের যে ভয়াবহ পারমাণবিক যুগে মানুষ বসবাস করছে তাতে মানুষের মানবিক দিকটির প্রতি বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা চলছে তা বন্ধ করার জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ
(Obstructions in the Way of International Understanding)

ভৌগোলিক দূরত্ব: পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে। ফলে মানসিকতার মধ্যে ব্যবধান ঘটানো সহজ হচ্ছে না।

রাজনৈতিক দূরত্ব: সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বোঝাপড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

অর্থনৈতিক বাধাসমূহ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন রকমের নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিক অর্থ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

ধর্মীয় বাধাসমূহ: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী মানুষের বসবাস। আর বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের মধ্যে আবার পৃথক পৃথক ধর্মীয় আচার-আচরণ বর্তমান।

ভাষাগত বাধা: অসংখ্য ভাষাভাষী মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে। ভাষা পার্থক্য ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়।

মনোবৈজ্ঞানিক বাধাসমূহ: বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক বৈপরীত্যের মধ্যে শিশু বড়ো হলে তার মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষোভ, হতাশা, হিংসা, বিদ্বেষ এসবের মধ্যে শিশু বড়ো হলে তাদের মনে বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা, আগ্রাসন ও যুদ্ধবাজ মনোভাব জেগে ওঠে।

শিক্ষাগত বাধাসমূহ: কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেকসময় বিভিন্ন রকম সামাজিক বিজ্ঞানগুলি এমনভাবে পড়ানো হয় যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাত্যভিমান, জাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি জাগ্রত হয়।

1994 খ্রিস্টাব্দে জেনিভাতে শিক্ষার 44 তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য শিক্ষার বিভিন্ন দিক। বিভিন্ন রকম সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কীভাবে

শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে সফল করে তোলা যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য যে সমস্যাসমূহ বর্তমান সেগুলিকেও দূর করা প্রয়োজন। শান্তির প্রবক্তাগণ সকলেই একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য পাঠক্রম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সগুলিতেও বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। UNESCO আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছে। তা ছাড়া 1948 খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব প্রদান করে।

শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education)

আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসারের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে এবং সেগুলি হবে নিম্নরূপ—

(a) শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education): আন্তর্জাতিক অনুভূতি বিকাশের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(i) ***স্বাধীনভাবে চিন্তার বিকাশ***—প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার স্বাধীন বুদ্ধি, চেতনাবোধ, যুক্তিশক্তি ও বাস্তবিকতার দ্বারা সমস্ত বিষয় বিচার করতে হবে। নিজের দেশ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব তার থাকবে না।

(ii) ***বিশ্ব নাগরিকতা মনোভাবের বিকাশ***—শিক্ষা শিশুর মধ্যে এই ধারণাই গড়ে তুলবে যে, সে হল বিশ্বরাষ্ট্রের এক সুযোগ্য নাগরিক।

(iii) ***স্বজাতি এবং অন্য জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন***—নিজের জাতি বা রাষ্ট্র সম্পর্কে জাত্যভিমান এবং অন্য জাতির প্রতি হীনম্মন্যতা বোধ নির্মূল করাই হল শিক্ষার অন্যতম কর্তব্য। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধার্থে সমস্ত দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আধুনিক এই প্রগতির যুগে কোনো দেশের পক্ষেই এককভাবে এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক বজায় না রেখে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। সেই কারণেই বর্তমানে মানসিকভাবে এবং প্রাক্ষোভিক দিক থেকে সমগ্র বিশ্বসমাজের নাগরিকদের প্রস্তুত করাতে হবে এবং তাদের মধ্যে অপরিমিত দায়বদ্ধতার সুদৃঢ় মানসিকতা তৈরি করতে হবে, যার অন্যতম মাধ্যম হবে শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্যও প্রস্তুত হবে সেই দিশা অনুসারে।

(iv) ***পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ***—মানুষ এখন পারমাণবিক যুগে বাস করছে। সেই কারণে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগরণের প্রয়োজন। পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধে এই সচেতনতার বিকাশ ঘটাবে শিক্ষার লক্ষ্যের উপযুক্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে। তা ছাড়া, শিক্ষার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গেও মানুষ সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে।

(v) ***মানবিক বিকাশ***—এর সঙ্গে প্রয়োজন হল মানবিকতার জাগরণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করতেন। মানবিকতার ধর্মই তাঁর নিকট মহান ধর্ম—যা দেশ, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে।

সকল মহৎ ধর্মই মানবসমাজের সাম্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। মানবজীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং এই বিষয়টিকে সঠিকভাবে বোঝার মধ্যে দিয়েই মানবিকতার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করা যায়।

(b) পাঠক্রমের সংস্করণ (Revision of Curriculum): আন্তর্জাতিক চেতনার সম্প্রসারণের জন্য পাঠক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন।

(i) বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কলার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটাতে হবে।

(ii) বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মানবিকতার নিরিখে যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সাধিত হয় সেগুলি সম্পর্কে শিশুদের অবহিত করতে হবে।

(iii) বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে অন্ধবিশ্বাসগুলি বিনষ্ট করতে হবে।

(iv) বিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়টি নিয়ে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শিশুর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সম্পর্কে নিবিড় আত্মীয়তামূলক ধারণা গড়ে ওঠে।

(v) যাঁরা বিশ্বের ইতিহাসে সামাজিক অবদান রেখেছেন ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান যথাযথ তুলে ধরতে হবে।

(vi) পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবল নাগরিকতাবোধের বিকাশ না ঘটিয়ে তারা যে একটি সমগ্র বিশ্বসমাজের সভ্য এবং এই বিশ্বসমাজের প্রতি তাদের একটি মহান কর্তব্য আছে সেটিও তুলে ধরতে হবে।

(vii) কেবল পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষণের উপর জোর না দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপরও জোর দিতে হবে।

(viii) বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পত্রমিতালি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

(c) শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন (Change in Teaching Method): আন্তর্জাতিক সচেতনতা বোধ জাগরণের জন্য পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। এগুলি হল—

(i) শিক্ষণ পদ্ধতি চলাকালীন সময়ে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকতা বোধের বিকাশ ঘটে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(ii) বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে তা প্রশমিত করার জন্য ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলি পাঠদানকালে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যাতে অন্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি এবং জাতীয়তার প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ তৈরি হয় তার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

ebook.dascoaching.in

(iii) যে শিক্ষক শিক্ষণ দান করবেন তিনি তাঁর নিজস্ব আদর্শ, চিন্তাভাবনা ও যুক্তিশক্তির ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান করবেন।

এই বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন যেসব আনুষ্ঠানিক কোর্স খুলে করেছে সেইগুলির মাধ্যমেও যাতে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটানো যায় সেদিকে লক্ষ দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের সমস্ত দিকগুলিকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য পেশার ব্যক্তিদের প্রয়োজনে অন্যান্য দেশে পাঠাতে হবে অর্থাৎ মানবসম্পদ বিনিময় করতে হবে। আর সেই কারণেই জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তার মধ্যে দিয়ে সহজেই আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ সম্ভবপর হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

(d) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (Co-curriculur Activities): পাঠক্রমিক কার্যাবলি ছাড়াও শিশুদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যেমন—

- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দিবস, শিশু দিবস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দিবসগুলি পালন করা।
- খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পাঠ করা।
- বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে পত্রমিতালি স্থাপন করার জন্য শিশুদের উৎসাহ দেওয়া।
- শিশুদের টিভি ও রেডিয়োর বিভিন্ন খবরাখবর শুনতে উৎসাহ দান করা।
- সমস্ত ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং যৌক্তিক বাধা এড়িয়ে সারা পৃথিবীর মহান মানুষদের জন্মোৎসব পালন করা।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যামূলক বিষয় আছে সেগুলি নিয়ে বিতর্ক সভা আয়োজন করা।
- বিভিন্ন দেশের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারণের উপর প্রদর্শনী আয়োজন করা।
- আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- বিদেশ থেকে ঘুরে আসা মানুষদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা।

(e) শিক্ষকদের ভূমিকা (Role of Teachers): আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন—

- একজন ভাষাশিক্ষক কেবল ভাষা শিক্ষাদানের মধ্যেই নিজের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় ভাষাগুলির মাধুর্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি যথাযথ শিক্ষা দেবেন। তিনি ভাষার বহুমাত্রিকতাকেও গুরুত্ব দেবেন।

- শিক্ষক যখন ইতিহাস শিক্ষা দান করবেন তখন বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষরা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেসব অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যথাযথ ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ইতিহাসের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের সময় শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নাগরিকদের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার চেতনাও জাগিয়ে তুলবেন। আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা দেবেন।
- ভূগোল শিক্ষা দানের সময় দেশের বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে। আবার ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যবাহী একক অস্তিত্ব সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে।

এ ছাড়াও **শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেবেন।** যেমন—

- আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ এবং মতাদর্শ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটানো।
- আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশের প্রতি সহায়ক মনোভাবের প্রসার ঘটানো।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে সংকীর্ণ মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে মুক্ত চেতনার বিকাশ ঘটানো।
- বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা।
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যাতে যুক্তিশক্তির প্রয়োগ করতে পারে এবং তারা যাতে সঠিকভাবে সেই সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে পারে অথবা সেগুলি সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে পারে তার জন্যও তাকে উদ্বুদ্ধ করা।

নিরক্ষরতা (Illiteracy)

প্রথমেই জানা প্রয়োজন নিরক্ষরতা কাকে বলে, সাক্ষরতা প্রসঙ্গে UNESCO-র সংজ্ঞা হল—সাক্ষর হল সেই ব্যক্তি যিনি পড়তে ও লিখতে পারেন, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছোটো বক্তব্য বোধগম্যতার সঙ্গে পড়তে ও লিখতে পারেন। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে 1991-এর সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে সাক্ষর হল সেই ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষের যে-কোনো ভাষায় বোধগম্যতার সঙ্গে পড়তে ও লিখতে পারেন, আর যিনি এগুলি পারেন না তিনি নিরক্ষর।

নিরক্ষরতা ভারতবর্ষের এক চরম অভিশাপ। ভারতবর্ষের সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতির 45 নং ধারা অনুযায়ী 1960 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হলেও বিগত 63 বছরেও এর পূর্ণ বাস্তবীকরণ সম্ভব হয়নি।

যদিও বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। 1951 খ্রিস্টাব্দে (16.67 থেকে 2001 খ্রিস্টাব্দে 65.38) বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। UNESCO-র মতে অনুযায়ী নিকট ভবিষ্যতে বিশ্বের তাবৎ নিরক্ষরদের মধ্যে শতকরা 50 জনই ভারতবাসী হবে। এ ছাড়াও নিরক্ষরদের সংখ্যা জাতপাত, অঞ্চলগত, লিঙ্গাগত এবং শহরবাসী, গ্রামবাসী বিভেদ অনুসারে পার্থক্য দেখা যায়। যুক্তিসিদ্ধভাবেই বলার যথেষ্ট কারণ আছে যে 2030 খ্রিস্টাব্দেও সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অর্থাৎ সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই যদি কার্যকরী কোনো বিকল্প পথ গ্রহণ না করা হয়। নিরক্ষরতা জাতীয় জীবনে এক অভিশাপ। কোনো জাতি সমৃদ্ধ হতে পারে না যদি তাদের একটা বড়ো অংশ নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকে। নিরক্ষরতা মানুষকে সংকীর্ণ করে তোলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় না, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে না, হীনম্মন্যতা দেখা দেয়, নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় না। এককথায় বলা যায় নিরক্ষরতা ব্যক্তিজীবনকে, সমাজজীবনকে এবং জাতীয় জীবনকে এক অসহায়তার দিকে ঠেলে দেয়। তাই নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিষতুল্য সমস্যা। তাই জাতীয় জীবনের প্রগতিতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রূপ দিতে সর্বজনীন জোটকে অর্থবহ করে তুলতে নিরক্ষরতা দূরীকরণকে সর্বাধিকার দিতে হবে। এই সর্বাধিকারের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল আমাদের দেশে নিরক্ষরতার কারণ অনুসন্ধান করা।

নিরক্ষরতার কারণ (Causes of Illiteracy)

নিরক্ষরতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল—

1. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষ হল বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিতীয় দেশ যেখানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 16% বাস করে। আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রতিবছর 18 মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা (প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূত উভয়ব্যবস্থা) জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রাখতে সক্ষম হচ্ছে না যার ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও মোট নিরক্ষর জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

2. জাতির দুর্বল অংশের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভরতি না হওয়া: যদিও বালিকা এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি শিশুদের গত 50 বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভরতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে তবু এখনও শতকরা 43.2% এবং 39% বালিকারা যথাক্রমে প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভরতি হচ্ছে। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে National Sample Survey (42 তম) বলেছে এর কারণগুলি হল গৃহে এবং অর্থনৈতিক কারণে কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহের অভাব, অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণ, বিদ্যালয় না থাকা এবং অন্যান্য আর্থসামাজিক কারণ যা বালিকাদের বিদ্যালয়ে ভরতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

3. পাঠত্যাগ ও অনুন্নয়ন: দেখা গেছে প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার গুণগতমান থেকে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রথম শ্রেণিতে যারা ভরতি হয়েছে তাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে। এদেরকে drop out বলে। এ ছাড়া অনেকেই উঁচু শ্রেণিতে Promotion পায় না। এই দুই ধরনের শিশুরাই শিক্ষার অপচয়ের কারণ। 1999-2000 খ্রিস্টাব্দে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত drop out-এর সংখ্যা 40.20% এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই সংখ্যা 54.50%। সমীক্ষায় এও বলা হয়েছে যে SC, ST-দের ক্ষেত্রে drop out-এর সংখ্যা বেশি। এই drop out-এর কারণ হল কাছাকাছি বিদ্যালয় না থাকা, দীর্ঘ অনুপস্থিতি, গ্রামে মহিলা শিক্ষিকার অভাব ইত্যাদি। এ ছাড়াও আর্থসামাজিক কারণ এবং বিদ্যালয়ের একঘেয়েমি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক পীড়নও দায়ী। সম্প্রতি সর্বজনীন শিক্ষা অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে drop out-এর সংখ্যা হ্রাস পেলেও নিরক্ষরতার সমস্যা এখনও তীব্র।

4. বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয়ের অভাব: ষষ্ঠ সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় (1998) বলা হয়েছে গ্রামে 93.76% মানুষের 1 কিলোমিটারের মধ্যে Primary School আছে এবং শতকরা 85 জনের ক্ষেত্রে 3 কিলোমিটারের মধ্যে উচ্চপ্রাথমিক স্কুল আছে। অর্থাৎ শতকরা প্রায় 6 জন গ্রামবাসীদের 1 কি.মি. মধ্যে প্রাথমিক স্কুল নেই। এই অবস্থা শিশুদের বিশেষ করে বালিকাদের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

5. বিদ্যালয়ে ন্যূনতম সুযোগসুবিধার অভাব: বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সুযোগসুবিধা তেমন বৃদ্ধি হয়নি। ষষ্ঠ সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় বলা হয়েছে 1993 খ্রিস্টাব্দে শতকরা 8 ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি, কোনো শ্রেণিকক্ষ নেই এই রকম স্কুলের সংখ্যা 10.59%। শতকরা মাত্র 45 ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সুবিধা আছে। শতকরা 19 ভাগ বিদ্যালয়ে Urinal আছে। মেয়েদের জন্য পৃথক Urinal আছে মাত্র শতকরা 9 ভাগ। এই ধরনের পরিকাঠামোর অভাব বিদ্যালয়ে না যাওয়া বা drop out-এর অন্যতম কারণ। যার ফল হল নিরক্ষরতা। সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচিতে সমস্যার আংশিক সমাধান হলেও আশানুরূপ নয়।

6. অভিভাবকদের নিরক্ষরতা: অভিভাবকদের নিরক্ষরতা গ্রামীণ অঞ্চলে নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ। নিরক্ষর পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয় পাঠাতে উৎসাহিত হয় না। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পিতামাতার বিশেষ করে জননীর শিক্ষার সঙ্গে অন্যদের শিক্ষার একটা ধনাত্মক সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ শিক্ষিতা জননী তার পুত্র ও কন্যার শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

7. আর্থিক কারণ: চরম দারিদ্র্য বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ, দরিদ্র পরিবারে শিশুদের বিশেষ করে কন্যাদের সাংসারিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে হয়। এ ছাড়া অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন বাড়িতে বা মাঠেঘাটে কাজ করতে হয়। তা

ছাড়া জননীরা যখন সংসারে অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে তখন কন্যারাই তার ছোটো ভাইবোনদের দেখে। এইভাবে বিদ্যালয়ে তাদের নাম থাকলেও অনুপস্থিত থাকে এবং নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

৪. অন্যান্য কারণ: উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও অন্যান্য কিছু আর্থসামাজিক কারণের ফলেও সর্বজনীন শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ নিরক্ষরতার কারণ হয়ে ওঠে। বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যতার কারণে বিদ্যালয়গামী বয়সি শিশুদের উপার্জন করতে হচ্ছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভারতবর্ষে প্রায় 50 মিলিয়ন বিদ্যালয়গামী শিশু বিভিন্ন কলকারখানা, খনি, গৃহনির্মাণ কাজ, কৃষিকাজ ও অন্যান্য ছোটোখাটো কাজে নিযুক্ত। সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের কারণেও নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ—Tribal আদিবাসী শিশুদের তাদের ভাষার উপর কোনো পুস্তক বা শিক্ষা উপকরণ না থাকার ফলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না। তাদের সাংস্কৃতিক ও পরিবেশ অনুযায়ী পাঠক্রমের কোনো ব্যবস্থা নেই। উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষকও তাদের থেকে নিযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। যার কারণে এই শ্রেণির শিশুরা শিক্ষায় এগিয়ে আসছে না।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায় (Remedies) ebook.dscoaching.in

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় 2001 খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী এখনও ভারতবর্ষে নিরক্ষরদের সংখ্যা শতকরা প্রায় 35 ভাগ। মোট জনসংখ্যার নিরিখে নিরক্ষরদের মোট সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। এই ব্যবস্থা থেকেই যা শিক্ষা পাওয়া যায় তা হল গতানুগতিক নিরক্ষরতা দূরীকরণে কর্মসূচির পরিবর্তে ব্যাপকভাবে জাতীয় স্তরে আধুনিক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য নিরক্ষরতার ফলে কী ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ জনগণ তা বুঝতে পারেন না। সেইজন্য জনগণকে বোঝাতে হবে নিরক্ষরতার ফলে জাতীয় জীবনের যে প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে তার কথা এবং এই ক্ষতির থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ব্যক্তি ও জাতিকে উচ্চমূল্য দিতে হবে।

2000 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক আন্তর্জাতিক প্রস্তাব অনুযায়ী এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য Court দ্বারা নির্দেশিত হয়েই সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারত সরকার সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই সর্বশিক্ষা অভিযান নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে (2010) সমস্ত শিশুদের 8 বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষার (6 থেকে 10 বছর) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই সর্বশিক্ষা অভিযানে প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) 2003 খ্রিস্টাব্দের ভেতরেই প্রত্যেককেই Education Gurantee Centre বিকল্প বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হবে।

(খ) 2007 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমস্ত শিশুকে 5 বছরের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে।

(গ) 2010 খ্রিস্টাব্দের ভেতর সমস্ত শিশুকেই 8 বছরের শিক্ষা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার 2010 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে শিক্ষার অধিকার আইন (RTE) চালু করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কীভাবে এই আইন বাস্তবায়িত হবে তা নির্দিষ্ট করা হলেও বাস্তবে রূপ পায়নি। সব লিখিত আকারে থেকে গেছে। সর্বজনীন সাক্ষরতা এখনও দূর অস্ত।

দারিদ্র্য (Poverty)

দারিদ্র্যের ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্য হল একটি অবস্থা যা ব্যক্তির মধ্যে আছে এবং থাকা উচিত এই দু-য়ের মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে। যেহেতু ব্যক্তির মধ্যে যা থাকা উচিত তা একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সেজন্য দারিদ্র্য সম্পর্কে ব্যক্তির অনুভূতিও ব্যক্তিভিত্তিক এবং অনন্য। কিন্তু ক্ষমতার অভাব ও সম্পদের অভাবের অনুভূতি সব দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান। তাই দারিদ্র্য বিষয়টি ব্যক্তিভিত্তিক হলেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common Characteristic) দেখা যায়। ***Berstein Henry*** (1990) দারিদ্র্যের নিম্নোক্ত মাত্রাগুলির উল্লেখ করেছেন—

1. জীবনযাত্রার কৌশলের অভাব।
2. সম্পদ আহরণে অসমর্থ (অর্থ, জমি, ঋণ)।
3. নিরাপত্তার অভাববোধ এবং হতাশা।
4. সম্পদের অভাবজনিত কারণে অন্যদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখার অক্ষমতা।

দারিদ্র্যের ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্য তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যায়—

(ক) জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন।

(খ) নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির ন্যূনতম জীবনধারণের এবং জীবনের মানে নিম্নে ব্যক্তির অবস্থান।

(গ) সমাজের অল্প সংখ্যক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা এবং অধিকাংশ ব্যক্তির বঞ্চনা এবং হতাশার মধ্যে তুলনামূলক অবস্থা।

প্রথম দুটি দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক দিকটি ব্যাখ্যা করে, তৃতীয়টি দারিদ্র্যের সামাজিক ধারণা (অর্থাৎ জাতীয় আয়ের তুলনায় সমাজের নিম্নে অবস্থানকারীদের অবস্থা) ব্যাখ্যা করে।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে দারিদ্র্যকে ব্যাখ্যা করা হয় 'দারিদ্র্যরেখার' ভিত্তিতে। দারিদ্র্যরেখা হল বর্তমান মান অনুযায়ী স্বাস্থ্য, উৎকর্ষতা, শিশু পরিচর্যা, সামাজিক অংশগ্রহণ আর আত্মমর্যাদা রক্ষা (***Beeker***, 1966)।

ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যরেখা নির্দিষ্ট হয় ন্যূনতম পুষ্টির প্রেক্ষিতে যা 'Calorie Value'-র দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন একজন গ্রামবাসীর প্রতি দিনে 2,400 Calorie প্রয়োজন হয় এবং শহরবাসীর প্রয়োজন হয় 2,100 Calorie, 1993-94 খ্রিস্টাব্দের মূল্যসূচি অনুযায়ী এই পরিমাণ ক্যালোরির জন্য গ্রামবাসীকে মাসে 229 টাকা এবং শহরবাসীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাসে 264 টাকা।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দারিদ্র্যের ব্যাখ্যা হল বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম উপকরণ সংগ্রহ। এর মধ্যে আছে খাদ্য, আশ্রয়, পরিধেয়, শিক্ষা এবং শারীরিক যত্ন। 1993 খ্রিস্টাব্দের মূল্যসূচি অনুযায়ী এর জন্য প্রয়োজন হয় গ্রামবাসীর ক্ষেত্রে মাসে 259 টাকা এবং শহরবাসীর জন্য 294 টাকা।

দারিদ্র্যের ব্যাপকতা (Extencity of Poverty)

ভারতবর্ষের জনগণের একটা বড়ো অংশ অত্যন্ত গরিব। Life expectancy (বেঁচে থাকার বয়স), শিক্ষার অগ্রগতি এবং ক্রয় ক্ষমতার প্রেক্ষিতে প্রকৃত GNP—এই তিনটি মাত্রার ভিত্তিতে 29/8/06 তারিখে TOI (Times of India) প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গরিব দেশ। ভারতবর্ষের 42% জনগণ এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে। সম্প্রতিকালে কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও ভারতবর্ষ বিশ্বের গরির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

United National Human Development (UNHD) যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে ক্রয় ক্ষমতার প্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান ছিল 174টি দেশের মধ্যে 134তম। প্রকৃত GDP এর প্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান ছিল 141তম যেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল 123তম (Outlook, 14/9/1996)। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারী রাজ্যগুলির তালিকায় সর্বোচ্চ সংখ্যায় জনগণ আছে, ওড়িশায় (44.7%), সর্বনিম্নে আছে পাঞ্জাবে (7.27%), পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম (29.6%)—1995 খ্রিস্টাব্দের চিত্র।

দারিদ্র্যের কারণ (Causes of Poverty)

দারিদ্র্যের কারণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) প্রাচীন মতবাদ, (খ) আধুনিক মতবাদ।

(ক) প্রাচীন মতবাদ: প্রাচীন মতবাদে বলা হয় মানুষের অতীতের কর্মফলই দারিদ্র্যের কারণ। বর্তমানে এই মতবাদটির সমর্থনে কোনো তথ্য না থাকায় এটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

(খ) আধুনিক মতবাদ: এই মতবাদে বলা হয় দারিদ্র্যের কারণ হল ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ব্যবহার না হওয়া অথবা প্রেষণার অভাব। ***David Slesh*** (1993) দারিদ্র্যের তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন—ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individual Based), সাংস্কৃতিক (Cultural or Sub-cultural) এবং সামাজিক কাঠামো (Social Structure)।

(i) **ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individual Based):** দারিদ্র্যের কারণগুলি যখন ব্যক্তির মধ্যে নিহিত সেইগুলিই হল দারিদ্র্যের ব্যক্তিগত কারণ। যেমন—ব্যক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতা, ব্যক্তির ত্রুটি, অক্ষমতা, বুদ্ধিহীনতা, অদক্ষতা, উদ্যোগহীনতা ইত্যাদি। ***Max Weber*** তাঁর 'Protestant Ethics'-এ এই কথাগুলি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ব্যক্তির সফলতার জন্য দায়ী তার কঠোর পরিশ্রম, গুণাবলি

এবং সততা। *স্পেনসার* (Spencer), *কার্নেগী* (Carnegie) প্রমুখ বুদ্ধিজীবী এই কথাই বলেছেন।

(ii) **সংস্কৃতি বা উপ-সাংস্কৃতিক (Cultural or Sub-cultural):** দারিদ্র্যের দ্বিতীয় কারণ হল দারিদ্র্যতার সংস্কৃতি বা গরিবদের জীবনদর্শন। এই ধরনের সংস্কৃতিতে দারিদ্র্যের মূল্যবোধ, মানসিকতা, বিশ্বাস এবং জীবনদর্শন পরিবর্তনের সব রকমের প্রচেষ্টার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দারিদ্র্যের এই কারণটিতে মনে করা হয় যে, ইতিবাচক পার্থিব পরিবর্তন সত্ত্বেও দরিদ্রগণ দারিদ্র্যের সংস্কৃতিই পছন্দ করেন। ***Scar Lewis*** (1950), এই কারণটি সমর্থন করেন। তিনি বলেন বংশ পরম্পরায় এই দারিদ্র্য-সংস্কৃতি চলতে থাকে। তিনি আরও বলেন দরিদ্র জীবনদর্শনই দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে।

(iii) **সামাজিক কাঠামো (Social Structure):** সংরক্ষণবাদীগণ যখন দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক কারণের কথা বলেন, সেখানে লিবারেল, র‍্যাডিকাল এবং অন্য সমাজতত্ত্ববিদগণ মনে করেন দারিদ্র্যের কারণ নিহিত আছে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, অর্থনীতি, শিক্ষার অভাব, চাকরি করার যোগ্যতার অভাব, দীর্ঘ সময়ের জন্য রেকারত্ব বা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি না পাওয়া ইত্যাদি—এই কারণগুলিকেই সামাজিক কাঠামোগত কারণ বলে। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই কিছু ব্যক্তি সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তন চায় না। সমাজতত্ত্ববিদ **হার্বার্ট জেমস** (***Herbert Gemes***), এই রকমের তিনটি কারণ উল্লেখ করে বলেন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জনসংখ্যা—এই তিনটি উপাদানের ভিত্তিতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে।

সমাজের নোংরা কাজগুলি করানোর জন্যই দরিদ্র শ্রেণি তৈরি করা হয়েছে। দরিদ্র শ্রেণির সৃষ্টি করার জন্যই সমাজের এক অংশ সামাজিক কাঠামো এবং আদর্শের পরিবর্তন চায় না।

দারিদ্র্যের কারণগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—আর্থিক, জনসংখ্যা এবং সামাজিক যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

❶ **আর্থিক কারণ (Financial Causes):** অর্থনৈতিক কারণগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়—(ক) উন্নয়নে ঘাটতি, (খ) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, (গ) মূলধনের অভাব, (ঘ) কর্মচারীদের দক্ষতার অভাব এবং (ঙ) বেকারত্ব।

(ক) উন্নয়নে ঘাটতি: 1951-2010 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা আশাস্বরূপ সফলতা অর্জন করেনি, মাত্র 4·5% যা যথেষ্ট কম। সরকার এবং আমলারা যতদিন না পর্যন্ত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের দিকটা যথেষ্ট গুরুত্বসহ বিবেচনা করবেন এবং ত্রুটিগুলি দূর করবেন ততদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যের সমস্যা থেকেই যাবে।

(খ) **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি:** মূল্যবৃদ্ধি দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। 1960-61 খ্রিস্টাব্দকে ভিত্তি করে পাইকারি মূল্যসূচক প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1991 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল 13.67% এবং 1997 খ্রিস্টাব্দ থেকে সামান্য হলেও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। 2008 খ্রিস্টাব্দ থেকে 2010 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ে, এই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে টাকার মূল্য হ্রাস পায়।

1982 খ্রিস্টাব্দের ভিত্তিতে 1 টাকার মূল্য 1997 খ্রিস্টাব্দে 28.5 পয়সা হয়। যা বর্তমানে আরও অনেক কম। এর কারণে এক সময় যারা দরিদ্র বলে গণ্য হত না তারা আজ দারিদ্র্যসীমায় এসে পড়েছে।

(গ) **মূলধনের অভাব:** আর্থিক মূলধনের অভাব দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। মূলধনের অভাবের কারণে শিল্পের বিকাশ হয় না, রপ্তানি থেকে আমদানি অধিক হয়। যার ফলে আর্থিক ঘাটতি দেখা দেয়।

(ঘ) **কর্মচারীদের দক্ষতার অভাব:** মানব মূলধনের অভাবে অর্থাৎ ক্ষমতা এবং দক্ষতার অভাবে ব্যক্তি উচ্চ বেতনের কাজ পায় না ফলে উপার্জনও বৃদ্ধি পায় না। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহজাত প্রবণতার থেকে সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা অধিক প্রয়োজন । গরিব দেশের সমাজ সেইসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয় না। ফলে শ্রমিকরা যেমন অদক্ষ থেকে যায় তেমনি শিল্পের বিকাশ শ্লথ হয়ে পড়ে যার কারণে সমাজের আর্থিক বিকাশ হয় না। শ্রমিকরাও দক্ষতার অভাবে উচ্চবেতনের চাকরি পায় না, যার ফলে দারিদ্র্য থেকেই যায়।

(ঙ) **বেকারত্বের উচ্চহার:** দেশে শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে আর্থিক উপার্জন হ্রাস পেয়েছে। এর প্রভাবে দারিদ্র্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

❷ **জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth):** দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সমীক্ষায় দেখা গেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে জনপ্রতি আয়ের সঙ্গে জনপ্রতি ব্যয়ের সংগতি রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু এটা না হওয়ার কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

দারিদ্র্যের সঙ্গে জনগণের বয়সের একটা সম্পর্ক আছে। অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃদ্ধদের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৃত্যুর হার 1941 খ্রিস্টাব্দে যেখানে ছিল 32·45 বছর এবং 1981 খ্রিস্টাব্দে তা হয়েছে 54 বছর এবং 1996 খ্রিস্টাব্দে হয়েছে 63 বছর। অর্থাৎ বর্তমানে বৃদ্ধদের সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত আমাদের দেশে অবসরের বয়স হল 60 বছর এবং অবসরের পরে আমাদের দেশে পুনরায় চাকরি পাওয়া কঠিন অর্থাৎ পেনশন না পেলে পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়। এইভাবে বৃদ্ধদের দারিদ্র্যকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। দারিদ্র্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের একটি সম্পর্ক আছে। স্বাস্থ্য খারাপ হলে একদিকে যেমন ব্যক্তি উপার্জন করতে সক্ষম হয় না তেমনি চিকিৎসার

জন্য সে কম ব্যয় করে। এইভাবে জনগণের একটা বড়ো অংশ যদি স্থায়ী অসুস্থতায় আক্রান্ত হয় তাহলে তাদের পক্ষে উপার্জন করা সম্ভব হয় না এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সবশেষে শিক্ষার মানের সঙ্গে দারিদ্র্যের একটা সম্পর্ক দেখা যায়। 1973 খ্রিস্টাব্দে USAতে দেখা গেছে যে VIII Standard পর্যন্ত যারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের বাৎসরিক আয় 6975 ডলার, দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে 11,218 ডলার এবং গ্র্যাজুয়েটদের ক্ষেত্রে তা হল 15,785 ডলার। আমাদের দেশেও প্রায় একই তথ্য পাওয়া গেছে।

❸ **সামাজিক কারণ (Social Causes):** সামাজিক কারণসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বিভেদ, কুসংস্কার, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি। বৃত্তির সুযোগের ক্ষেত্রে এইগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য ব্যাহত হয়।

ভারতবর্ষে রাজ্যভিত্তিক আয়ের পার্থক্য আছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী। অপর দিকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান ইত্যাদি আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। সেই কারণেই রাজ্যভিত্তিক দরিদ্রদের সমস্যার মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা মাঝামাঝি।

ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের কারণগুলির উপর ***B N Ganguli***-র বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে দারিদ্র্যের কারণগুলি হল—

(ক) বিদেশি শাসন এবং সমাজের একটি অংশকে শোষণ করা।
(খ) জন বিস্ফোরণ,
(গ) মূলধনের অভাব,
(ঘ) নিরক্ষরতার উচ্চহার,
(ঙ) উচ্চকাঙ্ক্ষার অভাব এবং আর্থিক উন্নয়নের প্রতি প্রেষণার অভাব, ভগ্নস্বাস্থ্য, উষ্ণ আবহাওয়া সহ্য করতে না পারা,
(চ) প্রশাসনে সততা এবং দায়বদ্ধতার অভাব,
(ছ) মান্ধাতার আমলের শিক্ষাব্যবস্থা, আর্থিক এবং সামাজিক গতিশীলতার অভাব এবং
(জ) শোষণভিত্তিক জোতদারি কৃষি ব্যবস্থা, যার ফলে প্রান্তিক চাষিরা দরিদ্রই রয়ে গেছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় (To Remove Poverty)

ভারতবর্ষে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তিনটি উপায় উল্লেখ করা যায় (***Tripati, Rao,*** 1990)।

1. প্রথমদিকে 1950 খ্রিস্টাব্দে নীতি প্রণয়নকারীরা মনে করেছিলেন যে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে আর্থিক বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চমাত্রায় নিয়ে গেলে সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু 1970 খ্রিস্টাব্দে বোঝা গেল যে, কৃষির বৃদ্ধি গ্রামের গরিবদের কোনো উপকারেই আসেনি।
2. এর ফলে দ্বিতীয় এক কৌশলের কথা চিন্তা করা হয়, যেমন—জমি সংস্কার, কমিউনিটি উন্নয়ন, যৌথচাষ, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদকে সকলের মধ্যে বণ্টন করার চেষ্টা, কিন্তু এই প্রচেষ্টাও সফল হয়নি।

3. অতঃপর 1980 খ্রিস্টাব্দে দারিদ্র্য মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিকাশমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেমন—IRDP, TRYSEM, NREP এবং RLGEP যেগুলি পরে বৃহৎ যোজনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল—

(i) NREP (Nation Rural Employment Programme): গ্রামের উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্যের সাহায্যে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। প্রথম দিকে এই কর্মসূচির নাম ছিল কাজের ফলে খাদ্য কর্মসূচি। 1976-77 খ্রিস্টাব্দে এটি পরিকল্পিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় 1977 খ্রিস্টাব্দের 1 এপ্রিল থেকে। এই কর্মসূচিতে লক্ষ লক্ষ টন উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য ব্যবহার করে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কাজের দিন সৃষ্টি করা হয়। কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বন্যা প্রতিরোধ, রাস্তা নির্মাণ এবং সারাই, জলসেচ, পঞ্চায়েত ঘর তৈরি, স্কুল বিল্ডিং, মেডিকেল এবং হেলথ্ সেন্টার ইত্যাদি। এই কর্মসূচি অর্থাৎ কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচির কিছু ত্রুটি লক্ষ করে 1980 খ্রিস্টাব্দে এর পুনর্গঠন করা হয়। NREP-এর এই কর্মসূচি বর্তমানে JRY (জওহর রোজগার যোজনা)-র সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

(ii) RLEGP (Rural Landless Employment Gurantee Programme): এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল জনগণের মধ্যে কাজের মাধ্যমে গ্রামের নারীদের অতিরিক্ত কিছু অর্থ পাইয়ে দেওয়া, যদিও এর পরিমাণ ছিল খুবই অল্প, দৈনিক 9 টাকা মাত্র।

(iii) JRY (Jawahar Rozgar Yojna): 1989 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই কর্মসূচি ঘোষিত হয়, প্রতিটি গরিব পরিবারের অন্তত একজন করে বছরে যাতে তার বাড়ির নিকটে 50 থেকে 100 দিন কাজ পায় তা নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। 30% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়, পরে REP এবং RLEGP-র সঙ্গে এই কর্মসূচিকে যুক্ত করা হয়। এর জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত যথাক্রমে 80% এবং 20% ব্যয় বহন করে। উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি ছাড়াও সম্প্রতি আরও দুটি কর্মসূচি যোগ করা হয়েছে। এগুলি হল—

(ক) যেসব পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে (Below Poverty Line বা BPL) তাদের জন্য পরিবার পিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে বিন্যামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা, বাসস্থান নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া ইত্যাদি।

(খ) গরিবদের বার্ধক্য ভাতা এবং বিধবা ভাতার ব্যবস্থা করা।

পরিশেষে বলা যায় দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চালু করা হলেও দরিদ্র জনগণের সংখ্যা প্রত্যাশা অনুযায়ী হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। এর প্রধান কারণ হল দারিদ্র্যের ব্যাপকতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার অভাব। এই সমস্যাসমাধানের জন্য প্রয়োজন হল নতুন চিন্তা-ভাবনার।

সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় (Socially Backward Groups)

পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা (Definition of Backward Communities) ভারতবর্ষের যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘ সময়ব্যাপী অত্যাচার, অবিচার ও উৎপীড়নের শিকার হয়েছে এবং সবরকমের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেই সব হতভাগ্য মানুষের সমষ্টিকেই পশ্চাদপদ সম্প্রদায় বলে।

সংবিধানে দুর্বল শ্রেণি (Weaker section) এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণি (Backward Class) বলতে তাদেরকেই বুঝিয়েছে যারা সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে আছে, বিশেষ করে তপশিলি জাতি (SC) এবং তপশিলি উপজাতি (ST) কিন্তু পশ্চাৎপদ (Backward) বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সংবিধানে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। 1953 খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি 340 নং ধারায় পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের উপর (Backward Class Commission) একটি কমিশন গঠন করেন। ওই কমিশনের উপর পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার ভার ন্যস্ত করা হয়। এই কমিশনও পশ্চাৎপদ শ্রেণির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি তবে এর কতকগুলি মাত্রার কথা (Dimension) উল্লেখ করা হয়। এই মাত্রাগুলি হল—

1. হিন্দু সমাজে গতানুগতিক জাতিভেদ প্রথায় যারা সামাজিক দিক থেকে নিম্নে অবস্থান করছে।
2. কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ পায় না বা বঞ্চিত হয়।
3. সরকারি চাকরিতে যদি প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকে।
4. ব্যাবসাবাণিজ্য বা শিল্পক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের অভাব হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ শ্রেণি নির্ধারণে বিভিন্ন কমিটি অতিরিক্ত কিছু মাত্রা যুক্ত করেছে। যেমন—

(ক) যারা অচ্ছুৎ বা প্রায় অচ্ছুৎ বলে বিবেচিত হয় (যাদের তপশিলি জাতি বলে)।

(খ) যেসব উপজাতি (Tribal) সাধারণ সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলে না তাদের তপশিলি উপজাতি বলে।

(গ) দীর্ঘকালব্যাপী অবহেলার ফলে যারা সাধারণ সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে অপরাধী সম্প্রদায় বলে 1953 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিবেচিত হয়েছিল। বর্তমানে এদেরকে প্রাক্তন অপরাধী উপজাতি বা ডিনোটিফায়েড গ্রুপস বলে।

(ঘ) অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি (Other Backward Class or OBC): অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল।

(i) যেসব যাযাবর জাতি কোনো সামাজিক মর্যাদা পায় না এবং যাদের নির্দিষ্ট কোনো আবাসন নেই।

(ii) যেসব সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত বা ভূমিহীন চাষি।

(iii) যেসব সম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই থাকার কোনো জায়গা নেই, অন্যের দেওয়া আশ্রয়ের উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকে।

(iv) যাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বল্প জমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

(v) যেসব সম্প্রদায় সামাজিকভাবে জেলে, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা বলে চিহ্নিত হয়।

(vi) যেসব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই এবং যাদের গতানুগতিক বৃত্তি বর্তমানে অর্থ উপার্জনকারী নয়।

(vii) যেসব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং যার ফলে সরকারি চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্বও কম।

(viii) মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ ইত্যাদি সংখ্যালঘুদের মধ্যে যেসব গোষ্ঠী এখনও সামাজিক এবং শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে।

(ix) যেসব সম্প্রদায় সামাজিক ক্রমপর্যায়ে নিম্ন স্থানে অবস্থান করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় নির্দিষ্টকরণে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, প্রতিটি রাজ্য তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন্ কোন্ সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হবে তার তালিকা নির্ধারণ করে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে যে মাত্রা বা রূপরেখা উল্লেখ করেছে তার ভিত্তিতেই পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের তালিকা স্থির করতে হবে। গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় নির্দিষ্টকরণের যে যে মাত্রাগুলি বিচার করা হয়, তা হল— (i) দারিদ্র্যের মাত্রা, (ii) শিক্ষার সুযোগ এবং সাক্ষরতার হার, (iii) পুষ্টি, (iv) জীবনযাপনের মান, স্ত্রী শিক্ষা এবং তাদের অধিকার ইত্যাদি।

তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribes)

ভারতের সংবিধানে 342 নং ধারায় তপশিলি উপজাতিদের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, সব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী যেমন—

(i) আদিবাসী (Primitives traits)

(ii) নিজস্ব সংস্কৃতি আছে।

(iii) ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন।

SC, ST এবং OBC-দের জনসংখ্যা

সমাজ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করা হল—

ভারতবর্ষের SC, ST এবং OBC-দের বণ্টন—

শ্রেণি বা জাতি মিলিয়ন হিসেবে	ব্যক্তি সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যা	শতকরা	উৎস
ST	67·76	8·08	1991 জনগণনা
SC	179·7	17·5	2001 Projected
OBC সংখ্যালঘু সহ	188·9	18·4	2001 Projected

উপরোক্ত বণ্টন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে একইভাবে বিস্তৃত নয়। যেমন তপশিলি জাতিদের মধ্যে 81% গ্রামে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জনগণের মধ্যে SC-দের সংখ্যা প্রায় 23.6%। 1993 জনগণনা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে মিজোরাম (94.8%), নাগাল্যান্ড (87.6%) এবং মেঘালয় (85.8%)।

SC, ST এবং OBC-দের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

(Constitutional Safeguard of SC, ST & OBC)

আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের এই দুর্বল অংশের জন্য সাংবিধানিক কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

1. সংবিধানের Article 14 (14 নং ধারা)-তে আইনের চোখে সকলকেই সমভাবে দেখা এবং সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে।
2. সংবিধানের 15 (4) নং ধারায় সমস্ত রাজ্যকেই অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী SC, ST, এবং OBC যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা।
3. সংবিধানের 16 (4) এর ধারায় রাজ্যকে বৃত্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া আছে। বর্তমানে এই সংরক্ষণের উচ্চ শিক্ষায় ভরতির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ছাড়া সংবিধানের বিভিন্ন ধারা যেমন—17, 46, 275(1), 330, 340, 341, 342, 244(1) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে SC, ST এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (OBC) জনগণের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে।

ebook.dascoaching.in

পশ্চাৎপদতার কারণ এবং এর প্রতিকার

(Causes of Backwardness and Remedies)

পশ্চাৎপদতার কারণ অনুসন্ধানে আমাদের দেশে একাধিক সমীক্ষা হয়েছে। সেই সমীক্ষাগুলিতে যেসব কারণের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(i) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ (Person Centre Forces)

(ii) কমিউনিটি কেন্দ্রিক কারণ (Community Centre Forces)

(i) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ (Personal Centre Forces)

প্রথমত, দীর্ঘকালীন ব্যাপী সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিদের দ্বারা SC, ST এবং পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিগণ অত্যাচারিত এবং অবহেলার শিকার হয়। যার ফলে এই সব হতভাগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা দিয়েছে। শিশু বয়স থেকেই তারা দেখে আসছে এ ক্ষমতার অধিকারী এক শ্রেণির ব্যক্তি তাদের অচ্ছুৎ করে রেখেছে। ক্রমশ এই অভিজ্ঞতা শুধু এক জীবনেই নয় পুরুষ পরম্পরায় হয়ে আসছে। এইভাবে তাদের মধ্যে এক বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, নিম্নশ্রেণিভুক্ত তাই এটাই তাদের প্রাপ্য। তবে বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এদের অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের মানসিকতার কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণির অধিকাংশ ব্যক্তিগণের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতার অভাব দেখা যায়। যেহেতু এদের মধ্যে একটা বড়ো অংশের পিতা-মাতা নিরক্ষর, তাই শিক্ষা কী, কোথায় শিক্ষার্জন করা যায়, এর উপকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পৌঁছোয় না। ফলে এদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয়ত, এই শ্রেণির জনগণের মধ্যে যারা প্রথম জন্মের শিক্ষার্থী হয়ে (First generation learner) শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে, তারা বিভিন্ন কারণে যেমন উৎসাহের অভাব, সুযোগসুবিধার অভাব, পাঠাভ্যাসের ঘাটতি, কঠিন পরিশ্রম, গৃহের কাজে এবং কৃষিকাজে সময় দেওয়ার জন্য পরীক্ষায় ন্যূনতম সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয় না। ফলে হতাশা ও শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পাঠত্যাগ করে। তবে প্রথম জন্মের শিক্ষার্থীদের যদি বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত এবং সুযোগসুবিধা দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে রেখে দেওয়া যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় জন্মের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(ii) কমিউনিটি কেন্দ্রিক কারণ (Community Centre Forces)

পশ্চাৎপদতার কারণগুলির মধ্যে অধিকাংশই হল সামাজিক বা কমিউনিটি কেন্দ্রিক। যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) পারিবারিক কারণ

(i) দারিদ্র্য: পশ্চাৎপদ জনগণের একটা বড়ো অংশ অত্যন্ত দরিদ্র। সাধারণ জীবনধারণের জন্য পরিবারের সকলকেই কোনো না কোনো উপায়ে উপার্জন ভিত্তিক কাজ করতে হয়। ফলে পরিবারে পিতা-মাতাকে সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে হলে উপার্জন থেকে বঞ্চিত হতে হয়। দারিদ্র্য আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা বেতনহীন হলেও শিক্ষোপকরণ ক্রয় করতে হয় যা দরিদ্র পিতা-মাতার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকার বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করে কিন্তু সেই বিতরণ এত বিলম্বে ঘটে যা প্রতিটি

শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছোতে পৌঁছোতে কোর্স শেষ হয়ে যায়। এই সব কারণে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

(ii) শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব: প্রকৃতপক্ষে SC, ST এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির পরিবারের অধিকাংশেরই শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব দেখা যায়। কারণ পরিবারের কর্তা বা পিতা-মাতাগণ বেশিরভাগই হয় নিরক্ষর না হয় খুবই নিম্নস্তরের শিক্ষার্জন করেছে। এই পিতা-মাতাগণ খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদের সন্তানদেরও শিক্ষার প্রতি উৎসাহ সঞ্চারে কোনো প্রয়োজনবোধ করেন না।

(iii) শিক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা: উচ্চ ও মধ্যশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষাসম্পর্কে যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, নিম্নশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তা দেখা যায় না। কারণ এই শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতার প্রচণ্ড অভাব লক্ষ করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে যে আত্মপ্রকাশ, আত্মোপলব্ধি বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে সে সম্পর্কে নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণের কোনো ধারণাই নেই। এই ধরনের অনভিজ্ঞতার দরুন শিক্ষা সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না। সন্তানদের বড়ো করে তোলার পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অর্থ উপার্জন। এর জন্যই নিম্নশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির সন্তানগণ অল্পবয়সে পাঠত্যাগ করে কোনো কাজে নিযুক্ত হয় বা কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য করা হয়।

(iv) সমবায়মূলক ভূমিকা পালনে অক্ষমতা: শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং প্রকৃত ছাত্রের ভূমিকা পালন করা অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন হল পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের পরামর্শ এবং উৎসাহ দান। যা নিম্নশ্রেণিভুক্ত পরিবারের পিতা-মাতা সঠিকভাবে পালন করতে অক্ষম।

এখানে উল্লেখ করা যায় প্রথম জন্মের শিক্ষার্থীদের নিকট একটা বড়ো সমস্যা হলেও দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের এই সমস্যাটি আর থাকবে না। এই ধরনের অক্ষমতাকে তারা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

(খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামাজিক পরিবেশ: নিম্নশ্রেণিভুক্ত বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তির সন্তানদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা, শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন, পাঠক্রমিক এবং সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ—ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলি এবং তাদের প্রভাব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(i) ***পার্থক্যকরণঃ*** তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ ব্যক্তি অধ্যুষিত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের প্রচণ্ড অভাব দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যেসব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নশ্রেণিভুক্ত

সেই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ যোগদান করতে চান না বা যোগদানে বাধ্য হলেও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শিক্ষাদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

(ii) শিক্ষকগণের একটা বড়ো অংশ পশ্চাৎপদ শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনাকে হেয় চোখে দেখে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা বিচার না করেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণে তাদের উৎসাহিত না করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরেই কোনো বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেয়। তাঁরা অর্থাৎ শিক্ষকগণ তপশিলি উপজাতিদের সংস্কৃতিকে নিম্ন চোখে দেখে এবং মনে করে যে, পশ্চাৎপদ শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের বুদ্ধ্যঙ্ক কম। শিক্ষক এবং প্রশাসকগণের এই ধরনের মনোভাব ক্রমশ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের এমনকি তাদের সহপাঠীগণের মধ্যেও সঞ্চালিত হয়।

SC, ST এবং OBC ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের (নিম্নশ্রেণিভুক্ত ছাত্র) আত্মবিশ্বাসের উপরে আঘাত হানে। যার ফলে এই শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি সামাজিক সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার অন্তরায় হয়।

(গ) SC, ST এবং OBC-দের প্রতি উচ্চশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি: উচ্চশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিগণ সর্বদাই SC, ST এবং OBC-দের নিম্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে। তারা মনে করে নিম্নশ্রেণিভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে কৌতূহল, ধারণা গঠনের ক্ষমতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা ইত্যাদি কম। অধিকাংশ শিক্ষকগণ মনে করেন যে, সাধারণ শ্রেণিভুক্ত ছাত্রদের সঙ্গে এরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সর্বদাই পিছিয়ে থাকে। কারণ বর্তমান পাঠক্রম উচ্চ ও মধ্যশ্রেণিভুক্ত ছাত্রদের প্রেক্ষিতেই রচিত হয়। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের মতো নিম্নশ্রেণিভুক্ত ছাত্রদের জন্যই শিক্ষার মান নিম্নাভিমুখী।

(ঘ) সামাজিক অসমতা: প্রকৃত ঘটনা হল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে অসমতা দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হল সামাজিক অসমতা। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগণ উচ্চ ও মধ্য শ্রেণিভুক্ত জনগণের অবস্থান থেকে অনেক নীচে অবস্থান করে। এই অবস্থানের তারতম্য শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সামাজিক অসমতার কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণ পিছিয়ে আছে।

(ঙ) বর্তমান বিদ্যালয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা: শুধুমাত্র প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নয়, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থাও উচ্চ ও মধ্য শ্রেণিভুক্ত জনগণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। বর্তমানে নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণের একটা বড়ো অংশ শিক্ষার স্তরে প্রবেশ করতে এগিয়ে আসছে। তাই সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা একই সব শ্রেণিভুক্ত জনগণের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সচেষ্ট হতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থাপকগণ এখনও পর্যন্ত মধ্যশ্রেণিভুক্ত জনগণের চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণের চাহিদা ও তাদের মেধা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী (বিশেষ করে উপজাতি শিশুদের ক্ষেত্রে) শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় না। পাঠক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি এবং শিক্ষার সাধারণ পরিবেশ নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণের শিক্ষা ও বৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী রূপ পায় না। যার ফলে এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রেষণা এবং দায়বদ্ধতার অভাব দেখা যায়।

প্রতিকার (Remedies): নিম্নশ্রেণিভুক্ত এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণিভুক্ত জনগণের এই অবস্থার প্রতিকারের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানা রকমের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব ব্যক্তিদের আর্থিক এবং শিক্ষাগত বিকাশ, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সুবিধা, আইনগত সাহায্য এবং স্বেচ্ছাসেবী এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু হয়েছে। ভারত সরকারের শ্রম ও বৃত্তিমন্ত্রক (Labour and Employment Ministry) SC, ST এবং OBC গণ বিভিন্ন সুযোগসুবিধামূলক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন—

(i) ***SC এবং ST-দের বিশেষ কোচিং কাম পরামর্শদান কেন্দ্র স্থাপন:*** 1969-70 খ্রিস্টাব্দে চারটি এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে 18টি রাজ্যে এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে বাইশটি রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিতে এই কর্মসূচি চালু আছে। এই কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন রকমের তথ্য পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থীদের নিকট বিস্তার করে। যেমন, কীভাবে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করা যায়, বিভিন্ন বৃত্তিতে সংরক্ষণের সুযোগ আছে কিনা, সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করতে হলে কী করতে হয় ইত্যাদি। এ ছাড়া এই ধরনের তেরোটি কেন্দ্রে শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং শেখানোর ব্যবস্থা আছে। জানুয়ারি 2004 থেকে সেপ্টেম্বর 2004 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলির সফলতা নিম্নতালিকায় উল্লেখ করা হল—

কর্মসূচি	কত সংখ্যক শিক্ষার্থী এর আওতায় এসেছে
নথিভুক্তকরণ	15921
জমা দেওয়ার পূর্বে পরামর্শ	1113
শর্ট-হ্যান্ড এবং টাইপিং-এর প্রশিক্ষণ	8688
প্রাক্‌বৃত্তি প্রশিক্ষণ	2182
আত্মবিশ্বাস গঠনের কর্মসূচি	12272

(ii) ***বিশেষ কোচিং-এর কর্মসূচি:*** কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকে পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় তার জন্য ডাইরেক্টর জেনারেল অফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং বিশেষ কোচিং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(iii) *তথ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন কর্মসূচি:* 2004 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 6 মাসের জন্য APTECH LTD কোম্পানির সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজ্য, যেমন—বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, দিল্লি, গৌহাটি, হিসার, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা ইত্যাদি শহরে চাকরিপ্রার্থী পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের কম্পিউটার ট্রেনিং-এর সুযোগ দেওয়া হয় এবং বর্তমানে সুযোগ অন্যান্য রাজ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছে।

(iv) *শ্রমিক কল্যাণমূলককর্মসূচি:* বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত যেমন বিড়ি প্রস্তুত, কয়লা ছাড়া অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিযুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের (যাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ হল পশ্চাৎপদ ব্যক্তি) জন্য পাঁচটি শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি পার্লামেন্ট গৃহীত অ্যাক্ট অনুযায়ী চালু হয়েছে। এইগুলি হল—মাইকা মাইনস ওয়েলফেয়ার ফান্ড, লাইমস্টোন এবং ডলোমাইট মাইনস লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ডস, আকরিক লৌহ, আকরিক ম্যাঙ্গানিজ ও আকরিক ক্রোম শ্রমিক কল্যাণমূলক ফান্ড; বিড়ি শ্রমিক কল্যাণমূলক ফান্ড এবং মাইন শ্রমিক কল্যাণমূলক ফান্ড। স্বাস্থ্য, আবাসন, শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি কর্মসূচি এই ধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

(v) *বন্ডেড শ্রমিকদের মুক্তির জন্য বিশেষ সুবিধা:* ভারতবর্ষের এক দীর্ঘকালীন সমস্যা হল বন্ডেড লেবার। বন্ডেড শ্রমিক বলতে বোঝায় যারা বংশানুক্রমে একই মালিক বা ধনী ব্যক্তিদের জন্য কেবলমাত্র আহার ও বাসস্থানের জন্য কাজ করতে বাধ্য থাকে। এই সব বন্ডেড শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চাৎপদ। তাদের মুক্তির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এই ধরনের কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম সেবা রোজগার যোজনা (SJGSRY)।

পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের উন্নতির জন্য কিছু সুপারিশ

(Recommendations for Development of Backward People)

SC, ST এবং OBC অর্থাৎ পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য নিম্নে কিছু সুপারিশ উল্লিখিত হল—

(ক) *শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত*

(i) মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের বহুমুখীকরণ এবং অল্প সময়কালীন বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা।

(ii) কোর্স নির্বাচনে স্বাধীনতা দান।

(iii) গ্রামীণ এলাকায় বেশি করে পলিটেকনিক এবং বৃত্তিমুখী কলেজ খোলা।

(iv) সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থাকে আর নিশ্চিত করা।

(v) যে সমস্ত পশ্চাৎপদ ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যে বহু সুযোগসুবিধা পেয়ে শিক্ষা ও আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট স্বাবলম্বী এবং উন্নত হয়েছে তাদের সুযোগসুবিধা হ্রাস করে যে সমস্ত ব্যক্তি এখনও কোনো সুযোগসুবিধা পায়নি বা সুযোগসুবিধা সম্পর্কে অজ্ঞাত তাদের অনুসন্ধান করে সুযোগসুবিধা সম্পর্কে তাদের জ্ঞাত করা।

(vi) বয়স্ক শিক্ষা, প্রথা-বহির্ভূত এবং মুক্ত শিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করা। পাশাপাশি এর গুণগত মান উন্নত করা।

(খ) *পিতা-মাতা সংক্রান্ত*

(i) পিতামাতাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিশেষ সুযোগসুবিধা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা। প্রয়োজনবোধে তাদের বিশেষ পরামর্শ দিতে হবে।

(ii) পুত্র এবং কন্যারা যাতে ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে পিতা-মাতারা সচেষ্ট হবেন।

(iii) সম্প্রতি যে 'Right to Education Act' পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে পিতা-মাতাদের অবহিত করতে হবে।

(iv) গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পিতা-মাতাদের সচেতন করতে হবে।

(গ) *সরকার সংক্রান্ত*

(i) সরকারকে বৃত্তির টাকা এবং বৃত্তির সম্প্রসারণ করতে হবে। পাশাপাশি যারা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাদের বিভিন্নভাবে প্রেরণা দেওয়া প্রয়োজন।

(ii) নির্দিষ্ট সময়ে সকলকেই বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ করতে হবে।

(iii) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নতির প্রয়োজন।

(iv) উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(v) স্বল্প ব্যয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করা। হোস্টেলের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা এবং পুরো সময়ের হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করতে হবে।

(ঘ) *শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসংক্রান্ত*

(i) অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য ব্যক্তিগণ যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে SC, ST, OBC-দের সঙ্গে প্রয়োজনমতো এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।

(ii) পশ্চাৎবর্তী এবং পশ্চাৎবর্তী নয় উভয় দলের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করবেন।

(ঙ) *আমলাতান্ত্রিকতা*

(i) যে সমস্ত আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ পিছিয়ে পড়া জনগণের কল্যাণমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত আছেন, তারা মাঝেমাঝেই স্থানীয় ভাষায়

বিভিন্নভাবে উক্ত জনগণের জন্য সরকারি যে সুযোগসুবিধাগুলি আছে সে ব্যাপারে তাদের সচেতন করবেন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠনে সাহায্য করবেন এবং এদের সুযোগসুবিধাগুলি কী পরিমাণে কার্যকরী হয়েছে তার তদারকি করবেন। তারা সর্বদাই বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে, এইসব সুযোগসুবিধাগুলি তাদের প্রাপ্য। দয়া বা করুণা করা নয়।

(ii) সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য যে আবেদন করতে হয় সে আবেদন যেন সহজ ভাষায় এবং সহজভাবে পূরণ করা যায় সে দিকে লক্ষ রাখবেন এবং প্রয়োজনে আবেদনপত্র পূরণে সাহায্য করবেন।

সংখ্যালঘু ও সাচার কমিটির রিপোর্ট

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সম্বন্ধে সরকারি সুরও কিছুটা নরম হয়েছে। বস্তুত 'সংখ্যালঘু' এবং 'পশ্চাৎপদ' কথা দুটির নবমূল্যায়ন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার একটি বিপুল অংশই মুসলমান। 6টি জেলায় তাদের সংখ্যা অধিক। শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে মুসলিমপ্রধান জেলাগুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষিজীবী এবং শিল্পাঞ্চলে কোনো কোনো কেন্দ্রে শিল্প-শ্রমিক। মুসলিমরা শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই পিছিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিককালে সাচার কমিটির রিপোর্টে এই তথ্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সাচার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সারা দেশে মুসলিমরা চাকুরিজীবী মাত্র 4.6%।

সংখ্যালঘুদের স্বার্থে ব্যবস্থা (Provisions for Minorities)

তপশিলিভুক্ত জাতি, তপশিলিভুক্ত উপজাতি ছাড়াও ভারতে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। এই সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে গণতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্য সমান মর্যাদা ও সুযোগসুবিধা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য অপরিসীম।

1. ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমানাধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিশেষ বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সাম্যের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থানভেদে বা তাদের কোনো একটির ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না [15(1) নং ধারা]। তবে নারী, শিশু, সামাজিক ও শিক্ষাগত বিচারে অনুন্নত শ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
2. সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং অনুন্নত শ্রেণির জন্য সরকারি চাকরিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি চাকরি

বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। কোনো নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মূল বংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে-কোনো একটি কারণে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবে না [16(1)/(2) নং ধারা]। অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকের জন্য সরকারি চাকরিতে আসন সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছে।

3. ভাষাগত সংখ্যালঘু স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন [350(ক) নং ধারা]।
4. সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের 29-30 নং ধারায় সকল সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যাপারে মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।
5. তা ছাড়া সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্মগত বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি [30(1) নং ধারা]। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারি সাহায্যের ব্যাপারে ভাষাগত বা ধর্মগত কারণে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না [30(2) নং ধারা]।
6. সংবিধানে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারেও ব্যবস্থা আছে। বলা হয়েছে যে, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা বা এগুলির কোনো একটির জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারও প্রবেশাধিকার অস্বীকার করা যাবে না [29(2) নং ধারা]।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে উপরোক্ত ব্যবস্থাদি ছাড়াও তপশিলি উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভারতের সংবিধানে বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা ও নির্দেশ আছে।

ভারতীয় সংবিধানে সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণির রক্ষাকবচ (Protection for Minorities and Backward Classes in Indian Constitution)

ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রত্যাভূত: ভারতের যে-কোনো শ্রেণির নাগরিক, যাদের নিজস্ব একটা সুস্পষ্ট ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি আছে, তাদের তা সংরক্ষণ করার মৌলিক অধিকার সংবিধানে প্রত্যাভূত হয়েছে [অনুচ্ছেদ 29(1)]। তার মানে, যদি কোনো সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু শ্রেণি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তাহলে রাষ্ট্র-বিধি দ্বারা তাদের উপর সংখ্যাগুরুরা ওই অঞ্চলের উপর অন্য কোনো সংস্কৃতি চাপাতে পারবে না। এই ব্যবস্থায় কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরই নয়, ভাষাগত

সংখ্যালঘুদেরও রক্ষা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ 29-30-এ প্রত্যাভূত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষাগত রক্ষাকবচ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দির উন্নতি বা আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনকে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার মুসলমানদের তুষ্ট করার জন্য সরকারি খরচেই উর্দুর উন্নতির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুবিধা: সংবিধানের প্রত্যেক রাজ্যকে ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীসমূহের শিশুদের প্রাথমিক স্তরে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যে-কোনো রাজ্যকে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন (অনুচ্ছেদ 350ক)।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ আধিকারিক: সংবিধানে বলা হয়েছে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন বিশেষ আধিকারিক নিযুক্ত করবেন। সংবিধানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের যেসব রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে সেইসব রক্ষাকবচ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান করে সেই বিশেষ আধিকারিক রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন (অনুচ্ছেদ 350খ)।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বৈষম্য নয়: সংবিধানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা এর কোনো একটির ভিত্তিতে কোনো নাগরিককে ভরতি হতে দিতে অস্বীকার করা যাবে না [অনুচ্ছেদ 29(2)]। এর অর্থ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয় বা রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য পায় এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতির ব্যাপারে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না। এই ব্যবস্থা অতি ব্যাপক, এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরই নয়, স্থানীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদেরও স্বার্থরক্ষা করা এবং যে মুহূর্তে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা এর কোনো একটির ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে সেই মুহূর্তে সংবিধান লঙ্ঘন করা হবে।

বোম্বাই সরকার এই মর্মে এক আদেশ জারি করেছিল যে, শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি এমন কোনো সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া এমন কোনো ছাত্র ভরতি করা যাবে না যার ভাষা ইংরেজি নয়, অর্থাৎ যারা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও যারা এশীয় বংশোদ্ভূত নয় কেবল তাদেরই ভরতি করা যাবে।

পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার: ধর্মের ভিত্তিতেই হোক কী ভাষার ভিত্তিতে, সকল সংখ্যালঘুরই তাদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ও পরিচালনা করার মৌলিক অধিকার আছে [অনুচ্ছেদ 30(1)]। অনুচ্ছেদ 29(1)-এ যেমন সংখ্যালঘুদের তাদের ভাষা বা লিপি রক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে, অনুচ্ছেদ 30(1)-এ তেমনি তাদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে যাতে রাষ্ট্র তাদের এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে বাধ্য করতে না পারে যা তাদের পছন্দ নয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে রাষ্ট্রের সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্য নয়: অনুচ্ছেদ 30(2)-এ বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না যে, ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনো সংখ্যালঘু কর্তৃক পরিচালিত—তা সে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হোক কী ভাষাগত সংখ্যালঘু হোক।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাসংক্রান্ত রক্ষাকবচের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্টের প্রস্তাব

1. প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেবল তাদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকারই নয়, তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার অধিকারও আছে।
2. হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হলেও এবং অনুচ্ছেদ-351-এ রাষ্ট্রকে হিন্দির প্রসার ঘটাবার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিলেও কোনো উপায়েই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না, যদি সেই উপায় অনুচ্ছেদ 29 বা 30-এ প্রত্যাভূত অধিকার লঙ্ঘন করে।
3. প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে (ধারা 45) রাষ্ট্র জোর করতে পারে না যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিদ্যালয়-গুলিতেই কেবল সেই শিক্ষা দেওয়া হবে। তা যদি করে তাহলে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো মানুষের অন্য কোনো বিদ্যালয়ে না গিয়ে তার সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার অধিকার আছে বলে যে প্রত্যাভূতি দেওয়া হয়েছে তা লঙ্ঘন করা হবে।
4. অনুচ্ছেদ 30(1) অনুসারে সংরক্ষিত সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে কুশাসন বাসা না বাঁধে বা শিক্ষার উপযুক্ত মান সুনিশ্চিত হয় সেজন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ এতদূর যেতে পারে না যাতে অনুচ্ছেদ 30(1)-এ প্রত্যাভূত অধিকার কার্যত বিনষ্ট হয়।
5. **সরকারি চাকরিতে বৈষম্য নয়:** অনুচ্ছেদ 16(2)-এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।
6. **অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতির ব্যবস্থা:** সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেটা পূরণ করতে হবে। অনগ্রসর শ্রেণির তথা তপশিলি জাতি, উপজাতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

লিঙ্গ অসমতা (Gender Inequality)

লিঙ্গ অসমতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন লিঙ্গের অর্থ। আমাদের অধিকাংশই সেক্স (যৌনতা) এবং জেন্ডার (লিঙ্গ)-কে একই অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু ***Unger*** (1979), ***Unger*** and ***Crawford*** (1996) মন্তব্য করেন 'sex' এবং 'gender' শব্দ ব্যবহারে আমরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করি।

সেক্স (sex) বলতে বোঝায় জৈবিক পুরুষত্ব (Masculinity) বা নারীত্ব (Feminity) (যেমন—সেক্স ক্রোমোজোম) এবং জেন্ডার বা লিঙ্গ হল সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গত পুরুষত্ব এবং নারীত্ব (যেমন জেন্ডার বা লিঙ্গের ভূমিকা পরিবর্তন)।

বালকেরা বালক হিসাবে জন্মগ্রহণ করে এবং বালিকারা বালিকা হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। জন্মাবার সময় কেউ এ বিষয়ে তারা সচেতন থাকে না। শিশুরা 2-3 বছরের মধ্যে তাদের লিঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হয়, এবং এ বিষয়ে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কোন্ ধরনের আচরণ বালকের জন্য উপযুক্ত এবং কোন্ ধরনের আচরণ বালিকাদের জন্য উপযুক্ত। এর প্রধান কারণ হল শিশুর পরিবারের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফল। পিতা-মাতাই শিশুর লিঙ্গ অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খেলনা সরবরাহ করে, ক্রমশ শিশুরাও তাদের লিঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং আচরণ করে। পরিবার ছাড়াও সমবয়সিরা এবং মাধ্যমসমূহ লিঙ্গভিত্তিক আচার-আচরণে শিশুদের উৎসাহিত (Re-inforce) করে।

লিঙ্গ অসমতার কারণ (Causes of Gender Inequality)

লিঙ্গ অসমতার কারণগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল—পরিবার, সমবয়সিরা (Peers) এবং মাধ্যম (Media)।

পরিবার (Family): শৈশব অবস্থা থেকেই পিতা-মাতারা পুত্র ও কন্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বড়ো করে, বয়স্করা পুত্রদের শক্তির প্রয়োজন এমন ধরনের খেলার ব্যবস্থা করে (যেমন ট্রাক বা গাড়ি) এবং কন্যাদের পুতুল ইত্যাদি দিয়ে খেলার সুযোগ করে দেন। পিতা-মাতা যখন পুত্র বা কন্যার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তখনও অসমতা দেখা যায়। তিন বছর বয়স থেকেই পিতা-মাতারা তাদের সন্তান বা সন্তানদের সঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক আচরণ শুরু করে।

Fagot (1985) লক্ষ করেছেন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের লিঙ্গ অনুযায়ী আচরণগুলিকে শক্তিশালী করে যেমন পুত্র ব্লক (Block) দিয়ে খেলবে, সে দৌড়োবে এবং লাফাবে, কন্যারা বাড়ির মধ্যে পুতুল নিয়ে খেলবে, লিঙ্গ অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান এবং অন্যান্য আচরণগুলি শক্তিশালী করে যার ফলে পুত্র এবং কন্যারা তাদের লিঙ্গ অনুযায়ী কাজগুলি সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয় যা অসমতার কারণ হয়।

সমবয়সি (Peers): সমীক্ষায় দেখা গেছে 3 বছর বয়স থেকেই শিশুরা তাদের সম লিঙ্গ সম্পন্ন ও সমবয়সিদের সঙ্গে অধিক খেলাধুলা করে। খেলার 4 ভাগের মধ্যে তিনভাগ সমবয়সি এবং একই লিঙ্গসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে মেশে, মাত্র এক-চতুর্থাংশ অন্য বিপরীত লিঙ্গের শিশুদের সঙ্গে মেশে।

মাধ্যম (Media): জেন্ডার পার্থক্য বা অসমতার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মাধ্যম। মাধ্যমের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে বালক ও বালিকারা তাদের আচার-আচরণ, পছন্দ-অপছন্দ, কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সচেতন হয় (***Unger*** and ***Grawford***, 1990) শিশুদের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে দূরদর্শন প্রায় পিতা-মাতা এবং সমবয়সিদের ন্যায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ***Lips***-এর মতে (1993) দূরদর্শন লিঙ্গ অনুযায়ী আচরণকে উৎসাহিত করে, শিশু যত বেশি দূরদর্শনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তত বেশি লিঙ্গভিত্তিক আচরণ করে।

প্রসঙ্গত বলা যায় লিঙ্গগত পার্থক্য সম্পর্কে যত বেশি আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, পূর্বে যে পরিমাণ পার্থক্যের কথা বলা হত সেই পরিমাণ পার্থক্যের কথা এখন আর বলা হয় না।

Maccoby এবং ***Jackbin*** (1974)-এর মতে বালকেরা গাণিতিক এবং স্থানিক ক্ষমতার প্রেক্ষিতে বালিকাদের থেকে এগিয়ে থাকে এবং বালিকারা বাচনিক ক্ষমতায় বালকদের থেকে এগিয়ে থাকে। সম্প্রতি কালের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যেসব বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় তা যত না জৈবিক (Biological) তার থেকে অনেক বেশি মনো-সামাজিক (Psycho-social)।

শ্রেণিকক্ষে পারদর্শিতা এবং লিঙ্গ (Gender and Classroom Achievement)

শ্রেণিকক্ষ পারদর্শিতার সঙ্গে লিঙ্গের সম্পর্কের ব্যাপারে একাধিক সমীক্ষা হয়েছে এবং একটি বিশেষ দিকে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে। শিক্ষক-ছাত্র এবং ছাত্র-ছাত্র মিথস্ক্রিয়ার বিন্যাস, পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এবং পরীক্ষা ইত্যাদি সবগুলিই লিঙ্গের (জেন্ডার) ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার সমতা অর্জন করার জন্য বালক এবং বালিকা উভয়কেই সমভাবে দেখতে হবে এবং পারদর্শিতার জন্য উভয়কেই পুরস্কৃত করতে হবে।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে বালক ও বালিকাদের সঙ্গে পার্থক্য বা অসমতা নিম্নের তালিকায় উল্লেখ করা হল।

বৈশিষ্ট্য (Characteristic)	লিঙ্গাগত পার্থক্য বা অসমতা (Gender Difference or Inequality)
শারীরিক পার্থক্য (Physical Difference)	যদিও বালকদের অপেক্ষা বালিকাদের পরিণমন দ্রুত ঘটে কিন্তু বয়ঃসন্ধিক্ষণের পর বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা আকারে এবং শক্তিতে এগিয়ে থাকে।
বাচনিক ক্ষমতা (Verbal ability)	অল্প বয়স থেকেই বালিকারা বালকদের অপেক্ষা বাচনিক কার্যাবলিতে এগিয়ে থাকে। ভাষা সমস্যা বালিকাদের থেকে বালকদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।
স্থানিক ক্ষমতা (Spatial ability)	স্থানিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা এগিয়ে থাকে।
গাণিতিক ক্ষমতা (Mathematical ability)	অল্পবয়সে বালক ও বালিকাদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায় না তবে উচ্চবিদ্যালয় স্তরে বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা ভালো করে।
বিজ্ঞান বিষয়ক ক্ষমতা (Science ability)	বিজ্ঞান বিষয়ক ক্ষমতার ক্ষেত্রে বালকেরা বালিকাদের থেকে সবসময়েই ভালো করে।
পারদর্শিতার প্রেষণা (Achievemet Motivation)	এই ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি এবং পরিস্থিতির উপরে বালকেরা গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বালিকাদের অপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা প্রেষণাযুক্ত হয়। অন্যদিকে বালিকাদের পারদর্শিতার প্রেষণা অধিক দেখা যায় সংগীত, শিল্প এবং সাহিত্যের দিকে।
আক্রমণধর্মিতা (Aggressiveness)	সহজাতভাবেই বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা অধিক আক্রমণাত্মক হয়, অল্পবয়স থেকে আজীবন এটি দেখা যায়।

লিঙ্গ অসমতা এবং শিক্ষাগত তাৎপর্য
(Gender Inequality and Educational Significance)

1997 খ্রিস্টাব্দে UNESCO প্রস্তাব করে যে, শিক্ষার মতো পরিকল্পিত কর্মসূচিতে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তকরণের (Gender inclusion) উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। UNESCO আরও বলে শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করতে বোঝায় শিক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন পাঠক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া, সহপাঠীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়াকরণে মহিলা এবং পুরুষের সমগুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা। এ

ব্যাপারে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করা, পাঠ্যপুস্তক রচনায় ভারসাম্য বজায় রাখা এবং শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া সহপাঠীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় কীভাবে মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব সে সম্পর্কে UNESCO-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এসম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করা (Balance in School Curriculum)

এ ব্যাপারে UNESCO-র নির্দিষ্ট করণীয়গুলি উল্লেখ করা হল—

- পাঠক্রম রচনায় স্টিয়ারিং কমিটিতে লিঙ্গ সচেতন সমসংখ্যক পুরুষ ও মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- পাঠক্রম যাতে বালক ও বালিকাদের চাহিদাপূরণে সক্ষম হয় সেই বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।
- প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে লিঙ্গ সচেতনতা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হবে।
- পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠক্রমের রূপরেখা এবং শিক্ষার উপকরণ বালক ও বালিকাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।
- অধ্যায়গুলি এবং শিক্ষার উপকরণগুলি শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।
- ওয়ার্কশপের কর্মসূচিগুলি নির্দিষ্ট করতে লিঙ্গ ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয়ভাবে বিচার করা হবে।
- লেখক এবং শিল্পী লিঙ্গসচেতন হবে। লিঙ্গ ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লেখক ও শিল্পীদের নির্বাচন করা হবে।
- পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে প্রাথমিকভাবে যে পরীক্ষা করা হয় (Pilot testing) যেখানে সমসংখ্যক বালক এবং বালিকা থাকবে।
- নতুন পাঠক্রম চালুকরণে সব শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত হবে এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে 1961 খ্রিস্টাব্দে হংস মেহেতা কমিটি লিঙ্গ বৈষম্যের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কতকগুলি সুপারিশ করেন।

পাঠক্রম পৃথকীকরণ (Separate Curriculum)

এই প্রসঙ্গে কমিটি মন্তব্য করে যে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিগত ক্ষমতা, আগ্রহ ও মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এ ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্যের কোনো ভূমিকা থাকা উচিত নয়। আধুনিক সমাজে পাঠক্রমের পৃথকীকরণ কখনোই নারী-পুরুষের বিভেদের উপর ভিত্তি করে হতে পারে না। তবে এই নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ সময় লাগবে, তাই কিছু কিছু মনোবৈজ্ঞানিক প্রভেদ মেনে নিলেও সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে নারী-পুরুষের সমানাধিকার সংক্রান্ত মূল্যবোধ ও সঠিক মনোভবে যেন গঠিত হয়।

প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (Curriculum for Elementary Level)

এই স্তরে ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমে অবশ্যই কোনো প্রভেদ থাকবে না। ছেলেদের পড়ার বিষয় বা মেয়েদের পড়ার বিষয়—এই ধরনের ধারণাগুলি সামাজিক অনুবর্তনের দ্বারা গঠিত হয়। অতএব কমিটি প্রস্তাব রাখে যে, এই সময় ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সহজ সেলাই, হাতের কাজ, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি শেখানো উচিত, যাতে নারী-পুরুষের প্রভেদ সংক্রান্ত ধারণাগুলি সহজে গড়ে উঠতে না পারে। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকা আরও বেশি সংখ্যায় নিয়োগ করতে হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (Lower Secondary Level)

14 বছর পর্যন্ত সর্বজনীন যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা ছেলে ও মেয়েদের একই ধরনের হওয়া উচিত এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনোরকম পাঠক্রমে কোনো পার্থক্য করা হবে না এবং সাধারণ পাঠক্রমে সবার জন্য গৃহবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই স্তরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা দুই ধরনের শিক্ষাকর্মী থাকবে। প্রধানত ছেলেরা বেশি পড়ে এইরকম বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য ছাত্রী আবাস তৈরি করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি। অভাবগ্রস্ত মেয়েদের বৃত্তির ব্যবস্থাও থাকা উচিত। সবশেষে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারার জন্য যানবাহনের সুবিধা থাকার কথাও কমিটি বলেছে।

মাধ্যমিক স্তর (Secondary Level)

কমিটি সুপারিশ করে যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে বৃত্তিশিক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করলেও কোনো শিল্প বা হাতের কাজকে পাঠক্রমে আবশ্যিক অংশ করতে হবে।

কমিটি আরও প্রস্তাব করে যে সাধারণ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। এই বৃত্তিশিক্ষা নিম্ন মাধ্যমিকের পরে শুরু হবে এবং তিন বছর ধরে চলবে। এই বৃত্তিশিক্ষা পাঠক্রমটি বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে তৈরি হবে। এমন ধরনের বিষয় থাকবে যেগুলি মেয়েদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতে সাহায্য করবে। কমিটি আরও মন্তব্য করে কী কী ধরনের বৃত্তি বা পেশার প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে গবেষণা চালানো উচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে পাঠক্রম আবার বিভাজন করা উচিত যাতে ছাত্রীদের একটি অংশ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে এবং অন্য দলটি বিশেষ শিক্ষা নেবে যাতে তাদের বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে বিভিন্ন ধরনের বিষয় থাকবে যেগুলি প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যপুস্তক রচনা (Textbook Writing)

পাঠ্যবই, ভাষা এবং ছবি সকল যেন লিঙ্গ বৈষম্যের ভারসাম্য বজায় রাখে। এর জন্য করণীয়গুলি হল—

- পাঠ্যবিষয়গুলির গল্প এবং অনুশীলনগুলি বালক এবং বালিকাদের প্রতি সমভাবে নজর রাখে এবং তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি যেন প্রতিফলিত হয়।
- বালক ও বালিকাদের সমভাবে যেন অনুশীলনের প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা গ্রহণে, দায়িত্ব এবং কার্যাবলির ক্ষেত্রে বালক ও বালিকাদের একইভাবে ক্ষমতায়ন করা হবে।
- গৃহকাজ, স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটিতে বালক এবং বালিকাদের সম গুরুত্ব দিতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে যেসব ছবি ব্যবহার করা হবে যেখানে বালক এবং বালিকার ছবি সংখ্যায় সমান হবে। কারো অধিক বা কম হবে না।
- নতুন পাঠ্যবই সব বালক এবং বালিকাদের সরবরাহ করা হবে।

পাঠ্যপুস্তক : পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ করে ভাষা ও সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে মেয়েদের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা ও সমস্যা সম্বন্ধীয় বিষয় থাকা উচিত। কমিটি সুপারিশ করে যে, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দিয়ে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া এবং লিঙ্গ বৈষম্যের ভারসাম্য রক্ষা করা (Balance in Classroom Process and Gender Inequality)

লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষ প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে UNESCO-র প্রস্তাব হল শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা। UNESCO-র প্রস্তাব অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট তালিকার (Table) সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরে সিদ্ধান্ত করা। নিম্নে তালিকার মাধ্যমে কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ করা হল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য প্রতিটি শ্রেণিতে কতজন ছাত্র এবং ছাত্রী আছে তা জানা :

তালিকা 1 বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	বালিকা	বালক	মোট	শ্রেণির মনিটর বালক না বালিকা
নির্দিষ্ট শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা				
,,				
,,				
,,				
,,				
,,				

তালিকা 2 বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা:

নির্দিষ্ট শ্রেণি (1)	মহিলা শিক্ষক	পুরুষ শিক্ষক
নির্দিষ্ট শ্রেণি (2)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (3)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (4)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (5)		
নির্দিষ্ট শ্রেণি (6)		
মোট		

3. (ক) বিদ্যালয়ের প্রধান: মহিলা/পুরুষ।
   (খ) বিদ্যালয়ে সহপ্রধান: মহিলা/পুরুষ।
4. (ক) বালক এবং বালিকা একই বিষয় পড়ে।
   (খ) যদি না হয় বালিকারা কী পড়ে যা বালকেরা পড়ে না।
   (গ) যদি না নয় বালকেরা কী পড়ে যা বালিকারা পড়ে না।
5. শিক্ষার্থীরা কি লিঙ্গ অনুযায়ী পৃথকভাবে বসে?
6. শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে ঘোরাফেরা করেন, তখন কি তিনি বালক বা বালিকার নিকট থেমে যায়?
7. শ্রেণিকক্ষের কাজ শেষ হওয়ার পরে জানতে হবে শিক্ষক কতবার বালক বা বালিকার সঙ্গে কথা বলেছে।

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ: শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দু-ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন—

(ক) পাঠদানের সময় শিক্ষক কতবার বালক এবং বালিকাকে সম্বোধন করেছেন তার সংখ্যা নথিভুক্ত করা হয়।

(খ) কতবার বালক বা বালিকাদের চকবোর্ডে কাজ করার জন্য শিক্ষক বা শিক্ষিকা ডেকেছেন।

নীচের তালিকায় উক্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হয়—

তালিকা 3 কতবার বালক বা বালিকা শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করেছে তার তথ্য

শিক্ষক ছাত্র বা ছাত্রীকে সম্বোধন করেছে	বালিকা	বালক	মোট
শিক্ষার্থী চক্‌বোর্ডে গেছে			

সর্বশেষে সব তালিকা থেকে যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার ভিত্তিতে মন্তব্য করা হয় যে শ্রেণিকক্ষের প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা সঠিকভাবে হয়েছে কিনা।

লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহপাঠীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (Peer Interaction for Balance in Gender Inequality)

উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশে সহপাঠীদের অবস্থান সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ নীতি প্রণয়ন নিকট বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সহপাঠীদের অবস্থান দলের প্রতিটি সদস্যদের পারদর্শিতার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে বহু সমীক্ষা হাতিমধ্যে করা হয়েছে। সহপাঠীদের জেন্ডার (লিঙ্গ) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। যদি শ্রেণিকক্ষে বালকেরা বালিকাদের থেকে অধিক বিশৃঙ্খল হয় সেক্ষেত্রে বালিকাদের সংখ্যা শ্রেণিকক্ষে যদি অধিক হয় তাহলে শ্রেণিকক্ষের আচরণ এবং আবহাওয়া অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এ ব্যতীত বালকদের আক্রমণাত্মক আচরণ শ্রেণিকক্ষের আচরণ এবং আবহাওয়ার মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে Chile (চিলি)-র একটি সমীক্ষার তথ্যে দেখা গেছে যে বালকেরা বালিকাদের তুলনায় অধিক আক্রমণাত্মক আচরণ করেছে। এ ব্যতীত বালকদের উপস্থিতি বালিকাদের আত্মবিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ের (যেমন গণিত এবং বিজ্ঞান) উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ছাত্রীদের নিজ সম্পর্কে প্রত্যাশার (Self Expectation) উপর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে জ্ঞানমূলক শিখনের স্টাইলের ক্ষেত্রে জেন্ডার (লিঙ্গ) পার্থক্য প্রভাব বিস্তার করে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ (যেমন—***Monaski,*** 2000; ***Hoxby,*** 2000; ***McEwan,*** 2001: ***Vigdor*** and ***Nechyba,*** 2004) তাদের সমীক্ষায় লিঙ্গ পার্থক্যের কারণে (সংখ্যায় বেশি বা কম) সহপাঠীদের মিথস্ক্রিয়ায় যেসব প্রভাব দেখা গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- মিথস্ক্রিয়ার উপর নেতিবাচক প্রভাব।
- শ্রেণিকক্ষের আচরণ এবং আবহাওয়া ব্যাহত হয়।
- বালকদের আক্রমণাত্মক আচরণ, বালিকাদের আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- বিশেষ বিশেষ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে (গণিত, বিজ্ঞান) বালিকাদের খারাপ ফল।
- বিদ্যালয় লিঙ্গভিত্তিক হবে না কো-এডুকেশন হবে এসম্পর্কে সরকারি নীতিগ্রহণে বিতর্ক দেখা যায়।
- যেসব বিদ্যালয়ে বালিকাদের সংখ্যা অধিক সেইসব বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা কম এবং পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষকদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষাবর্ষে পাঠক্রম সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়।

- অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে জ্ঞানমূলক শিখনের স্টাইলের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পার্থক্যের কারণে প্রভাব বিস্তার করে।

এ সব ব্যতীত উপরোক্ত সমীক্ষাগুলিতে আরও যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তাহল—

(ক) শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র তাদের শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করে না। সহপাঠীরাও জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। শিক্ষণের বক্তব্য সহপাঠীরা তাদের মধ্যে আলোচনা করে এবং অনেক কিছু শেখে। এ ছাড়া সহপাঠীরা নিজেদের মধ্যে তাদের অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করে এবং জ্ঞান বিনিময় করে।

(খ) সহপাঠীরা শ্রেণিকক্ষ আবহাওয়া এবং শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে (***Lavy*** and ***Schlosser,*** 2007)।

(গ) সহপাঠীদের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং শিক্ষকদের শ্রেণি প্রত্যাশার পরিবর্তন ঘটে (***Cunningham*** and ***Andrews,*** 1986)।

উপরোক্ত আলোচনা এবং সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের লিঙ্গ পার্থক্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে করণীয়গুলি হল—

1. শ্রেণিতে ছাত্রী এবং ছাত্রসংখ্যা সমান বা ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি হওয়া প্রয়োজন।
2. শিক্ষক ছাত্র ও ছাত্রীর প্রতি একই আচরণ করবেন। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করা সঠিক নয় যা আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখে পড়ে।
3. বিভিন্ন পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে ছাত্র এবং ছাত্রীদের সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ দূর করা প্রয়োজন।
4. শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোনোভাবে তাদের জেন্ডার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব (Teacher-Student Interaction for Balance in Gender Inequality)

সাধারণভাবে মনে করা হয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়ার উপর জেন্ডারের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যভাবে বলা যায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জেন্ডার শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়ার উপর পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

1960 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1990 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেসব গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রেণিকক্ষে বালক এবং বালিকাদের উপর শিক্ষকের আচরণে পার্থক্য দেখা গেছে (***Sadker*** and ***Sadker*** 1992, ***Tannen*** 1991)। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষকগণ পুরুষ ছাত্রদের নিকট অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং বিশ্লেষণাত্মক, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। করেন (***Sadker*** and ***Sadker*** 1992)। ***Thorne*** (1979)

বলেন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা উভয়েই পুরুষ শিক্ষার্থীদের বারংবার প্রশ্ন করে শ্রেণিকক্ষে প্রাধান্য বিস্তারে উৎসাহিত করেন।

পুরুষ এবং মহিলা উভয় জেন্ডারের শিক্ষকগণ পুরুষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অধিক সংখ্যায় মিথস্ক্রিয়া করেন।

Kelly (1988) সবশেষে মন্তব্য করেন যে শিক্ষক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বালক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। শিক্ষক বালিকাদের থেকে বালক শিক্ষার্থীদের অধিক প্রশ্ন করেন। অর্থাৎ ***Kelly***-র মতে, সঠিকভাবে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বালক শিক্ষার্থীদের প্রতি অধিক মনোযোগ দেন। ***Dale*** এবং ***Spencer*** (1980) মন্তব্য করেন যে তার শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে 58% বালকদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করেছেন অন্যদিকে বালিকাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করেছেন অন্যদিকে বালিকাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে সর্বোচ্চ 48% গড়ে 38%।

শিক্ষকের জেন্ডার শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বিভিন্ন জেন্ডারের শিক্ষকগণ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিচালন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুরুষ শিক্ষকগণ দ্রুত পাঠদান করেন, অধিক সময় কথা বলেন, দ্রুত পাঠের বিষয় পরিবর্তন করেন। অপরদিকে শিক্ষিকাগণ উৎকর্ষতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন, অধিক ধৈর্যশীল এবং গণতন্ত্রসম্মত আচরণ করেন (***Chavez*** 2000)।

শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ব্যাপারে পার্থক্য দেখা যায়। সাম্প্রতিককালের ***Francies*** (2004)-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বালিকাদের তুলনায় বালকরা শ্রেণিতে অধিক মিথস্ক্রিয়া করে।

Chavez (2000) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বালিকাদের তুলনায় বালকেরা শ্রেণিকক্ষে অধিক হাস্যরসের কারণ হয়েছে। বালিকারা বেশিরভাগ শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের সন্তুষ্টি আনয়নে সচেষ্ট থাকে। তবে সামগ্রিকভাবে। ছাত্রীরা শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিক ঘনিষ্ঠ হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। শ্রেণিকক্ষ কথোপকথনে বালিকারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কোনো কোনো বালিকা শ্রেণিকক্ষ মিথস্ক্রিয়াকে সচল রাখার চেষ্টা করেছে। এ ব্যতীত কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষ মিথস্ক্রিয়াতে জেন্ডারের প্রভাব দেখা যায়নি।

সবশেষে বলা যায় যে শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করলে বালক এবং বালিকারা যেন সমভাবে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণ প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন, শ্রেণিকক্ষ বিন্যাসে তারা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন যাতে বালিকা এবং বালক উভয়েই শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে সমভাবে আগ্রহ প্রকাশ করে।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-2

সংবিধানের সংজ্ঞা দিন। (Give the definition of Constitution.)

Ans. লাতিন শব্দ 'Constitutus' থেকে 'Constitution' শব্দটি এসেছে। তবে সংবিধানের সংজ্ঞা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মার্কিন আইনবিদ **কুলি** ***(Cooley)*** সংবিধানকে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন বলে বিবেচনা করেছেন। **লর্ড ব্রাইস** ***(Lord Bryce)***-এর মতে, সংবিধান হল সমাজকে সংগঠিত ও শাসন করা এবং ঐক্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও নিয়মের রূপদানকারী আইনের এক জটিল সমষ্টি। **লোয়েন স্টাইন** ***(Lowen Stein)***-এর মতে সংবিধান হল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের নিয়মবিধির একটি প্রধান অঙ্গ। **গিলক্রিস্ট** ***(Gilchrist)***-এর মতে, সংবিধান হল কতকগুলি লিখিত বা অলিখিত নিয়ম যাদের দ্বারা সরকার গঠিত হয় এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ও সকল বিভাগের কার্যভার নির্ধারণ করা হয়।

সংবিধানের প্রস্তাবনা লিখুন। (Write the Preamble of the Constitution.)

Ans. ভারতীয় সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রণেতাগণ 1787 খ্রিস্টাব্দে গৃহীত মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রস্তাবনার মাধ্যমে সংবিধানের উৎস, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। প্রণেতাগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপ দেবার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং প্রতিটি ব্যক্তির সমান মর্যাদা ও সুযোগ এবং জাতীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রূপায়ণের কথা তাঁরা ঘোষণা করেন।

ভারতবর্ষে শিক্ষার সাংবিধানিক লক্ষ্যগুলি কী কী? (What are the Constitutional goal for education in India ?)

Ans. 1. বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (Free and Compulsory Primary Education)
2. সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার (Rights to Establishment and Management of Minority Institution)
3. সমাজে দুর্বল শ্রেণির শিক্ষা (Education of Weaker Section of Society)
4. ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education)
5. নারীশিক্ষা (Women Education)
6. প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা (Mother-tongue in Primary Education)

ebook.dascoaching.in

7. হিন্দি ভাষার শিক্ষা (Hindi Language Education)
8. জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ (Preservation of National Culture)
9. অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বিদ্যালয়ে সাহায্য।

বিশ্বায়নের উপাদানসমূহ কী কী? (What are the different factors of globalization ?)

Ans. বিশ্বায়নের বিভিন্ন উপাদানগুলো হল—
(i) বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান কারণ হল বাজারের আয়তন বৃদ্ধি। বর্তমানে এমন সব ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান দেখা যাচ্ছে যারা কেবল একটি দেশের বাজারের উপর নির্ভর করে এই বাজার ব্যবস্থা পরিচালনা করে না।
(ii) বিভিন্ন দেশের উদ্বৃত্ত সম্পদগুলি যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব।
(iii) একটি দেশের সাময়িক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সহজে অন্য কোনো দেশ যেখানে সুগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান সেখানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা।
(iv) অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কম মূল্যে উৎকৃষ্ট মানের জিনিসপত্র প্রস্তুতিকরণ।
(v) দক্ষ অথচ অবিনিয়োগকৃত বাজারগুলিতে বিনিয়োগ ও বিস্তার ঘটানো।
(vi) সাংস্কৃতিক সঞ্চালন ও একতার পদ্ধতি অনুসরণ।
(vii) অন্য দেশ থেকে সস্তায় দক্ষ শ্রমিক ব্যবহারের মাধ্যমে জিনিসের উৎপাদন মূল্য কমানো ইত্যাদি।

বহুসংস্কৃতিবাদের ইতিবাচক দিকগুলি লিখুন। (Write the positiveness of multiculturalism.)

Ans. বহুসংস্কৃতিবাদের ইতিবাচক দিকগুলি হল—
1. বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বলে বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য সৃষ্টি করে এবং এর চর্চার ফলে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির উন্নয়ন ঘটে।
2. বিভিন্ন সংস্কৃতির সহ অবস্থানের ফলে একদিকে যেমন বহুসংস্কৃতিবাদ দৃঢ় হয় তেমনি প্রতিটি সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়।
3. ব্যক্তির সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি, যেমন—সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সমন্বয়বোধ বিকশিত হয়।
4. ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ, যেমন—উদারতা, অনুভূতিশীলতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, সৎসাহস প্রভৃতি বিকশিত এবং শক্তিশালী হয়।
5. বহুসংস্কৃতিবাদে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যার ফলে তারা নিরাপত্তা বোধ করে।
6. বহুসংস্কৃতিবাদ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

▶ **ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে কোঠারি কমিশনের বক্তব্যগুলি লিখুন। (Write the discussion of Kothari Commission about secularism.)**

Ans. ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি কোঠারি কমিশনের বক্তব্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

1. রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন ও ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশমতো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বেসরকারি বিদ্যালয়েও এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বলে আশা করা যায়।
2. বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ কী করে ধর্মের মূল নীতিগুলি কার্যকরীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সেজন্য শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থ রচনা করবে।
3. বহুধর্মাবলম্বী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরধর্মসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব থাকলে সেখানে নাগরিকগণ মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে পারে। সমস্ত প্রধান ধর্মের মূল নীতি ও প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে হবে। সমগ্র দেশের বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে একই শিক্ষা দেওয়া হলে সর্বধর্মের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাবান হবে।
4. বিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করে যা আমাদের অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোভাবসম্পন্ন করে তুলবে।

▶ **জাতীয় সংহতির অর্থ কী? (What is the meaning of National Integration ?)**

Ans. একটি দেশের সমস্ত নাগরিক যখন তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যতিরেকে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি শক্তিশালী ইতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করে তখন তাকে আমরা জাতীয় সংহতি বলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতি কোনো ধারণা নয়, এটি একটা ক্রিয়া বা কর্ম যা যৌথভাবে একটা দেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা হয়। তাই জাতীয়তারই একটা প্রকাশ হল জাতীয় সংহতি। তাই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, জাতীয় সংহতি হল একটি প্রক্রিয়া আর জাতীয়তা হল তার বহিঃপ্রকাশ বা ফলশ্রুতি।

▶ **SC, ST এবং OBC-দের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ লিখুন। (Write the Constitutional safeguard of SC, ST & OBC.)**

Ans. আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের এই দুর্বল অংশের জন্য সাংবিধানিক কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

1. সংবিধানের Article 14 (14 নং ধারা)-তে আইনের চোখে সকলকেই সমভাবে দেখা এবং সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

2. সংবিধানের 15 (4) নং ধারায় সমস্ত রাজ্যকেই অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী SC, ST, এবং OBC যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা।
3. সংবিধানের 16 (4) এর ধারায় রাজ্যকে বৃত্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া আছে। বর্তমানে এই সংরক্ষণের উচ্চ শিক্ষায় ভরতির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ছাড়া সংবিধানের বিভিন্ন ধারা যেমন—17, 46, 275 (1), 330, 340, 341, 342, 244 (1) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে SC, ST এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (OBC) জনগণের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-5

▶ কেন্দ্রীয় তালিকার ধারাগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the section of Union list.)

Ans. 90-91 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? (What is meant by globalization?)

Ans. 92-93 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করুন। (Discuss the negativeness of globalization.)

Ans. 97 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্যগুলি লিখুন। (Write the significance of secularism in educational field.)

Ans. 103-104 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ স্থিতিশীল উন্নয়নের উপায়গুলি লিখুন। (Write the ways of sustainable development.)

Ans. 97-98 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পরিবেশ অবনমনের কারণগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the causes of environmental degradation.)

Ans. 117-118 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জাতীয় সংহতির সমস্যাগুলি লিখুন। (Write the problems of national integration.)

Ans. 122 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ উল্লেখ করুন। (Mention the obstructions in the way of international understanding.)
Ans. 129 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ দারিদ্র্য বলতে কী বোঝায়? (What is meant by poverty?)
Ans. 137-138 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ David Slesh উল্লেখিত দারিদ্র্যের কারণগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the causes of poverty according to David Slesh.)
Ans. 138-139 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়গুলি লিখুন। (Write the way to remove poverty.)
Ans. 141-142 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সংখ্যালঘুদের স্বার্থে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? (What are the steps taken to provision for minorities?)
Ans. 152-153 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ লিঙ্গ অসমতার কারণগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the causes of gender inequality.)
Ans. 156-157 পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-10

▶ ভারতবর্ষে শিক্ষার সাংবিধানিক লক্ষ্যগুলি আলোচনা করুন। (Discuss the constitutional goal for education in India.)
Ans. 87-89 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষার সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পর্ক আলোচনা করুন। (Discuss the relation between education and globalization.)
Ans. 94-96 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের কাজ ও সুপারিশগুলি লিখুন। (Write about the functions and recommendations of Brundtland Commission.)
Ans. 110-112 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ UNCED ঘোষিত নীতিগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the ethics declared by UNCED.)
Ans. 113-115 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জাতীয় অসংহতির গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলি আলোচনা করুন। (Discuss about the important sources of national disintegration.)
Ans. 122-124 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জাতীয় সংহতিকে সুনিশ্চিত করতে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss the role of education to ensure national integration.)
Ans. 124-126 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসারে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss the role of education to spread universalisation.)
Ans. 130-133 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ নিরক্ষরতার কারণগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the causes of illiteracy.)
Ans. 134-136 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ দারিদ্র্যের কারণগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the causes of poverty.)
Ans. 138-141 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পশ্চাৎপদতার কারণ ও তার প্রতিকার উল্লেখ করুন। (Mention the causes of backwardness and it's remedies.)
Ans. 145-150 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের উন্নতির জন্য কী সুপারিশ করা হয়? (What are the recommendation for development of backward people?)
Ans. 150-152 পৃষ্ঠা দেখুন।

This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in

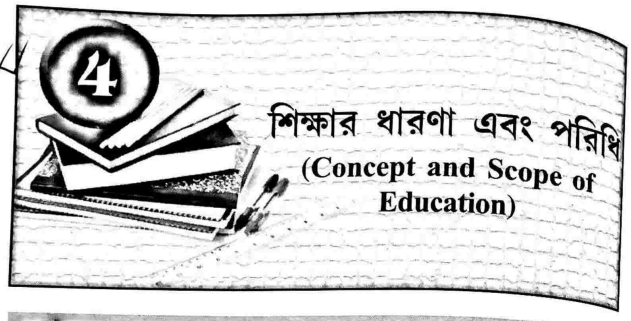

4 শিক্ষার ধারণা এবং পরিধি (Concept and Scope of Education)

শিক্ষার চারটি স্তম্ভ (Four Pillars of Education)

শিক্ষার উদ্দেশ্যের ইতিহাস বহু পুরোনো। প্রথাগত শিক্ষার সূচনা থেকেই শিক্ষাবিদরা শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। দেশ ও সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা ভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই জন্যই প্রাচীনকালে মধ্যযুগে এবং আধুনিক বিশ্বে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পরিচয় আমরা পাই।

1996 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে UNESCO-র মূল কেন্দ্র প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে **জ্যাকস্ ডেলার** ***(Jacques Delors)***-এর নেতৃত্বে একুশ শতকের শিক্ষার উপর 'Learning : The Treasure Within' নামে এক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সেই প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য বা শিখনের চারটি স্তম্ভের উল্লেখ করা হয়। যথা—

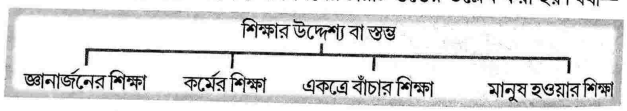

1. জ্ঞানার্জনের শিক্ষা (Learning to know), 2. কর্মের শিক্ষা (Learning to do), 3. একত্রে বাঁচার শিক্ষা (Learning to live together), 4. মানুষ হওয়ার শিক্ষা (Learning to be)।

জ্ঞানার্জনের শিক্ষা (Learning to Know)

'জ্ঞান অর্জন' শিক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে জ্ঞানার্জনের তাৎপর্য নীচে আলোচনা করা হল।

1. জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাবিদদের বক্তব্য: সবদেশের মহান শিক্ষাবিদরা সর্বকালের শিক্ষাদর্শন আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন।

প্রাচীনকালের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। আর এই আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হল জ্ঞান। **প্লেটো** ***(Plato)***-র মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের মাধ্যমে

মানুষের আত্মার গতিপ্রবাহকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা। **রুশো** ***(Rousseau)*** তাঁর শিক্ষাচিন্তায় দেহ ও মনের সুসংহত বিকাশসাধনের কথা বলেছেন। এই বিকাশসাধনের প্রধান উপাদান হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, যার পূর্ণ বিকাশের ফলেই ব্যক্তি পূর্ণ মানুষে পরিবর্তিত হয়। **ফ্রয়েবেল** ***(Froebel)*** তাঁর আধ্যাত্মিক একতা তত্ত্বে, সর্বভূতে ঐক্যের কথা বলেছেন। এই ঐক্যের উপলব্ধি আত্মজ্ঞানের ফলেই সম্ভব। **জন ডিউই** ***(John Dewey)***-এর মতে, কোনো জ্ঞানই শাশ্বত ও স্থায়ী নয়। শিশু পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা-ই হল জ্ঞান। সেই জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান সর্বদাই ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে হিতকর। ভাববাদী দার্শনিক **রবীন্দ্রনাথ** তাঁর শিক্ষাচিন্তায় আত্মজ্ঞানের সঙ্গে বহির্জগতের জ্ঞানের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। জ্ঞানের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির কথা উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষার দ্বারাই যা সম্ভব। **স্বামী বিবেকানন্দ** তাঁর শিক্ষাচিন্তায় ব্যক্তির সম্ভাবনার উপর অগাধ আস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ব্যক্তির মধ্যেই জ্ঞান বিদ্যমান। শিক্ষার কাজ হল সেই জ্ঞানের প্রকাশ ঘটানো।

2. জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য: প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য (যেমন কর্মের জন্য শিক্ষা, একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা, মানুষ হওয়ার শিক্ষা) পূরণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জ্ঞান অর্জন। জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়েই কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন হয়, কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্মে উৎকর্ষ অর্জনে সক্ষম হয়। মানুষ হওয়া কাকে বলে; আদর্শ নাগরিকের বৈশিষ্ট্যগুলি কী; নৈতিক বোধসম্পন্ন, সুস্থ ও সমাজ-বাঞ্ছিত মানুষে পরিণত হওয়া যায় কীভাবে, জ্ঞানের সাহায্যেই ব্যক্তি সে-সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। একইভাবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই ব্যক্তি একত্রে বেঁচে থাকার সুবিধা, সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় হয়।

3. জ্ঞানার্জন ও অভিযোজন: শিক্ষা হল অভিযোজন। জৈবিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন হল পরিবেশ সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান অর্জন। পরিবেশের উপাদানগুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানলে সার্থক অভিযোজন সম্ভব নয়। পরিবেশের শক্তি ব্যবহার এবং প্রয়োজনমতো তার নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়েই অর্জন করি।

4. জ্ঞানার্জন ও পরিবর্তনশীল বিশ্ব: প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য মানবজাতির কাছে জ্ঞানার্জনের শিক্ষাগত তাৎপর্য অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আমরা যদি নতুন বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত না হই তাহলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। জ্ঞানের দ্রুত বিকাশের ফলে একদিকে যেমন আমাদের জীবনযাত্রা অনেক সহজ ও সমৃদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যার সঙ্গে যদি পরিচিত না হই, সমস্যার

প্রকৃতি, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যদি জ্ঞানার্জন না করি তাহলে সমস্যার সমাধান করতে পারব না। আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। অন্যদিকে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ও সেই জ্ঞানকে প্রয়োজনমতো কাজে লাগিয়ে আমাদের জীবনযাত্রাকে আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি।

5. জ্ঞানার্জন ও মানসিক বৈশিষ্ট্য: ব্যক্তির বিভিন্ন সামাজিক জ্ঞানার্জনের ফলে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেমন স্মৃতি, যুক্তি নির্ণয়, বিচারকরণ, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধি ইত্যাদির বিকাশ ও অনুশীলন হয়।

6. জ্ঞান আহরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি: ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জ্ঞানার্জনের ফলে সম্ভব হয়। জ্ঞানের অভাবে মানুষ ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অন্ধবিশ্বাসে আক্রান্ত হয়। জ্ঞানই মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

7. জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়: জ্ঞান ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করে, ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। যে-কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সে দ্বিধাবোধ করে না। সে তার মতামত ব্যক্ত করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

8. জ্ঞানের প্রসার: জ্ঞান ব্যক্তিকে আরও জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা দেয়, জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে উৎসাহ জোগায়।

উপরের আলোচনা থেকে এই মন্তব্য করা যায় যে, জ্ঞান শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন পরিবেশে সার্থক অভিযোজনের ক্ষেত্রে জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক শক্তিগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান তাদের বিকাশ ঘটায়, পরিবর্তনশীল বিশ্ব সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করে। এর ইতিবাচক দিকগুলিকে যেমন ব্যবহার করে, তেমনি ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার মোকাবিলায় প্রস্তুত করে।

কর্মের শিক্ষা (Learning to Do)

জীবনব্যাপী শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল কর্মের শিক্ষা। কর্মের শিক্ষা শুধুমাত্র কাজ সম্পন্ন করা নয়। কাজে উৎকর্ষ আনা। কাজে দক্ষ হওয়া। নতুন পরিস্থিতিতে দলবদ্ধভাবে কাজ করা। শিক্ষাগ্রহণের সময়ে শিক্ষার্থীকে যদি কর্ম অভিজ্ঞতার বা সামাজিক কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি হয় ও তারা ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং কাজে দক্ষতা অর্জনের পরিবেশ গড়ে ওঠে। শিক্ষক সক্রিয় পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীকেও সক্রিয় হতে হয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মদক্ষতা গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে।

শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি নতুন কিছু নয়। বহুদিন আগে থেকেই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা গড়ে তোলার চেষ্টা চলে আসছে। প্রাচীনকালের গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অনেক কাজ করতে হত। যেমন যজ্ঞের জন্য কাঠ সংগ্রহ, জল আনা, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা, গুরুর সেবা করা, নিজের

কাজ নিজে করা ইত্যাদি। এ ছাড়া অপরাবিদ্যার মাধ্যমেও কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যই পূরণ হত। বহুক্ষেত্রে 'শ্রেণি' অর্থাৎ শিল্পসংঘই শিক্ষায় কর্মোদ্যোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করত। কৃষি সংঘ, গোপালক সংঘ, বণিক সংঘ, কারিগরি সংঘ, শিল্পী সংঘ প্রভৃতি নানা শ্রেণি গঠনের উল্লেখ স্মৃতিশাস্ত্রে আছে।

মধ্যযুগে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অর্থাৎ কর্মের শিক্ষার প্রচলন ছিল। মূলত শিল্পভিত্তিক নির্মাণ কাজেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে উডের ডেসপ্যাচে (1856 খ্রিস্টাব্দ) কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার মধ্যে দিয়ে কর্মকুশলতার উদ্দেশ্য পূরণের ব্যবস্থাই করে। 1882 খ্রিস্টাব্দের হান্টার কমিশনেও 'বি' কোর্সকে ব্যাবহারিক শিক্ষার পাঠক্রমে রূপ দেওয়া হয়।

1837 খ্রিস্টাব্দের বুনিয়াদি শিক্ষায় কর্মভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার কর্মমুখী উদ্দেশ্যকে পূরণ করার চেষ্টা করা হয়।

সার্জেন্ট কমিশন (1944 খ্রিস্টাব্দের) এবং অ্যাবট উড রিপোর্টে বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর প্রথম শিক্ষা কমিশনে (রাধাকৃষ্ণণ কমিশন) তত্ত্বগত বিষয়ের পাশাপাশি ব্যাবহারিক বিষয় শিক্ষণের সুপারিশ করে কর্মশিক্ষাকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রায় একই কথা বলা যায় মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশের ক্ষেত্রে। পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে ব্যাবহারিক কাজের অন্তর্ভুক্তি কর্মশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার কথাই ব্যক্ত করে।

কোঠারি কমিশনে কর্মশিক্ষার প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়। কমিশনের মতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মজগৎ ও শিক্ষাজগতের মধ্যে একটা ব্যাবধান তৈরি করে। কর্ম অভিজ্ঞতা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কর্ম অভিজ্ঞতা হল এমন এক ধরনের পদ্ধতি যা শিক্ষার সঙ্গে কর্মের যোগসূত্র রচনা করে। 1886 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও কর্মের শিক্ষার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে উৎপাদনে মানবসম্পদকে যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

কর্মের শিক্ষার তাৎপর্য নীচে উল্লেখ করা হল—

1. শিক্ষাবিদগণ ও কর্মের শিক্ষা: বিশ্বের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদরা শিক্ষার লক্ষ্য আলোচনা করতে গিয়ে কর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। **রুশো** ***(Rousseau)*** শিশুকে সক্রিয় করে তোলার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন শিশুকে তার কর্মেন্দ্রিয়গুলির পরিচালন ক্ষমতা অর্জনের সহায়তা করতে হবে। শিশুকে তার দৈহিক ক্ষমতাগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে সহায়তা করতে হবে। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশু দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলোর মধ্যে দিয়েই শিখবে। এর ফলে শিশুর কর্মের প্রতি আগ্রহ ও কর্মদক্ষতা বিকশিত হবে।

পেস্তালৎসি *(Pestalozzi)* ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলার কথা বলেছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য তিনি শিল্প কাজ শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন। **ফ্রয়েবেল** *(Froebel)* তাঁর পাঠক্রমে মাটির কাজ এবং কায়িক পরিশ্রমকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে কর্মশিক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। **হারবার্ট স্পেনসার** *(Herbert Spencer)* তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতি হিসেবে দেখেছেন। এই পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অন্যতম দিক হল উপার্জনশীল, সুনাগরিক হয়ে ওঠা। এর জন্য তিনি পাঠক্রমে বহুমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। **ডিউই** *(John Dewey)* কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের কথা বলেছেন। শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে ডিউই সমস্যামূলক পদ্ধতির কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে **কিলপ্যাট্রিক** *(Kilpatrick)* তাকে দলগত কর্মভিত্তিক প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে রূপ দিয়েছেন।

গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভারতীয় শিক্ষাবিদ তাঁদের উল্লিখিত পাঠক্রমে কাজ করার শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্যই হল ক্রাফ্‌ট-কেন্দ্রিক শিক্ষা।

2. কর্মমূলক মাত্রার বিকাশ: কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ফলেই ব্যক্তিসত্তার কর্মমূলক মাত্রার (Psycho-motar) বিকাশ এবং দক্ষতা অর্জনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর কী ধরনের বিকাশ ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা পাঠদানের উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে বলা হয়।

3. অনুভূতিমূলক মাত্রার বিকাশ: কর্মসম্পাদনের ফলে কর্মশিক্ষায় নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী তৃপ্তি অনুভব করে। তার মধ্যে সাফল্যের আনন্দ দেখা দেয়, যার ফলে অনুভূতির বিকাশ ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

4. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্মসম্পাদনে যোগ্যতা অর্জন: কাজ করার শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি জীবনের অন্যান্য কর্মমূলক পরিস্থিতিতে সফলতা অর্জন করার প্রশিক্ষণ পায়।

জ্যাকস্ ডেলর *(Jacques Delors)*-এর মতে, সকলকে নিয়ে কাজ করার সুযোগ কর্মমূলক শিক্ষায় থাকে, শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে যার অভাব দেখা যায়।

5. সামাজিক বিকাশ: কর্মমূলক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমাজে প্রয়োজনীয় উৎপাদনমূলক দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজচেতনা জাগ্রত হয় যা সামাজিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

6. মানবসম্পদের ব্যবহার: প্রতিটি শিক্ষার্থী কমবেশি কাজ করার সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কর্মমূলক শিক্ষা উক্ত সামর্থ্যকে কাজ লাগিয়ে মানবসম্পদের ব্যবহার করে, যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হয়।

7. শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করা: সমাজের কাছে শ্রমমূলক কাজের মর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম। কর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রমের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে। শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। তারা শ্রমকে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

8. সৃজনশীলতার প্রকাশ: প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীলতা বর্তমান। সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন রকমের কাজ দিতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা প্রকাশ পাবে।

9. কর্মে নৈপুণ্য: আমাদের সকলকেই কাজ করতে হয়। কর্মে নৈপুণ্য আনা সকলেরই লক্ষ্য। এর ফলে সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়। কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। কর্মনৈপুণ্য আনার ক্ষেত্রে কর্মমূলক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

10. সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ: আধুনিক শিক্ষা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আধুনিক শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। সেবামূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হবে। সমাজের সঙ্গে একাত্ম হবে। সমাজের ভালোমন্দের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হবে। সমাজে যে তাদের কিছু দেওয়ার আছে, সমাজও যে তাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে এই অনুভূতি সমাজে তাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে।

11. ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রস্তুতি: শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি ভবিষ্যৎ বৃত্তি জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। কর্মমূলক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে বৃত্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সচেতনতা গড়ে ওঠে, কোন্ ধরনের কাজে তার প্রবণতা এবং আগ্রহ আছে তা অভিজ্ঞ শিক্ষকরা বুঝতে পারেন। এইভাবে বৃত্তি নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় কর্মমূলক শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

12. দৈহিক সুস্থতা অর্জনের সহায়তা: জীবনব্যাপী শিক্ষায় শুধু মস্তিষ্কের অনুশীলন নয়; দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশি, অস্থি সবেরই অনুশীলন প্রয়োজন। এর ফলেই সুস্থ দেহে সুস্থ মন বাসা বাঁধতে পারে, দেহ ও মন উভয়েই সক্রিয় হতে পারে, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। কর্মমূলক শিক্ষা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশি, অস্থি, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে, জীবনব্যাপী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল কর্মের শিক্ষা। মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় দিকগুলি, যেমন—কর্ম ও অনুভূতিমূলক মাত্রার বিকাশ, কর্মসম্পাদনে যোগ্যতা অর্জন, দলের সঙ্গে কাজ করা, সামাজিক বিকাশ, সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ, মানবসম্পদের ব্যবহার, শ্রমের মর্যাদা দান, কর্মে নৈপুণ্য অর্জন, বৃত্তি পরিকল্পনা, দৈহিক সুস্থতা ইত্যাদি কর্মমূলক শিক্ষার মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে।

একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা (Learning to Live Together)

সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে একত্রে বেঁচে থাকা জীবনব্যাপী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। একত্রে বেঁচে থাকার অর্থ হল পরস্পরকে বোঝা; পরস্পরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং শ্রদ্ধা করা; পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে উপলব্ধি করা। আগামীদিনে আমাদের যে সংকট আসছে তা অনুধাবন করে তার মোকাবিলার জন্য সকলে মিলে কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করা। একইভাবে পাশাপাশি অবস্থানের ফলে যে মতপার্থক্য তৈরি হয় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শান্তির পথে তা মিটিয়ে ফেলা।

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই দর্শনকে সামনে রেখে এগিয়ে চলা।

আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে দিয়ে এই দর্শনই ফুটে উঠেছে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ জাগ্রত করাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মহান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি বিশ্বভারতী স্থাপন করেন। শ্রীঅরবিন্দর শিক্ষাদর্শন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে 'Auroville'-এ যাকে সর্বজনীন ঐতিহ্যের শহর বলে বিবেচনা করা হয়। 1968 খ্রিস্টাব্দের 24 ফেব্রুয়ারি বিশ্বের বিশ্বের 120টি দেশের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। Auroville একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছে, যেখানে শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে সমন্বয় ঘটেছে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনা ও আদর্শের। ভারত সরকার এবং UNESCO-এর যৌথ উদ্যোগে এখানে একটি আন্তর্জাতিক শহর তৈরি হয়েছে যেখানে সমগ্র বিশ্বের নারী ও পুরুষ সমস্ত রকমের পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিতে একত্রে বাস করছে।

কোঠারি কমিশনও এই 'একত্রে বেঁচে থাকা' বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কোঠারি কমিশনের মতে, জাতীয় চেতনা সঞ্চার ও জাতীয় সংহতি এবং 'এক বিশ্ব'-এর জন্য আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের পাঠধারার এমন রূপান্তর প্রয়োজন যাতে ছাত্রছাত্রীরা একদিকে দেশের সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে, অন্যদিকে বহির্বিশ্বের দেশগুলি সম্পর্কে সঠিক ও অপরিহার্য বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষার তাৎপর্য নীচে উল্লেখ করা হল।

1. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মসর্বস্বতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা দূর করে প্রেম, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতাকে জাগ্রত করে সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সহাবস্থানের মানসিকতাকে বিকশিত করা। একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা এই মানসিকতাকেই উৎসাহিত করে।

একই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, অবস্থানের নৈকট্য অনেক সময় মতপার্থক্যের কারণ হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার মানসিকতাকে অবলম্বন করে চলতে হবে। একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষাই এ ব্যাপারে আমাদের শক্তি জোগাতে পারে।

2. ঐক্যবোধ: ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে যে ঐক্য বর্তমান তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'—এই দর্শনই জীবনে চলার পথে দিশা হবে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত হয়েছে এবং একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষার মধ্যে দিয়েই এই উদ্দেশ্য পূরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

3. অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া: সার্থক এবং লাভজনকভাবে বেঁচে থাকতে হলে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে অনুধাবন করতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে আমরা একে অন্যের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতে পারব এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখব।

এ ছাড়া অন্যদের ইতিহাস, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকে মর্যাদা দিতে হবে। একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষার মধ্যে দিয়েই মানুষ পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। যার ফলে সকলেই আত্মমর্যাদার সঙ্গে এবং আর্থিক দিক থেকে লাভজনকভাবে জীবন কাটাতে পারে।

4. আন্তর্জাতিকতা বোধ: দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের বীভৎসতা, নির্মমতা, লোকক্ষয়, আর্থিক ক্ষয় দেখে সভ্য মানুষ শিউরে ওঠে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে আন্তর্জাতিকতা বোধ অর্থাৎ বিশ্বশান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্বনাগরিকতা ইত্যাদি গুরুত্ব পেতে থাকে। আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশের জন্য যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন, যেমন, মানবতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদির বিকাশ শিক্ষার মধ্যে দিয়েই সম্ভব। আর এই শিক্ষা হল একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা।

5. বিশ্বব্যাপী সংকট: মানুষের অদূরদর্শিতার ফলে আজ পৃথিবীতে নানা সংকট দেখা দিয়েছে, যেমন বিশ্বতাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুদূষণ, পানীয় জলের সংকট, খনিজ তেলের সংকট ইত্যাদি। এই সমস্ত সংকট নিরসনের জন্য এখনই ব্যবস্থা না নিলে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সংকট নিরাময় কোনো একটি দেশ বা সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই সংকটের জন্য সকলেই কমবেশি দায়ী। সকলে একত্রে হয়ে সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে সমাধানের উপায় হিসাবে কয়েকটি কর্মসূচি নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সেই কর্মসূচি নিখুঁতভাবে পালন করতে হবে। এইভাবেই একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক হবে।

6. সামাজিক সমস্যা: সমস্ত সমাজেই কোনো কোনো সময়ে এমন সমস্যা দেখা দেয় যার সমাধান না করলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। এইসব সমস্যার সমাধান কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সকলকেই এগিয়ে এসে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হয়। একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা ব্যক্তিকে এই ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীবনব্যাপী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা।'

মানুষ হওয়ার শিক্ষা (Learning to Be)

জীবনব্যাপী শিক্ষার চতুর্থ স্তম্ভ হল মানুষ হওয়ার শিক্ষা। 1972 খ্রিস্টাব্দে UNESCO থেকে প্রকাশিত 'The World of Education Today and Tomorrow'-তে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে মানুষ হওয়ার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে এর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিয়ে যুক্তি সহকারে সবাইকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি, যুক্তিশক্তি, কল্পনাশক্তি, শারীরিক ক্ষমতা, নান্দনিক বোধ, অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশ।

প্রাচীনকালে মানুষ হওয়া বলতে বোঝাত ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি। মননের সাহায্যে নিজের ও পরমাত্মার শক্তিকে আবিষ্কার করাই ছিল 'মানুষ হওয়ার' শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকদের মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি। **প্লেটো *(Plato)*, সক্রেটিস *(Socratis)*, কমেনিয়াস *(Comenius)*, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ** প্রমুখ ভাববাদী শিক্ষাবিদ আত্মোপলব্ধির কথা বলেছেন। এই আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির আত্মবিকাশ। যে সমস্ত সম্ভাবনা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই হল শিক্ষার লক্ষ্য। আর এই বিকাশের ফলে ব্যক্তি পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে।

অ্যারিস্টট্‌ল *(Aristotle)*, হারবার্ট স্পেনসার *(Herbert Spencer)*, ডারউইন *(Charles Darwin)*, রুশো *(Rousseau)*, পেস্তালৎসি *(Pestalozzi)* প্রমুখ প্রকৃতিবাদীর মতে আত্মবিকাশই হল শিক্ষার লক্ষ্য। এই আত্মবিকাশ হবে শিশুর স্বভাব অনুযায়ী। এতে কোনো কৃত্রিমতা যেন না থাকে। শিশু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকৃতির কোলে এবং প্রকৃতির উপাদানের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করবে এবং তবেই সে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে।

জন ডিউই *(John Dewey)*, কিলপ্যাট্রিক *(Kilpatrick)*, উইলিয়াম জোনস *(William Jones)* প্রমুখ প্রগতিবাদী শিক্ষাদার্শনিকদের মতে, শিক্ষার্থী নিজেই বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বৌদ্ধিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। তাই শিক্ষার্থীদের এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে যাতে তারা নিত্যনতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং উৎপাদনশীল, দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হতে পারে। একেই প্রগতিবাদীরা মানুষ হওয়ার শিক্ষা বলে উল্লেখ করেছেন।

ডেলর কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী একুশ শতকের জীবনব্যাপী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে 'মানুষ হওয়ার' শিক্ষার তাৎপর্য উল্লেখ করা হল—

1. **সহজাত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ:** শিশুর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে মানুষ তৈরি করার কাজটি সার্থকতা লাভ করে। এই বিকাশের ফলেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যার সাহায্যে সে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সার্থক অভিযোজনে সচেষ্ট হয়।

2. **সামাজিক বিকাশ:** সামাজিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন ব্যক্তি সমাজের রীতিনীতি, প্রথা, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি সচেতন হয়, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সমাজ ও জাতির প্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা নেয় এবং সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

3. **জ্ঞানের ব্যবহারযোগ্যতা:** অর্জিত জ্ঞান যাতে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা প্রয়োগের মাধ্যমে যাতে আরও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবজীবনের সমস্যাগুলিকে সার্থকভাবে সমাধান করা যায় তার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। জ্ঞান আহরণ, তার নবীকরণ এবং ব্যবহারযোগ্যতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

4. **বিজ্ঞানমনস্কতা:** কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদিকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিচার করতে হবে। বিশ্বাসের ভিত্তি হবে কার্যকারণ সম্পর্ক।

5. **গণতান্ত্রিক মানসিকতা:** সামাজিক ন্যায়, সকলের সমান অধিকার, সকলকে মর্যাদা দান, ন্যায্য অধিকার ইত্যাদি গণতান্ত্রিক মানসিকতা শিক্ষার মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়। মানুষ হওয়ার শিক্ষার অন্যতম শর্ত হল এই গণতান্ত্রিক মানসিকতা।

6. **প্রবহমান শিক্ষা:** 'মানুষ হওয়ার শিক্ষা' কেবল নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রবহমান শিক্ষা, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার প্রবহমানতা বজায় রাখা প্রয়োজন।

7. **পরিবর্তনশীলতা ও নমনীয়তা:** 'মানুষ হওয়ার শিক্ষা'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তনশীল পরিবেশকে স্বাগত জানিয়ে তার দাবি অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করা। কোনো রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি যেন নতুনের দাবি মতো চলার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

8. **সৃজনশীলতা:** ব্যক্তিমাত্রেই কোনো না কোনো দিকে সৃজনশীলতার সম্ভাবনায় পূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ একদিকে যেমন ব্যক্তির মধ্যে তৃপ্তি আনে, অন্যদিকে তেমনি সমাজ উন্নয়নে সাহায্য করে এবং সে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।

9. **জাতীয়তাবোধ:** জাতপাত, ভাষা, ধর্মের বিভেদ ভুলে, প্রাদেশিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে সকলকেই একজাতি-এক প্রাণ, একতার মানসিকতাকে সম্বল করে জাতীয় উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই মানুষ হওয়ার শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জাতীয়তাবোধের বিকাশ।

10. **আন্তর্জাতিকতাবোধ:** দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক ঘটনার ভয়াবহতাকে প্রতিকার ও প্রতিরোধের একমাত্র

উপায় হল আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ ঘটানো। এর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে বিশ্বশান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তান্তর ইত্যাদির সুফল সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তিকে সচেতন করা। মানুষ হওয়ার শিক্ষা এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জীবনব্যাপী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য 'হওয়া' অর্থাৎ 'মানুষ হওয়া'র শিক্ষার তাৎপর্য হল—1. ব্যক্তির সহজাত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। 2. সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিকে কার্যকর করা। সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিচার করে গ্রহণ করা ও সমাজজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ অগ্রগতিকে সাহায্য করা। 3. জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন, পুনর্নবীকরণ ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া, নিজের ভার নিজে বহন করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। 4. আচার-আচরণে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া। 5. নিজেকে চেনা ও সকলের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন। 6. জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের কল্যাণের কাজে অংশগ্রহণ করা।

জীবনব্যাপী শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (The Role of School in Fulfilling the Objectives of Life-long Education)

ডেলর কমিশন প্রস্তাবিত জীবনব্যাপী শিক্ষার যে চারটি স্তম্ভ বা উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পর সম্পর্কিত। যেমন কর্মের শিক্ষা, একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা ও মানুষ হওয়ার শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানার্জনের শিক্ষার সম্পর্ক বর্তমান। একইভাবে শিক্ষার প্রতিটি উদ্দেশ্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। ফলে বিদ্যালয়ে এমন কোনো কর্মসূচি নির্দিষ্ট করা যায় না যা শিক্ষার বিশেষ একটি উদ্দেশ্যপূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আসলে শিক্ষার মতো মানবসম্পদ উন্নয়নের জটিল কর্মসূচি ব্যক্তিসত্তার কোনো বিশেষ দিকের জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না। প্রতিটি কর্মসূচিই সার্বিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কর্মসূচি শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নির্ধারিত হয়।

নীচে জীবনব্যাপী শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় তার উল্লেখ করা হল—

(i) জ্ঞানার্জনের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের কর্মসূচি

প্রথমত, ব্যাপক সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সীমিত কিছু বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ব্যক্তিকে জীবনব্যাপী অভিযোজনে সাহায্য করবে, দৈনন্দিন সাধারণ সমস্যাসমাধানে সক্ষম করে তুলবে এবং জ্ঞানের যে-কোনো শাখায় বিচরণ করতে সাহায্য করেব। অন্যদিকে সীমিত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষার্থীকে বিষয়

সম্পর্কিত গভীর অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবে। জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক আছে তা অনুসন্ধানে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয়ত, জানার মৌলিক উপাদানগুলি যেমন স্মৃতি, মনঃসংযোগ এবং ক্ষমতার অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জীবনব্যাপী জ্ঞানার্জনের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সাবলীলতা ও উৎকর্ষের সঙ্গে কাজ করতে পারে। স্মৃতির কৌশলগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে। মনঃসংযোগের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ধ্যান, যোগ ইত্যাদিকে বিদ্যালয়-কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চিন্তনক্ষমতা অনুশীলনের জন্য সমস্যামূলক পদ্ধতি, আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি এবং আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে সমস্যাসমাধানে সচেষ্ট হয় তাদের সেদিকে উৎসাহিত করতে হবে। এই সমস্যাসমাধানে তারা যাতে আরোহী ও অবরোহী চিন্তনের আশ্রয় নেয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীদের কৌতূহলকে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

(ii) কর্মের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের কর্মসূচি

প্রথমত, পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে এমন কিছু কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা কর্মশিক্ষা ও কর্মদক্ষতা বিকাশে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কর্মভিত্তিক কাজ করতে পারে সেই সুযোগ তৈরি করতে হবে।

তৃতীয়ত, তাত্ত্বিক শিক্ষা এবং কর্মশিক্ষা যাতে সমান গুরুত্ব পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থত, শিক্ষার্থীদের এমন সব কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে ব্যাবহারিক জীবনে যার মূল্য আছে।

(iii) একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের কর্মসূচি

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিসহ পাঠক্রমিক বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমিউনিটি সচেতনতা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করতে হবে। এর মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য একত্রে বেঁচে থাকার শিক্ষার কার্যকারিতা শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে। ওই ধরনের কিছু কর্মসূচির উল্লেখ করা হল—

প্রথমত, একত্রে বেঁচে থাকতে হলে সহানুভূতি, পরার্থপরতা, ধৈর্য, গণতান্ত্রিক চেতনা, সহমর্মিতা, ত্যাগ ইত্যাদি বিভিন্ন চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন। বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত গুণের বিকাশ ঘটাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ সংগঠন এবং কার্যকরীকরণে শিক্ষার্থীরা যাতে কোনোভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় সে ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে।

ওই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা দলগত কাজের সুফল এবং ওই ধরনের কাজের রীতিনীতি, শর্ত ইত্যাদি অনুশীলনে রপ্ত হবে যা তাকে সকলকে নিয়ে চলতে সাহায্য করবে।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয় এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করবে যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কমিউনিটির যোগাযোগ ঘটে। যেমন—পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ সংগঠন ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নিয়ে ওই সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করে সে ব্যাপারে বিদ্যালয় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চতুর্থত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, সেখানকার মানুষজন, তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমস্যা ও প্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, ভূগোল, বিশেষ করে মানবিক ভূগোলের উপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্প ও উৎপাদন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথিবীর দেশগুলি যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সেই সব তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

ষষ্ঠত, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে তাদের পশ্চাৎপট ও কার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে।

সপ্তমত, জাতি-ধর্ম, অঞ্চল, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই সমমানের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে। 1968 খ্রিস্টাব্দের শিক্ষানীতিতে যে 'কমন স্কুল'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অষ্টমত, বিদ্যালয়ে বিনোদনমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যেমন—আঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা-ধর্ম-গোষ্ঠীগত বিভেদ দূর করে জাতীয় সংহতিকে নিশ্চিত করতে হবে।

(iv) প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের কর্মসূচি

প্রকৃত মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কর্মসূচি নীচে আলোচনা করা হল—

1. শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ: সহজাতভাবে শিক্ষার্থী যে সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বিদ্যালয়ের নানারকম পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে।

2. বিকশিত ক্ষমতার উপযুক্ত প্রয়োগ: বিকশিত ক্ষমতাগুলি যাতে ব্যক্তি সমাজ ও জাতির কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারে সে সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

3. অভিযোজনে সাহায্য করা: প্রকৃত মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উত্তম অভিযোজনে সক্ষমতা। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে অভিযোজন প্রক্রিয়ার অনুশীলন হয়। এই অনুশীলন শিক্ষার্থীকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে সক্ষম করে তোলে।

4. সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা: বিভিন্ন ধরনের দলগত কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন কিছু সমাজবাঞ্ছিত এবং সমাজ দ্বারা প্রশংসিত কাজে দক্ষতা জন্মায় যা তাকে সমাজে সুনাম অর্জন করতে সাহায্য করে। এই ভাবে ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয় এবং সমাজের কাছে প্রকৃত মানুষ হিসাবে পরিচিত হয়।

5. উৎপাদনশীল নাগরিক হতে সাহায্য করে: বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিশেষ করে কর্মশিক্ষা, শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে উৎপাদনশীল নাগরিক হতে সাহায্য করে যা প্রকৃত মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই উৎপাদন ক্ষমতা ব্যক্তিকে একদিকে যেমন জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক ও জাতীয় উৎপাদন তথা আর্থিক বিকাশে সাহায্য করে, যা প্রকৃত মানুষ হওয়ার অন্যতম শর্ত। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নয়নে নিজেকে যুক্ত করা প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার অন্যতম শর্ত। এই শর্ত পূরণে ব্যক্তিকে উৎপাদনশীল হতে হবে।

6. গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশ: বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষামূলক কার্যসূচির মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং গণতন্ত্রসম্মত আচরণে শক্তি জোগায়। এই গণতান্ত্রিক আচরণ প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষার বিশেষ দিক।

7. মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা: শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত মূল্যবোধ গড়ে তোলা মানুষ হওয়ার শিক্ষার অন্যতম কর্মসূচি। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যসূচির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধগুলি বিকাশের চেষ্টা করা হয়।

8. জাতীয় বিকাশে সহায়তা: জাতির সঙ্গে একাত্মবোধ, জাতির প্রতি অনুভূতিশীল, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং জাতির উন্নতিতে শামিল হওয়া সবই জাতীয় বিকাশের অঙ্গ। শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এগুলি অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে হবে। মানুষ হওয়ার শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

9. আন্তর্জাতিক সচেতনতা বিকাশে সহায়তা: আমরা একই বিশ্বের অধিবাসী, বিশ্বের ভালোমন্দের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত। বিশ্বকে বাসোপযোগী করে রাখতে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আমাদের সকলেরই বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রতিবেশী রাজ্য এবং দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক যে পরস্পরের পক্ষেই মঙ্গলজনক তা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করাতে হবে। এই আন্তর্জাতিক সচেতনতা মানুষ হওয়ার শিক্ষার পক্ষে একান্ত জরুরি।

শিক্ষার লক্ষ্য: ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক এবং জাতীয় উন্নয়ন (Aim of Education: Personal, Social, Economic and National Development)

ভূমিকা (Introduction)

প্রতিটি পরিকল্পিত কর্মসূচিই লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষা যেহেতু একটি পরিকল্পিত কর্মসূচি স্বাভাবিকভাবেই তার লক্ষ্য থাকবে। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজ তার আশাপ্রত্যাশা পূরণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছে। সময়ভেদে সমাজের আশাপ্রত্যাশার পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

আদিম যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এর পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করতে পারি যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তন (Evolution of the Aims of Education)

(i) আদিম যুগ: খাদ্যসংগ্রহ এবং নিরাপত্তাই ছিল আদিম যুগের মানুষের প্রধান সমস্যা। এই জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে কয়েকটি কৌশল শিখতে হত। তাই আদিম যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল খাদ্যসংগ্রহ ও নিরাপত্তার কৌশল আয়ত্ত করা।

(ii) প্রাচীন যুগ: প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং পার্থিব সমস্ত দুঃখ, জরা, শোকতাপ থেকে মুক্তি পাওয়া। আত্মোপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা, তাকে বলা হত পরাবিদ্যা। পার্থিব অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাকে বলা হত অপরাবিদ্যা। পরা ও অপরাবিদ্যা—দুটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হত, যদিও পরাবিদ্যা উচ্চস্তরের শিক্ষা বলেই বিবেচিত হত। ব্রহ্মচর্য ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য, ব্যাকরণ, কলাবিদ্যা, চিকিৎসা, জোতির্বিদ্যা প্রভৃতির চর্চাকে অপরাবিদ্যা বলা হত। প্রাচীনকালে শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের বিকাশের ব্যবস্থা ছিল। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় ঘটেছিল।

(iii) মধ্যযুগ: মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায় ফলে ধর্মীয় অনুশাসন এবং অর্থহীন ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে শিক্ষা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের পরিবর্তে কতকগুলি ধর্মীয় রীতিনীতি কঠোরভাবে পালন, ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে বিচারবিশ্লেষণই প্রধান হয়ে ওঠে।

(iv) আধুনিক যুগ: শিক্ষার আধুনিক যুগ শুরু হয় **রুশো** ***(Rousseau)***-র সময় থেকে। তিনি তাঁর মানসপুত্র এমিল-এর শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনাকালে সর্বপ্রথম শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করে আধুনিক শিক্ষা যুগের সূচনা করেন। রুশোর শিক্ষাচিন্তাকে আরও বাস্তব, মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন **পেস্তালৎসি, হারবার্ট স্পেনসার** প্রমুখ বিখ্যাত শিক্ষা দার্শনিক।

একমুখী, দ্বিমুখী ও বহুমুখী লক্ষ্য

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীনকালে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল একমুখী, এক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার শিক্ষার্থীর শূন্য পাত্রে সঞ্চালিত করে দিতেন। রুশোর সময় থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে ওঠে দ্বিমুখী। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের বিনিময় ঘটে এবং উভয়ই সমৃদ্ধ হয়। বর্তমান কালের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা শিক্ষার বহুমুখী লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন। এই বহুবিধ লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম হল শিশুর বিকাশ।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানী **জন ডিউই** ***(John Dewey)*** মনে করেন, সমস্ত জীবনই বিকাশ এবং বিকশিত হওয়াটাই জীবন। তাঁর মতে, শিক্ষা ও জ্ঞান সমার্থক। শিক্ষাই বিকাশ এবং বিকাশই শিক্ষা। কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষাই বিকাশ বলতে ঠিক কী ধরনের বিকাশ বোঝায় কিংবা আমরা কী ধরনের বিকাশ প্রত্যাশা করি। কোনো স্বাধীন দেশ তার শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনায় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির বিকাশের কথা বিবেচনা করে। এই তিন ধরনের বিকাশের সমন্বয়ের ফলে সমগ্র জাতি ও দেশের বিকাশ হয়। এটিই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার লক্ষ্যের গুরুত্ব (Importance of the Aims of Education)

যে-কোনো পরিকল্পিত কর্মসূচির অপরিহার্য শর্ত হল তার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। শিক্ষা একটি পরিকল্পিত কর্মসূচি। লক্ষ্যই শিক্ষার মধ্যে গতি আনে এবং শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টার তাৎপর্য নির্ধারণ করে। যেসব কারণে শিক্ষার লক্ষ্যসমূহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা হল—

1. শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষামূলক কর্মসম্পাদনের স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়।
2. একটি শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে অর্থবহ করে তোলে।
3. শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়নে সাহায্য করে।
4. শিক্ষায় মূল্যায়নের ভিত্তি তৈরি হয়।
5. শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষামূলক কর্মসম্পাদনের পথ নির্দেশ করে, সময় ও শ্রম সাশ্রয় করে।
6. শিক্ষার লক্ষ্যগুলি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
7. শিক্ষার লক্ষ্যগুলি শিক্ষা প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
8. শিক্ষার লক্ষ্য বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল 'শিক্ষার লক্ষ্য'। শিক্ষার্থীর আচরণগত মান উন্নয়নে এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশে শিক্ষার লক্ষ্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার্থী কী শিখবে এবং কেন শিখবে অথবা শিক্ষক কী শেখাবেন—এগুলি সবই শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তনশীলতা (Changing Aims of Education)

শিক্ষা একটি সচেতন গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

1. **সমাজ ও জাতির চাহিদার পরিবর্তন:** সমাজ এবং জাতির চাহিদা ও আশা-প্রত্যাশা শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জাতির চাহিদা এবং আশাপ্রত্যাশার পরিবর্তন হয়, যার ফলে শিক্ষার লক্ষ্যেরও পরিবর্তন ঘটে।
2. **ব্যক্তির চাহিদার পরিবর্তন:** শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির চাহিদা পূরণ। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যক্তি-শিক্ষার্থীর চাহিদার পরিবর্তন ঘটে যায়, ফলে শিক্ষার লক্ষ্যেরও পরিবর্তন ঘটে।
3. **জ্ঞানের প্রসার:** প্রতিনিয়ত জ্ঞানের প্রসার ঘটছে। জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
4. **শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন তথ্য:** সারা বিশ্বজুড়ে শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা চলছে। এই গবেষণা থেকে পাওয়া তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্যে পরিবর্তন আসা আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
5. **পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আদর্শ:** রাজনৈতিক মতাদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। এই কারণে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে শিক্ষার যে লক্ষ্য ছিল তার সঙ্গে বর্তমান স্বাধীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন, জ্ঞানের বিস্ফোরণ, শিক্ষা-গবেষণা, রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রভৃতি কারণে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং শিক্ষা প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী ও কার্যকরী হয়ে ওঠে। সুতরাং নানান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ও তত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য।

শিক্ষা লক্ষ্যের মূল তিনটি ধারা হল— (1) ব্যক্তিগত বিকাশ, (2) সামাজিক বিকাশ ও (3) জাতীয় বিকাশ।

শিক্ষার লক্ষ্য: ব্যক্তিগত বিকাশ (Aims of Education: Individual Development)

প্রাচীন কালের প্রেক্ষিতে: প্রাচীন গ্রিসের শিক্ষাব্যবস্থার দুটি পীঠস্থান ছিল **এথেন্স** ও **স্পার্টা**। এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা। অর্থাৎ, সেখানে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশসাধনই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। অন্যদিকে স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল রাজ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত সৈনিক তৈরি করা। অর্থাৎ, এখানে শিক্ষার কেন্দ্রে ছিল সমাজ। সমাজের চাহিদা পূরণই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য; ব্যক্তির চাহিদা ছিল গৌণ।

আধুনিক কালের প্রেক্ষিতে: আধুনিক কালে শিক্ষার লক্ষ্যকে বিকাশের সঙ্গে এক করে দেখা হলেও তা কতটা যুক্তিযুক্ত সেই বিতর্কের অবসান হয়নি। একদল শিক্ষাবিদ বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির বিকাশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **বার্ট্রান্ড রাসেল** *(Bertrand Russell)*, **স্যার পার্শি নান** *(Sir Percy Nunn)* প্রমুখ। ব্যক্তিগত বিকাশ বলতে ব্যক্তির কী ধরনের বিকাশ বোঝায় তা আলোচনা করলে, শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে ব্যক্তিগত বিকাশের তাৎপর্য বোঝা যায়। ব্যক্তিগত বিকাশ হল ব্যক্তি সহজাতভাবে যেসব গুণ নিয়ে এসেছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ। শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়েই এই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হয়।

ব্যক্তিগত বিকাশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, নৈতিক বিকাশ, সৃজনশীলতার বিকাশ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত বিকাশ, সামাজিক বিকাশ এবং ব্যক্তির স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তের বিকাশ। এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে—

1. দৈহিক বিকাশ: দৈহিক বিকাশ হল দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশি, অস্থি ইত্যাদির বিকাশ। দৈহিক বিকাশের লক্ষ্য পূরণের জন্য শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খেলাধুলা, শারীরশিক্ষা, যোগাসন ইত্যাদি।

2. মানসিক বিকাশ: মানসিক বিকাশ বলতে বুদ্ধি, চিন্তা, কল্পনা, আগ্রহ, মনোযোগ ইত্যাদির বিকাশকে বোঝায়। প্রধানত পাঠক্রমিক ও নির্দিষ্ট কিছু পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে এই বিকাশ কার্যকরী হয়। বিভিন্ন বিষয় শিখন, নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি অনুশীলনের ফলে মানসিক বিকাশ ঘটে।

3. প্রাক্ষোভিক বিকাশ: শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল, শিশুর আবেগ বা প্রক্ষোভের বিকাশ যাতে যথাযথভাবে ঘটে তার ব্যবস্থা করা। খেলাধুলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, দলগতভাবে কাজ করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যাতে বাঞ্ছিত প্রক্ষোভের বিকাশ হয় এবং অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রিত হয়, তার ব্যবস্থা করা শিক্ষা কর্মসূচির অন্যতম দায়িত্ব।

4. বৌদ্ধিক বিকাশ: শিশুর বিকাশের মধ্যে অন্যতম হল বৌদ্ধিক বা প্রজ্ঞামূলক বিকাশ। বৌদ্ধিক বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্যগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশকে সঠিকভাবে জানতে, জীবনে চলার পথে নানাবিধ সমস্যাকে বুঝতে, বিশ্লেষণ ও সমাধান করতে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করে সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে (বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন, ধারণা শিখন, সমস্যাসমাধান শিখন ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর মধ্যে বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

5. নৈতিক বিকাশ: শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক বোধ সৃষ্টি করা, নৈতিকতার অনুশীলন করা এবং ভবিষ্যতে নৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করা বর্তমান নৈতিক অবনমনের যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নৈতিক বিকাশেরই অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন—মনীষীদের জীবনী পাঠ, বিদ্যালয়ের প্রার্থনা, সমাজসেবামূলক কাজ, বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের নৈতিক বিকাশ ঘটানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

6. সৃজনশীলতার বিকাশ: প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই সৃজনশীলতার বীজ লুকিয়ে আছে। নৃত্যগীত, বাদ্য, নাটক, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, অঙ্কন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তির সৃজনশীলতা দেখা যায়। ব্যক্তির সৃজনশীলতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে, সৃজনশীলতা বিকাশের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির সাহায্যে ব্যক্তির সৃজনশীলতার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

7. কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত বিকাশ: দেশ ও জাতির কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুভূতিশীল হওয়া, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করা, সঞ্চালন ও উন্নয়নে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমেই ব্যক্তির মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এই বিকাশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত বিকাশের লক্ষ্য পূরণ হয়।

8. সামাজিক বিকাশ: সমাজের রীতিনীতি মেনে চলা, সকলের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করা, সকলের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো, সামাজিক মাপকাঠির উপর শ্রদ্ধা রাখা, সমাজে যারা অবহেলিত তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা এবং বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করাই হল সামাজিক বিকাশ। ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক বিকাশ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং বাইরে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

9. ব্যক্তির স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ: গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য হল ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং তার মধ্যে যাতে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করার ক্ষমতা বিকশিত হয় তার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম একটা স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি নিরপেক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা শিক্ষার এই লক্ষ্য পূরণে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিক্ষার লক্ষ্য হল সহজাতভাবে শিশু যে সম্ভাবনাগুলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তার পূর্ণ বিকাশসাধন করা। এর ফলে ব্যক্তি তার মতো করে সার্থক জীবনযাপন করতে পারবে এবং প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য: সামাজিক বিকাশ
(Aim of Education: Social Development)

শিশু সমাজে জন্মগ্রহণ করে। সমাজের কোলেই সে লালিতপালিত হয়। সমাজের মধ্যেই শিশু কালক্রমে ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে, সমাজের সমৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সে একজন সুস্থ নাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। একেই আমরা সামাজিক বিকাশ বলি। শিশুর এই বিকাশকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমাজ যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, তার অন্যতম হল শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ ঘটিয়ে নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে সাহায্য করা।

1. সামাজিক প্রক্রিয়া আত্তীকরণ: সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, বোঝাপড়া প্রভৃতি সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি ব্যক্তি সমাজে বাস করতে গিয়ে আয়ত্ত করে। বিদ্যালয় হল সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীরাও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করে। এই সামাজিক প্রক্রিয়া আত্তীকরণ শিক্ষার সামাজিক বিকাশের অন্যতম লক্ষ্য।

2. সামাজিক চেতনাবৃদ্ধি: বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার আগে পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরাই শিশুর একান্ত আপনজন ও বন্ধু। বিদ্যালয়ে আসার পর শিশু বিভিন্ন সামাজিক পটভূমি থেকে আসা সমবয়সিদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। তাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। পরস্পরের টিফিন ভাগ করে খেতে শেখে। একজন যদি পেনসিল, রবার, স্কেল আনতে ভুলে যায় তাহলে অন্য একজন তাকে সাহায্য করে। এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

3. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার: সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় সমাজের প্রতি অনুভূতিশীল হওয়া, সমাজের মঙ্গল কামনা করা, সামাজিক উন্নতিতে অংশগ্রহণ করা, সামাজিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা, সামাজিক বিভেদ দূর করা, সামাজিক ন্যায়ের প্রতি আস্থা রাখা ইত্যাদি। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকে একদিকে যেমন সামাজিক কাজে দক্ষ করে তোলে, অন্যদিকে জাতীয়তাবোধ এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশে সাহায্য করে। বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটায়।

4. সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান: প্রতিটি সমাজেই বিভিন্ন রকমের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়। সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধ ও সমাধানে শিশুকে দক্ষ করে তোলাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই সমস্যাসমাধানে কী করণীয়, সে বিষয়ে তাকে অবহিত করাও দরকার।

5. সামাজিক দায়িত্বপালন: শিক্ষা সামাজিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে সামাজিক দায়িত্বপালনে সক্ষম করে তোলে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সামাজিক কর্তব্যপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যা যা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই সে লাভ করে। যেমন, পরিবারের আর্থিক উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করা সব শিক্ষার্থীরই দায়িত্ব। তাই দায়িত্বপালনের জন্য শিক্ষার্থী বিদ্যালাভ করে চাকরিতে নিযুক্ত হয় বা ব্যাবসা করে এবং পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

6. সামাজিকীকরণ: সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে শিক্ষার্থী সামাজিক আদবকায়দা, রীতিনীতি, নিয়মশৃঙ্খলা, দায়দায়িত্ব, ঐতিহ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং ব্যক্তিজীবনের আচার-আচরণে তা প্রতিফলিত হয়। একেই সামাজিকীকরণ বলে। তাই সামাজিকীকরণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

7. সামাজিক মূল্যবোধ গঠন: সামাজিক মূল্যবোধ গঠন সামাজিক বিকাশের একটি বিশেষ দিক। প্রতিটি সমাজেরই কিছু মূল্যবোধ থাকে। সমাজের স্থায়িত্ব ও গভীরতা অনেকাংশে তার মূল্যবোধের উপরই নির্ভর করে। শিক্ষার লক্ষ্য হল সামাজিক বিকাশের সাহায্যে শিশুকে সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করানো এবং তা অনুসরণে সাহায্য করা।

8. সামাজিক প্রগতিতে অংশগ্রহণ: শুধুমাত্র সামাজিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করাই সামাজিক সদস্য হিসাবে শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমাজপ্রগতিতে তার ভূমিকা থাকাটাও সমাজের কাছে প্রত্যাশিত। সমাজের এই প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করে, যাতে শিক্ষার্থী সমাজপ্রগতিতে তার সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

9. সমাজ-সংরক্ষণ: সমাজের রীতিনীতি, প্রথা এবং সামাজিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সমাজের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিক্ষার্থীদের এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা এই লক্ষ্যটি পূরণে সচেষ্ট হয়।

10. সামাজিক সঞ্চালন: সমাজের রীতিনীতি, প্রথা এবং সামাজিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ওইগুলি তুলে দেওয়া সামাজিক সদস্য হিসেবে প্রতিটি

নাগরিকের কর্তব্য। শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষা এই লক্ষ্যটির বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তির বিকাশের পাশাপাশি সমাজের বিকাশও শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে সমাজ তার স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শিক্ষা-কর্মসূচির ব্যবস্থা করেছে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই প্রতিটি শিক্ষার্থী অবহিত হবে কীভাবে সে সমাজের স্বার্থ এবং সামাজিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

শিক্ষার কাজ শিক্ষার্থীর সামাজিক সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলা এবং তার জন্য শিক্ষাকে সমাজ অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এইজন্য বর্তমানে শিক্ষার নীতিগুলিকে অর্থনীতির তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হচ্ছে। একেই বলা হয় শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

অর্থনীতি ও শিক্ষা (Economics and Education)

সাধারণত অর্থনীতি বলতে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বোঝায়। আবার একে অর্থশাস্ত্রও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিককালে অর্থনীতিকে পৃথক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ***Adam Smith*** বলেছেন, "Economics is concerned with an enquiry into the nature and causes of wealth of Nations." আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন অর্থনীতি হল মানবসম্পর্কীয় বিজ্ঞান। অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল মানবকল্যাণ। ***Lionel Robinson*** বলেন, চাহিদা ও অপ্রতুল বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য বস্তুসম্পদের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনের ক্ষেত্রে মানুষ যেসব আচরণ করে তার বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন হল অর্থনীতি। অর্থনীতি মানবধর্মী হয়ে উঠেছে, কারণ মানুষের আচরণের মূলে যে সকল চাহিদা আছে অর্থনীতিতে তা অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

অর্থনীতিতে যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়ে থাকে সেগুলি হল—

(i) মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা সংক্রান্ত নীতি ও প্রকৃতি।
(ii) মানুষের চাহিদার সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের সম্পর্ক নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা।
(iii) বিভিন্ন সম্পদ উৎপাদনের মূলে কী কী শক্তি কাজ করে।
(iv) চাহিদা ও সম্পদের পারস্পরিক সম্পর্ক।
(v) সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাবলি।
(vi) আন্তর্জাতিক ব্যাবসাবাণিজ্য, ব্যাংকের ভূমিকা ইত্যাদি।
(vii) সামাজিক ন্যায়বিচার ও তার প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কেও অর্থনীতিতে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

আধুনিক যুগে মানুষকে অনেক বেশি জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য জটিল দক্ষতার প্রয়োজন হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রথাগত শিক্ষার। ফলে জাতীয় অর্থনীতি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা করলে অর্থনীতি ও শিক্ষাবিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ অর্থনীতিতে মানুষের চাহিদার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। তাই তাকে শিক্ষার প্রকৃতি জানতে হবে। তা না হলে মানুষের চাহিদার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানা যাবে না। আবার বলা যায়, ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্যের দিক থেকে শিক্ষা ও অর্থনীতি সম্পর্কযুক্ত। কারণ উভয়েরই লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সহায়তা করা। অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা, সেই দিক থেকেও শিক্ষা তাকে সহায়তা করে থাকে। অর্থনীতির আর-একটি উদ্দেশ্য হল সামাজিক সম্পদের সুষম বণ্টন। তাই অর্থনীতিকে সামাজিক বিজ্ঞানও বলা যায়। শিক্ষাও আধুনিক অর্থে সামাজিক বিজ্ঞান।

শিক্ষা ও অর্থনীতির মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক বর্তমান। উভয়েই উভয়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অর্থনীতি, কোনো একটি রাষ্ট্রের সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-পরিকল্পনা গঠনে সহায়তা করে। আবার অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে। শিক্ষা ও অর্থনীতির এই সম্পর্ক আলোচনার জন্য জ্ঞানের যে বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় শিক্ষামূলক অর্থনীতি।

শিক্ষামূলক অর্থনীতি (Educational Economics)

'শিক্ষামূলক অর্থনীতি' কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন অর্থনীতিবিদ ***সুলম***। অর্থনীতির উদ্দেশ্যের ন্যায় শিক্ষামূলক অর্থনীতিরও উদ্দেশ্য হল মানবকল্যাণ। শিক্ষামূলক অর্থনীতিকে তাই বলা হয়, ''Economics of education is that branch of economics which is concerned with the welfare programmes of education''। অধ্যাপক ***Samuelson*** বলেছেন, "Economics of education is chiefly concerned with the study of growth process combined with social justice।"

শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্য (Objectives of Educational Economics)

(i) প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে সমস্ত কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে এক সূত্রে আবদ্ধ করা।

(ii) জাতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন্ অংশের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হবে, অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্য।

(iii) শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যয় নির্ধারণ করাও শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্য।

(iv) শিক্ষাকে সামাজিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা ও শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করা।

(v) শিক্ষার সঠিক পরিকল্পনা রচনা করা।

Dakshin Dinajpur B. Ed College D/Dinajpur 2009

শিক্ষামূলক অর্থনীতির বিষয়বস্তু (Content of Educational Economics)

শিক্ষামূলক অর্থনীতির বিষয়বস্তুগুলি হল—

(i) অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিক্ষামূলক বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্ক।

(ii) মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা।

(iii) শিক্ষাকে সামাজিক বিনিয়োগ ও সেবামূলক কাজ হিসাবে আলোচনা করা।

(iv) মানবশক্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা।

(v) শিক্ষার মাধ্যমে কাজের সুযোগ কীভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা।

(vi) শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা ও শিক্ষার জন্য আর্থিক সংস্থান কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা।

(vii) শিক্ষামূলক অর্থনীতিতে সেইসব গাণিতিক তত্ত্ব ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যেগুলি শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনায় বিশেষভাবে সহায়তা করে।

আধুনিক যুগে শিক্ষার যে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, সেখানে অর্থনীতিবিদগণ শিক্ষাকে স্থূল পরিমাণে তথ্য ও কৌশল সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য করেছে। এইভাবে শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে কীভাবে রূপ দান করা হয়েছে তার উপর।

শিক্ষার লক্ষ্য: জাতীয় বিকাশ
(Aims of Education: National Development)

শিক্ষার লক্ষ্য—জাতীয় বিকাশ
(Aims of Education—National Development)

আধুনিককালের যে-কোনো স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশে সীমাবদ্ধ থাকে না। সামাজিক বিকাশের পাশাপাশি রাষ্ট্রের কল্যাণ বা জাতির বিকাশের কথাও বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে জাতীয় বিকাশের কোনো পার্থক্য আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজকে নিয়েই জাতি গঠিত হয়। জাতীয় বিকাশের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে করণীয় প্রধান তিনটি বিষয় হল—(i) জাতীয় ঐক্য রক্ষা, (ii) জাতীয় সংকট নিরসন এবং (iii) মানবসম্পদের বিকাশ।

(i) জাতীয় ঐক্য রক্ষা: প্রতিটি রাষ্ট্রেই একাধিক জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট সমাজ আছে। নিয়মকানুন, প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি দিক থেকে সেই সমাজগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। শিক্ষার লক্ষ্য হবে বৈচিত্র্যকে বজায় রেখে সমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও সমগ্র জাতিকে শক্তিশালী করা। সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা—এই দর্শনকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে জাতির বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে। জাতির বিভিন্ন দিক যেমন— অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিকাশের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ ঘটে। জাতি শক্তিশালী হয়। আবার শক্তিশালী জাতি শক্তিশালী ব্যক্তি ও সমাজ সৃষ্টি করে। এইভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির বিকাশ চক্রাকারে ঘটতে থাকে। আবার একটি দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাজের মধ্যে যদি তীব্র রেষারেষি থাকে, মতপার্থক্য থাকে, তাহলে জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমস্ত রেষারেষি ও মতপার্থক্য দূর করে প্রতিটি জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে হবে। এর জন্য চাই শিক্ষা। তাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে জাতির বিকাশ।

(ii) জাতীয় সংকট নিরসন: ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যেমন অনেক সমস্যা দেখা দেয়, তেমনই জাতির জীবনেও অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সমস্যার রূপ, সমাধানের উপায়, সেখানে ব্যক্তির ভূমিকা—এসব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে শিক্ষাই। আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করে জাতীয় সমস্যাসমাধানে প্রয়াসী হই, যার ফলে জাতির বিকাশ অক্ষুণ্ণ থাকে। এইভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতি বিকাশের পথে এগিয়ে চলে।

(iii) মানবসম্পদের বিকাশ: ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66) শিক্ষার উদ্দেশ্য আলোচনাকালে জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সামাজিকভাবে জাতির সমৃদ্ধির জন্য দ্বিমুখী প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই দ্বিমুখী প্রচেষ্টা হল— বস্তুসম্পদ সংগ্রহ করা এবং মানবসম্পদের বিকাশ ঘটানো। কমিশন জাতির বিকাশে বস্তুসম্পদের চেয়ে মানবসম্পদ বিকাশের উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কমিশন বলেছে, বস্তুসম্পদ হল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় আর মানবসম্পদের বিকাশ নিজেই লক্ষ্য। মানবসম্পদের বিকাশ ছাড়া বস্তুসম্পদের প্রয়োজনীয় বিকাশ সম্ভব নয়। এই মানবসম্পদ বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা মানবসম্পদ বিকাশের মাধ্যমে জাতির বিভিন্ন দিকের বিকাশকে সুনিশ্চিত করে তথা জাতীয় বিকাশকে সম্ভব করে তোলে। প্রায় একই কথা 1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, শিক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এক অদ্বিতীয় বিনিয়োগ। জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাকে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

Our Online Class>>
www.online.dascoaching.in

ভারতের জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা (Obstruction in National Development of India)

ভারতের মতো বিশাল দেশে জাতীয় বিকাশের পথে বেশ কিছু বাধা রয়েছে। যেমন—

1. **বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশ:** ভারত বিভিন্ন ধর্মের মানুষের দেশ। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ। এর ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, যা জাতীয় জীবনে অনৈক্য সৃষ্টি করে। নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সময়ে অশান্তির কারণ হয়েছে।
2. **ভাষার ভিন্নতা:** ভাষার ভিন্নতাও জাতীয় বিকাশের অন্তরায়। ভারতে বহু ভাষাভাষী লোকের বাস। মহারাষ্ট্রের ভাষা মারাঠি, তামিলনাড়ুর ভাষা তামিল, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বাংলা ইত্যাদি। প্রত্যেক রাজ্যের ভাষা ভিন্ন হওয়ায় সাধারণ মানুষ অন্য রাজ্যের মানুষের কাছে তাদের মনের ভাব প্রকাশে অসুবিধা বোধ করে। এতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অবচেতন মনে স্বভাবতই একটি বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হলেও ভাষাসমস্যার পুরোপুরি সমাধান করা যায়নি।
3. **জাতিভেদপ্রথা অনুসরণ:** প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে কঠোরভাবে জাতিভেদপ্রথা মেনে চলা হয়। সমাজের উচ্চাসনে রয়েছে ব্রাহ্মণ। তারাই পূজাপাঠ, নিয়মকানুন, বিধান দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে। শূদ্র প্রভৃতি সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষেরা সমাজে অচ্ছুত হিসেবে গণ্য হয়। এর ফলে সমাজব্যবস্থায় বিরাট এক ব্যবধান সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।
4. **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও জনগণের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য জাতীয় বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ধনী ও দরিদ্র এই দুটি শ্রেণির মধ্যে বিভেদ দূর করা খুবই জটিল। তাই অসম অর্থনৈতিক বণ্টন জাতীয় বিকাশের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে।
5. **বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ:** ভারত হল বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশগুলির অন্যতম। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করার অধিকার স্বীকৃত। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে অসহিষ্ণুতা অনেক সময় জাতীয় বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে।
6. **অশিক্ষা:** ভারতের মোট জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ এখনও নিরক্ষর। শিক্ষার আলো থেকে এরা বঞ্চিত। যতদিন না এইসব মানুষের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছোবে ততদিন জাতির সুষম বিকাশ ও উন্নতি সম্ভব নয়।
7. **মূল্যবোধের অভাব:** ভারতে বিভিন্ন কারণে জনগণের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব দেখা দিয়েছে। দুর্নীতি, মিথ্যাচার, দেশের প্রতি ভালোবাসার অভাব প্রভৃতি মূল্যবোধের অভাবেই ফলশ্রুতি। আর এর জন্য দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

8. **সমাজচেতনার অভাব:** সমাজ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে মানুষ স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। নিজেকে নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকছে সে। এতে দেশের ও দশের উন্নতির জন্য সকলে মিলে কাজ করার প্রবণতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আর এর ফলে ভারতে জাতীয় বিকাশ প্রত্যাশানুযায়ী ঘটছে না।
9. **বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব:** বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবে আমাদের দেশের বহু মানুষ আজও অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, যার ফলে প্রতি মুহূর্তেই জাতীয় বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজন জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বাধাগুলি দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

জাতীয় বিকাশকে সুনিশ্চিত করতে শিক্ষার ভূমিকা
(Role of Education in National Development)

শিক্ষা (i) সামাজিক ও জাতীয় সংহতি অর্জনে সহায়তা করবে ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী হবে। (ii) সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশে সাহায্য করবে। (iii) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। (iv) জাতীয় আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে সাহায্য করবে।

শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি (Education and National Integration)

জাতীয়তাবোধ এবং সামাজিক ও জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

1. **জাতীয় শিক্ষানীতি:** নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে (1986) বলা হয়েছে—বৈচিত্র্যময় ভারতে শিক্ষা সেইসব মূল্যবোধকে উৎসাহ দেবে, যেগুলি আমাদের জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহতিবদ্ধ করবে। এ ছাড়া দেশের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা একই ধাঁচের হলে জাতীয় সংহতি দৃঢ় হবে।
2. **পাঠক্রম:** যেসব বিষয়ে সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে সেগুলিকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারতীয় মনীষীদের জীবনী অবশ্য পাঠ্য হবে। বিভিন্ন প্রদেশের রূপকথা, গল্প, কাহিনি ইত্যাদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
3. **পাঠ্যপুস্তক রচনা:** 'আমরা ভারতীয়'—এই অনুভূতি যাতে আমাদের শ্রদ্ধা এবং গর্ববোধের কারণ হয়, সেইভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। জাতীয় সংহতি সংস্থা, জাতীয় পুস্তক পর্ষদ এবং জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ অর্থাৎ যেসব সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

4. **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি:** বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক নাটক, বিভিন্ন রাজ্যের সংগীত, নৃত্য এবং অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে সেইসব রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো যায়।
5. **জনসংযোগ ব্যবস্থা:** টেলিভিশন, রেডিয়ো, সিনেমা ইত্যাদি গণমাধ্যমের সাহায্যে জাতীয়তামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হলে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।
6. **গণতন্ত্রের শিক্ষা:** গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ, গণতান্ত্রিক শিক্ষা কাকে বলে, গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা বলতে কী বোঝায়, কীভাবে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা অনুসরণ করা যায়—এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা যাতে তাত্ত্বিক এর ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
7. **ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা:** স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীকৃত। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মকে বাদ দিয়ে দেওয়া বোঝায় না। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায়, দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার স্বাধীনতা থাকবে। সব ধর্মের মূল বক্তব্য যে একই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তা বোঝাতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা গড়ে তুলতে হবে।
8. **শিক্ষকের ভূমিকা:** শিক্ষকদের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে, তাঁদের আচরণে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠলে তা ছাত্রছাত্রীদেরও প্রভাবিত করবে।
9. **সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা:** জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে প্রতিটি নাগরিককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন শিক্ষার। প্রতিটি নাগরিক যাতে শুধুমাত্র কাগজে কলমে নয়, প্রকৃতই শিক্ষিত হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা এবং সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

শিক্ষা এবং সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66) বলেছে, সমাজে জ্ঞান ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজের দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে।

জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা: কোঠারি কমিশন মনে করেন, শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতি (শিক্ষার সকল স্তরে), শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী শিক্ষা এবং কর্ম-অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। শিক্ষার স্তরে বৃত্তিমুখীনতা প্রয়োজন। কমিশন মনে করেন, শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

জাতীয় আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর হতে সাহায্য করে: শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরের শিক্ষার গবেষণার উন্নতি।

জ্ঞান সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা (Education for Generation, Conservation and Transmission of Knowledge)

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং উন্নত মস্তিষ্ক নিয়ে নিম্নতর প্রাণী থেকে মানুষ সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রাণী হিসাবে পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছে এবং ক্রমশ সভ্য থেকে সভ্যতর হচ্ছে। এই অগ্রগতি কিন্তু সহজ এবং সরলভাবে ঘটেনি, যে প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে এটি সম্ভব হয়েছে তা হল—জ্ঞান সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হচ্ছে।

জ্ঞান সঞ্চয়ন (Generation of Knowledge)

মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়ন হয় দু-ভাবে,

প্রথমত, সুদূর অতীত কাল থেকেই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়, পরবর্তী প্রজন্মও সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সঞ্চালন করে। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ জ্ঞান সঞ্চয়ন করে।

দ্বিতীয়ত, প্রজন্ম বা উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞান সঞ্চয়ন ছাড়া প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষকে নানাবিধ কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছে, আগুন আবিষ্কার করেছে, চাকা আবিষ্কার করেছে, এইভাবে মানুষ ক্রমশ জ্ঞান সঞ্চয়ন করে এগিয়ে চলেছে।

জ্ঞান সংরক্ষণ: জ্ঞান সঞ্চয়নের পরের প্রশ্ন হল জ্ঞান সংরক্ষণ। মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কৌশলের সাহায্য নিয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল প্রথাগত শিক্ষা। প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রম এবং সহপাঠক্রম কার্যাবলির মধ্য দিয়ে জ্ঞান সংরক্ষণ করা হয়। এতদ্‌ব্যতীত প্রথা-বহির্ভূত ও অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষিত হয় যেমন গল্প কথা, লোক নীতি, লোক শিল্প, নাটক, যাত্রা, ভাস্কর্য ইত্যাদি।

এ ছাড়া প্রতিটি সমাজের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য আছে। অভিভাবকগণ প্রত্যক্ষ করেন তাদের সন্তান বা বংশধর তাদের রীতিনীতি, প্রথা, চিন্তাধারা, আদর্শ, মূল্যবোধ এককথায় যাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলা যায় তা অনুসরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবে।

ebook.dascoaching.in

এই প্রসঙ্গে বলা যায় জ্ঞান সঞ্চয় করে তাকে সংরক্ষণ করেই মানুষ তৃপ্ত হয়নি। তার বুদ্ধি, চাহিদা, কৌতূহল সঞ্চিত জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে, একদিন মানুষ পাথর ঘষে আগুন সৃষ্টি করেছে। শুধু আগুন আবিষ্কার সে ক্ষান্ত হয়নি। আগুনকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। এখন যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাপ উৎপাদন করছে, যা সম্ভব হয়েছে জ্ঞানের উন্নয়নের ফলে। এইভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই জ্ঞানের উন্নয়ন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি, পেয়েছে জ্যামিতিক হারে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং অগ্রগতির ফলেই জ্ঞান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, বিশ্বের কোনো স্থানে যদি নতুন জ্ঞান অর্জিত হয় মুহূর্তের মধ্যে তা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সকলেই সেই জ্ঞান সাধ্যমতো অর্জন করতে পারে।

শিক্ষা শুধু জ্ঞান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে না, প্রয়োজনমতো সংস্কার করে তার উন্নতি ঘটানোও শিক্ষার কাজ। ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য গতিশীল সমাজের পক্ষে অন্তরায়। ঐতিহ্যের সীমাবদ্ধতাকে নির্দিষ্ট করে, তার নেতিবাচক দিকগুলিকে পরিহার করে, নতুন আদর্শ ও মূল্যবোধকে পুরোনো আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে সমন্বিত করে ঐতিহ্যের উন্নয়ন ঘটানো শিক্ষার অন্যতম কাজ।

জ্ঞান সঞ্চালন (Transmission of Knowledge)

শিক্ষার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জ্ঞানের সঞ্চালন।

জ্ঞান, সংরক্ষণ, সঞ্চয়ন এবং উন্নয়ন তখনই সার্থক হয় যখন উপযুক্তভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে তা সঞ্চালিত হয়। জ্ঞানের সঞ্চালন না হলে সভ্যতার অগ্রগতি হত না। মানুষ একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকত। ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনের অগ্রগতির ধারণাকে সচল করে রাখতে জ্ঞানের সঞ্চালন অপরিহার্য। শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, শিক্ষোপকরণ এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও ঐতিহ্য সঞ্চালনের কাজটি সম্পন্ন করে। এইভাবেই মানবসভ্যতা অগ্রসর হয়।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বা কাজ হল জ্ঞান সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সঞ্চালন।

শিক্ষার সংস্থা: পরিবার, বিদ্যালয়, কমিউনিটি এবং মাধ্যম (Agency of Education: Home, School, Community and Media)

যে সমস্ত উৎস থেকে শিশুরা শিক্ষা অর্জন করে তাকেই শিক্ষার সংস্থা বলা হয়। প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং কার্যধারা অনুযায়ী শিক্ষার সংস্থাগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

নিম্নে এইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রত্যক্ষ বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্থা এবং অপ্রত্যক্ষ বা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্থা।

যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণে প্রয়াসী হয় তাদের

শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা বলা হয়। যেমন বিদ্যালয় (School), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution), রাষ্ট্র (State), গ্রন্থাগার (Library) ইত্যাদি।

গৃহ-পরিবার (Home and Family)

সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। যে-কোনো সমাজে আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং পুত্র-কন্যাদের লালনপালনের জন্য গৃহ পরিবারের প্রয়োজন। পরিবারই সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠান যার থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। ***Ballard*** বলেছেন, "Family is the original social institution, from which all other institution developed." অর্থাৎ পরিবার হল মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ ঘটে।

শিক্ষাবিদ ***Ramont*** বলেছেন, "The home is the social unit in which spring up these virtues of which sympathy is the common characteristics."

অর্থাৎ সমাজ হল এমন একটি সামাজিক একক যার থেকে বিভিন্ন গুণাবলির বিকাশ ঘটে। এর মধ্যে সহানুভূতি হল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকালে গৃহ-পরিবেশেই শিশুর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করত। বর্তমানে এই দায়িত্ব পরিবার অনেক ক্ষেত্রে পালন না করলেও, বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরিবারের অনেক সদস্যই বিশেষ পেশায় নিযুক্ত, যেমন—চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক ইত্যাদি। যে-কোনো পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য শিশুর অবচেতন মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সামাজিক গুণ (বা সামাজিক ত্রুটি) গৃহের মধ্যেই বিকশিত হয়। শিশুর নৈতিক এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গৃহের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও শিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পালন করে। বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার পূর্বে শিক্ষার দায়িত্ব পরিবারই পালন করে। শিক্ষাবিদগণ সঠিকভাবেই মনে করেন, গৃহই শিশুর প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার আদর্শ স্থান। এর কারণ হল—

1. গৃহ হল এমন এক সংস্থা যেখানে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দুটি ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক খুব সহজ ও স্বাভাবিক। শিশু, পিতা-মাতার সঙ্গে থাকতে থাকতে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সহজে শিখতে পারে। বর্তমানে প্রথাগত শিক্ষা পরিবারের এই ভূমিকার প্রতি যথেষ্ট আস্থা রাখে।
2. শৈশব হল অভ্যাস গঠনের সময়। এই বয়সে শিশুর মন অনেক নমনীয় থাকে। তাই অনেক কিছু তাকে সহজে শেখানো সম্ভব। পাশাপাশি অভিজ্ঞতা কম থাকায় তাকে সহজেই শেখানো যায়। তাই গৃহ হল শিক্ষা অর্জনের আদর্শ স্থান।

3. বিভিন্ন কারণে যে সব শিশুদের বেশি দূর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয় তখন তার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পিতা বা অভিভাবকই বৃত্তিমূলক শিক্ষার্জনের ব্যবস্থা করে। যেমন, একজন কৃষক তার পুত্রকে কৃষির কাজ শেখায় এবং মা কন্যাকে গৃহ-পরিচালনা বা সন্তানদের কীভাবে মানুষ করতে হয় শেখায়।
4. গৃহ ও পরিবারের মধ্যেই শিশুর ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ঘটে। শিশু পরিবারের অন্যান্য বয়স্কদের সঙ্গে নানারকমের সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে। তখন শিশু সেই সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করে এবং অনুকরণ করে। ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা সে কাজে প্রয়োগ করে।
5. পরিবারের মাধ্যমে সমাজজীবনের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। পরিবারের মধ্যে যে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয় শিশুও সেই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সে ভবিষ্যতে একই সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে এবং অংশগ্রহণ করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই মন্তব্য করতে পারি যে, গৃহ ও পরিবার শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শিশু নতুন পরিবেশ অর্থাৎ বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই পরিবেশেই সে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার আচরণে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। তবে সেখানেও শিশু গৃহ-পরিবেশে যা শিখেছে তার প্রভাব পড়ে। শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা-দার্শনিক ***জর্জ হার্বার্ট (George Harbert)*** বলেছেন—'One good mother is Worth a hundred school master'. অর্থাৎ একজন উপযুক্ত মা শত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সমান। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু তাঁর 'Creative Unity'-তে বলেছেন, "The permanent significance of home is not in the narrowness of enclosure, but in an eternal moral idea." অর্থাৎ গৃহ-পরিবেশ সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এর একটা স্থায়ী আদর্শ আছে।

শিশুশিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা (Role of Family in Child Education)

পরিবার হল সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান, এর থেকেই অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। মানবসমাজে এটি হল প্রাচীনতম শিক্ষালয়। অন্য কোনো সামাজিক সংস্থা পরিবারের মতো এমন আন্তরিক হয় না, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে শিশু গভীর স্নেহের সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে।

পরিবারের মধ্যে থেকেই শিশুর প্রাথমিক অভ্যাসগুলি গড়ে ওঠে। যে-কোনো বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান শিশু পরিবার থেকেই পায়। সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক শিক্ষার সূচনা পরিবারেই হয়। সেই কারণে পরিবার হল শিশুর শিক্ষা এবং জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সহায়ক পরিবারের সাধারণ ও শিক্ষামূলক কার্যাবলি নীচে আলোচনা করা হল।

পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি

1. দৈহিক নিরাপত্তা দান: পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তার সদস্যদের দৈহিক নিরাপত্তা দেওয়া। শিশু পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর কোনো-না-কোনো পরিবারে আশ্রয় পায়। পরিবারের বাইরে শিশু অসহায়, দুর্বল ও অক্ষম। পরিবার হল শিশুর অস্তিত্ব রক্ষার নিরাপদ আশ্রয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুর নিরাপত্তার জন্যই পরিবার সৃষ্টি হয়েছে।

2. জৈবিক চাহিদা নিবারণ: পরিবারের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তার সদস্যদের বিভিন্ন জৈবিক চাহিদা পূরণ করা। সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান, বিশ্রাম ও সক্রিয়তার চাহিদা পূরণ এবং যুবক-যুবতিদের বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপনের ব্যাপারে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

3. সামাজিকীকরণে সহায়তা: শিশুর সামাজিকীকরণের হাতেখড়ি হয় পরিবারে। শিশু পরিবারের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেয়। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মধ্যে থেকেই তার সামাজিকীকরণ হতে থাকে।

4. উৎপাদনশীল ক্রিয়ায় সহায়তা: সমাজে বেঁচে থাকার জন্য পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য প্রয়োজন হয়। ওই সব ভোগ্যপণ্য পরিবারের কোনো-না-কোনো সদস্য উৎপাদন করে বা কিনে আনে, যা পরিবারের অন্য সব সদস্য ব্যবহার করে। কোনো বস্তুর উৎপাদন বন্ধ থাকলে বা কেনা সম্ভব না হলে সেই বস্তুটির চাহিদা বেড়ে যায়। যার ফলে সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের বিপর্যয় দেখা দেয়। তাই পরিবারের সুস্থির অবস্থা বজায় রাখার জন্য উৎপাদনশীল কাজে সাহায্য করা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

5. সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বণ্টন: পরিবারের আর-একটি মূল্যবান কাজ হল, পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনবোধে পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বা সদস্যদের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া। বংশপরম্পরায় এক-একটি পরিবার পিছু সম্পত্তি পেয়ে থাকে। সেই সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা যথাযথ না হলে পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। সেই কারণে পরিবারে প্রয়োজনমতো সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বণ্টন প্রয়োজন।

6. অন্তরঙ্গতা বজায় রাখা: পরিবারে সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক টান যত বেশি হবে সেই পরিবার তত বেশি সুখী হবে।

পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলি

1. **সামাজিক আচরণের শিক্ষা:** পরিবার শিশুকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচার-আচরণের শিক্ষা দেয়। শিশু আচার-আচরণ শিখে পৃথিবীতে আসে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করতে করতে শিশু বিভিন্ন আচার-আচরণ শিখে ফেলে।

2. **সংস্কৃতির শিক্ষা:** পরিবার শিশুর সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে সহায়তা করে। পরিবারই শিশুর মধ্যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। ফলে শিশুর মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির বোধ জাগ্রত হয়।
3. **সু-অভ্যাস গঠনের শিক্ষা:** পরিবার শিশুকে বিভিন্ন ধরনের সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে শেখায়। ওই সু-অভ্যাসগুলিই পরবর্তীকালে শিশুকে সুনাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।
4. **প্রাক্ষোভিক বিকাশের শিক্ষা:** পরিবার শিশুর প্রক্ষোভগুলিকে যথাযথভাবে বিকশিত হতে সাহায্য করে। সংযত প্রাক্ষোভিক আচরণের শিক্ষা শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়ে ওঠে।
5. **জ্ঞানার্জনের শিক্ষা:** পরিবার শিশুকে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে। জ্ঞানার্জনের শিক্ষা তাই প্রকৃতপক্ষে পরিবারেই শুরু হয়।
6. **ঐতিহ্য সংরক্ষণের শিক্ষা:** পরিবার শিশুকে সামাজিক ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচিত করে এবং সেই ঐতিহ্য সংরক্ষণের শিক্ষা দেয়। পরিবার ওই শিক্ষাদান না করলে, বহু ক্ষেত্রেই শিশুরা ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়।
7. **বৃত্তিশিক্ষা:** শিশুর বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আজও বহু পরিবারে ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকানির্বাহ করে।
8. **আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা:** শিশু কোনো আধ্যাত্মিক চেতনা অথবা ভালোমন্দের বোধ নিয়ে জন্মায় না। পরিবারই শিশুর মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। শিশু নিজের অজান্তেই তার পরিবারের আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করে থাকে।
9. **মূল্যবোধের শিক্ষা:** শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার পরিবার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন কাজ ও আচার-আচরণের মধ্যে দিয়েই শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক বোধ গঠনে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার সঠিকভাবে এই কাজগুলি করতে না পারলে, শিশুর যথাযথ বিকাশ ব্যাহত হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবারের সীমাবদ্ধতা

শিশুর শিক্ষায় পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পরিবারের কয়েকটি সীমাবদ্ধতাও থাকে। বর্তমানে আর্থসামাজিক কারণে যৌথ পরিবার প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এর ফলে পরিবারের শিক্ষামূলক ভূমিকায় নানা সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। নীচে কয়েকটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হল—

1. পরিবারের আকার: যৌথ পরিবার লোপ পাওয়ার ফলে বর্তমান পরিবারের আকার ছোটো হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সদস্যরা লৌকিকতা, সামাজিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ছে। ফলে পরিবার তার শিক্ষামূলক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

2. পরিবারের কার্য পরিসরের সীমাবদ্ধতা: আগে যখন যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পরিবার তার সদস্যদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করত। বিশেষ করে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা পরিবার নিজেই করত। কিন্তু সমাজের বিবর্তনের ফলে পরিবারের পাশাপাশি বহু সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেখানে আদবকায়দা, আচার-আচরণ, কথা বলার ভঙ্গি, কার সঙ্গে কোন্ কথা কেমনভাবে বলতে হয়, কেমন করে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে হয়, কেমন করে সাজতে হয়—সবই শেখানো হচ্ছে। ফলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আজ আর পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

3. সময়োপযোগী চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আজকের পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে আজকের পরিবার বারেবারে নানা অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে। নিত্যনতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনে বহু বৈচিত্র্য আনছে। শিশুদের চাহিদাও দিনে দিনে বাড়ছে। অন্যদিকে পরিবার ওই চাহিদাগুলি সবসময় পূরণ করতে পারছে না। ফলে শিশুদের কাছে পরিবারের শিক্ষামূলক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রটিও সীমিত হয়ে আসছে।

4. নিরক্ষরতাজনিত সমস্যা: আর্থিক বা অন্য বিভিন্ন কারণে আজও আমাদের দেশের বহু পরিবারে শিক্ষার আলো পৌঁছোয়নি। স্বাধীনতার এত বছর পরেও এদেশে নিরক্ষরদের তালিকা উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ, যা ভাবিয়ে তুলেছে রাষ্ট্রের শিক্ষিত সমাজকে। নিরক্ষরতার সমস্যাটি পরিবারের শিক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতা।

5. শিক্ষার বহুমুখিতা: আধুনিক যুগে শিক্ষায় এত বৈচিত্র্য এসেছে যে, কোনো পরিবারের পক্ষে এত ধরনের শিক্ষা শিশুদের দেওয়া সম্ভব নয়, পরিবার যতই শিক্ষিত হোক না কেন শিশুকে সব ধরনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা ধারণার শিক্ষা দিতে পারে না। সুতরাং বলা যেতে পারে, আধুনিক যুগের শিক্ষার বৈচিত্র্য বা বহুমুখিনতা পরিবারের শিক্ষামূলক ভূমিকার ক্ষেত্রে আর-একটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা।

6. নিরাপত্তাজনিত সমস্যা: পরিবারের শিক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রে আর-একটি সীমাবদ্ধতা হল নিরাপত্তাজনিত সমস্যা। ছোটো পরিবার শিশুকে সবসময়ে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বাবা এবং মা উভয়েই চাকরি করার জন্য বাড়ির বাইরে চলে যান। শিশুর নিরাপত্তার জন্য কোনো 'ক্রেশে' তাকে ভরতি করে দেওয়া হয়। শিশুর সারাদিনের অনেকটা সময় ক্রেশেই কেটে যায়। এই অবস্থায় শিশুকে সবরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর শিশুর ক্ষেত্রে যেহেতু সবচেয়ে দরকারি হল নিরাপত্তা, তাই সেটি বিঘ্নিত হলে পরিবারের অন্যান্য ভূমিকা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, যৌথ পরিবার ভেঙে পরিবার ছোটো হওয়ার ফলে এবং ক্রম পরিবর্তনশীল যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারায় পরিবারের কাছ থেকে শিশুরা নৈতিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, দৈহিক নিরাপত্তা প্রভৃতি পাচ্ছে না।

বিদ্যালয় (School)

মানবসভ্যতার ঊষালগ্নে কোনো সমাজব্যবস্থা ছিল না। ছিল না কোনো সামাজিক সংগঠন। প্রতিটি ব্যক্তিই জৈবিক চাহিদা যেমন খাদ্য সংগ্রহ, আশ্রয় এবং নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকত। ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং অপরের অনুকরণ নিয়েই যা কিছু করণীয় তা করত। পরে তার সন্তান-সন্ততিদের তার অর্জিত কৌশলগুলি শিক্ষা দিত। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিই নিজ নিজ পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ক্রমশ তারা বুঝতে পারল এককভাবে বাস করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যপশু থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি পাশাপাশি অবস্থানকারী অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা যায় তাহলে সকলেরই ভালো হয় এবং আরও উন্নত উপায়ে জৈবিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করা সহজ হয়। এইভাবে সমাজ বা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এরপর তারা অনুভব করল যে, তাদের অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনকেই বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য গড়ে উঠল এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা পরবর্তী সময়ে 'School' বলে পরিচিত হয়।

ইংরেজি ভাষায় 'School' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে লাতিন ভাষা 'Skholi' থেকে। যার অর্থ হল বিনোদনের সময় নানা আলোচনা করা। পরে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল বা বিদ্যালয় আর অবসর বিনোদনের তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এখন School বা বিদ্যালয় বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নির্দিষ্ট জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চালিত করা।

প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষাবিদ ক্যাঠার গুডের শিক্ষা অভিধানে স্কুল-এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে—"School is an Organized group of people pursuing defined studies at defined levels and receiving constructions from one and more teachers frequently with the addition of other employees such as principals, various supervisors of institution and a staff of maintenance workers usually housed in a simple building or group of buildings." অর্থাৎ বিদ্যালয় হল একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে এক বা একাধিক শিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়ে, নির্দিষ্ট গৃহে বা গৃহগুলিতে শিক্ষাদান করা। সাধারণত, শিক্ষক ছাড়াও এখানে অন্যান্য ব্যক্তি সকলও অবস্থান করে। যেমন, অধ্যক্ষ, পাঠদান তত্ত্বাবধানের জন্য 'সুপারভাইসার' এবং বিদ্যালয় রক্ষণকারী কর্মীবৃন্দ।

অতীতে যখন অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল শিক্ষার একমাত্র উপায় তখন শিক্ষার এই উপাদানটির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তখন গৃহ-পরিবেশ বা প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শিখত এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের জটিলতা এবং সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়। গৃহ-পরিবেশ এই চাহিদা পূরণের

পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষার জন্য এক আদর্শ শিক্ষামূলক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই সংগঠিত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়ে থাকে যাকে শিক্ষালয় বলে। এখানে থাকবে শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, কর্মশালা, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ইত্যাদি সহ গৃহ এবং থাকবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠক্রম এবং শিক্ষার উপকরণ। এইসব সমন্বয়যুক্ত শিক্ষালয়কেই বিদ্যালয় বলে। এই বিদ্যালয় হবে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কেবলমাত্র বিদ্যালয় নয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সবরকম প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যমকেই শিক্ষালয় বলে। শিক্ষালয় হল প্রথাগত শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

বিদ্যালয়ের কাজ (Functions of School)

বিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সমাজের প্রয়োজনেই বিদ্যালয়ের জন্ম। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গঠিত, তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের কাজ হল ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করা। চাহিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর পরিবর্তনশীলতা। তাই দেখা যায়, দেশ ও কালভেদে বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। দেশ, কাল ও পরিস্থিতি ভেদে বিদ্যালয়ের কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু কাজ আছে যা সব দেশে ও সব কালেই বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হয়। এইসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

1. ***বৌদ্ধিক শিক্ষাদান (Intellectual Development)***—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করাতে হবে। জ্ঞানের আয়ত্তীকরণে তাকে সাহায্য করতে হবে। একমাত্র অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়সূচি পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত করা সম্ভব। এই কাজটি বিদ্যালয়কেই সুসম্পন্ন করতে হয়।
2. ***ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন (Development of Personality)***—জন্মগত সূত্রে ব্যক্তি কিছু সম্ভাবনা নিয়ে আসে। সেই সম্ভাবনাসমূহ পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিশুর পরিবেশ রচনা করে তার গৃহ ও পরিবার। শিশু যখন বিদ্যালয়ে ভরতি হয় তখন পরিবেশ রচনা করার বেশ কিছু দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করতে হয়। বিদ্যালয় বিভিন্ন পাঠ্যসূচি এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনা করে।
3. ***সামাজিকীকরণ (Socialisation)***—প্রত্যেক সমাজেরই কিছু রীতিনীতি, প্রথা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি আছে। সমাজ প্রত্যাশা করে তার সদস্যরা সেইসব অনুসরণ করুক এবং পরবর্তী বংশধারার মধ্যে সঞ্চালিত করুক যাতে

সমাজ আরও শক্তিশালী হয়। একেই সামাজিকীকরণ বলে। এই সমাজিকীকরণের একটা বড়ো দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ করে। বিদ্যালয় তার নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করে।

4. ***অতীত অভিজ্ঞতা বা কৃষ্টি বা ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন (Preservation and Transmission of Past Experience or Cultural Heritage)***—মানুষের সভ্যতার ইতিহাস হল তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অতীত অভিজ্ঞতা ব্যক্তি গ্রহণ করে, সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়। এই কাজে বিদ্যালয় সাহায্য করে। এই সংরক্ষণ পুথির মাধ্যমে, বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে বা শিক্ষকদের আচরণের মাধ্যমেও হতে পারে। সংরক্ষণের পর আসে সঞ্চালন। বিদ্যালয় শুধু অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ অর্থাৎ ধারক হবে না। তাকে বাহক হতে হবে। অভিজ্ঞতাসমূহ পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়াও বিদ্যালয়ের কাজ। বিদ্যালয় আমাদের নিকট যুগ-যুগ ব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তুলে দিয়েছে। অভিজ্ঞতাগুলি সংরক্ষণ করতে সাহায্য করেছে। অবশেষে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট তুলে দিতে সাহায্য করেছে। এইভাবে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং সভ্যতা এগিয়ে চলছে।
5. ***অতীত অভিজ্ঞতা বা কৃষ্টি বা ঐতিহ্যের উন্নয়ন (Development of Past Experience or Cultural Heritage)***—বিদ্যালয়ের কাজ কেবলমাত্র গতানুগতিকভাবে কৃষ্টি বা ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চালনে সীমাবদ্ধ নয়। পুরাতন কৃষ্টিকে পুনর্গঠিত করা, নতুন কিছু যুক্ত করে কৃষ্টিকে আরও সমৃদ্ধ করাও বিদ্যালয়ের কাজ। এইভাবে ক্রমাগত কৃষ্টি উন্নয়নের ফলেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে।
6. ***গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ (Development of Democratic Ideals)***—বিদ্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। অপরের কথা ধৈর্য ধরে শোনা। সহযোগিতা, দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক চেতনার বৈশিষ্ট্য। বিদ্যালয় তার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের এইগুলি অনুশীলন করানোর ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাজের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক চরিত্র বর্তমান তাও শিক্ষার্থীরা লক্ষ করে এবং বিদ্যালয় ও গণতন্ত্র উভয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থা বৃদ্ধি পায়।
7. ***নির্দেশনা (Guidance)***—আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের নির্দেশদান কাজের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর জন্য নির্দেশনা বিভাগ খোলারও সুপারিশ করা হয়েছে। বিদ্যালয়কে শিক্ষা, বৃত্তি ও ব্যক্তিগত এই তিন ধরনের নির্দেশনার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষা ও বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক, কোন্ ধরনের বৃত্তির জন্য কী ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন, বর্তমান বৃত্তির বাজার কীরকম ইত্যাদি

সম্পর্কে তথ্য শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যাগুলি যথাযথভাবে সমাধান না হলে শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই জটিলতা সৃষ্টি হয় না, তার প্রভাব ব্যক্তিজীবনেও দেখা যায়। একইভাবে ব্যক্তিগত নানা সমস্যা শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকেও প্রভাবিত করে। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনমতো নির্দেশনার সুযোগ পায় সে ব্যাপারে বিদ্যালয়ের নির্দেশনা বিভাগকে সচেতন থাকতে হবে।

8. ***মূল্যায়ন (Evaluation)***—শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ। কেবলমাত্র পুথিগত জ্ঞান অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিক্ষার্থীর দৈহিক, নৈতিক, চারিত্রিক বিকাশের প্রতিও নজর দিতে হবে। তাই সারা বছর গুটিকতক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই মূল্যায়নের কাজ শেষ হয় না। শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার আচার-আচরণ লক্ষ করতে হবে। নজর রাখতে হবে তার মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণ দেখা যাচ্ছে কিনা। অবাঞ্ছিত বা অসামাজিক আচরণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এইসব বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে তার সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে এবং তথ্যগুলিকে সর্বাত্মক বিবরণীপত্রে সংরক্ষিত করতে হবে। বিদ্যালয় থেকে চলে যাওয়ার সময় সর্বাত্মক বিবরণীপত্র শিক্ষার্থীকে দিয়ে দিতে হবে। এ সবই বিদ্যালয়ের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

উপরে আলোচিত কার্যাবলি ছাড়াও বর্তমান শিক্ষাবিদগণ বিদ্যালয়ের আরও কিছু দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

1. ***সম্পূরক কাজ (Supporting Learning Work)***—বিদ্যালয় ছাড়াও শিক্ষার আরও অনেক সংস্থা আছে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ পায়; যেমন—পরিবার, সংগঠন, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি। অনেক সময়ই এইসব সংস্থাগুলি নানা কারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এই ঘাটতি পূরণে বিদ্যালয় এগিয়ে আসে।
2. ***সংশোধনমূলক কাজ (The Corrective Function)***—শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে সাধারণত 4 থেকে 5 ঘণ্টা থাকে। অবশিষ্ট সময়ে সে বিদ্যালয়ের বাইরে কাটায়। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন পরিস্থিতি, বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়া ঘটে। মিথস্ক্রিয়ার ফল যে সবসময় বাঞ্ছিত হয় তা নয়। অনেক সময়ই অবাঞ্ছিত, অসামাজিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয়। সমাজ প্রত্যাশা করে এইসব আচরণ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত করা, কুসংস্কার দূর করা ইত্যাদির দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ করবে। তাই বিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হল শিক্ষার্থীর আচরণ সংশোধন করা।

3. ***প্রতিরোধকমূলক কাজ (The Preventive Function)***—কথায় বলে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো। অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিদ্যালয়েও এই নীতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অবাঞ্ছিত আচরণ না দেখা দেয় তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করা উচিত। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময়ে নানা রকম সমস্যা দেখা যায়, যার প্রভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরেও পড়ে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে মানসিক ও প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীর কোনো রকম সচেতনতা না থাকায় সে সংগতিবিধানে অসমর্থ হয়। যার ফলে সমস্যা দেখা দেয়। শিক্ষক যদি প্রাক্-বয়ঃসন্ধিক্ষণে শিক্ষার্থীদের এই পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন এবং এই সময় কী করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করেন তাহলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সংগতিবিধান অনেক সহজ হয়ে ওঠে। সমস্যার মোকাবিলায় শিক্ষার্থী সক্ষম হয়ে ওঠে।
4. ***সমন্বয়মূলক কাজ (The Integrated Function)***—বিদ্যালয় ছাড়াও শিক্ষার্থীকে নানারকম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে হয়, যার ফলে সে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতাগুলি যে সর্বদা একে অপরের পরিপূরক হবে তা নয়। অনেক সময় পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। শিক্ষার্থীর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন। বিদ্যালয়কেই এই সমন্বয়ের দায়িত্ব নিতে হয়।

সামুদায়িক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা
(Role of School in Maintaining the Relationship with Community)

বিদ্যালয়কে পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সামুদায়িক জীবনযাপনের সঙ্গে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কীভাবে এটা সম্পন্ন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হল।

1. ***দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষা***—সমাজের সভ্য হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তির কিছু দায়দায়িত্ব আছে। এইসব দায়দায়িত্ব সম্পর্কে শিশু বয়স থেকেই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং দায়দায়িত্ব কীভাবে পালন করা যায় সে সম্পর্কে শিশুর বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্যাবলি শিশুকে অবহিত করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়ে (যেমন শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করা, শাসনশৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি) এগুলি বিকাশ করা যেতে পারে।

ebook.dascoaching.in

2. *গণতন্ত্রের শিক্ষা*—ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতীয় সংবিধানে একজন নাগরিকের কী কী অধিকার এবং দায়িত্ব আছে তা সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশু বয়স থেকেই একজন গণতান্ত্রিক নাগরিকের কী কী অধিকার এবং দায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়েই এই দায়িত্ব যাতে সার্থকভাবে পালন করা যায় সে ব্যাপারে বিদ্যালয়কে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে।
3. *ন্যায়বোধের শিক্ষা*—সমষ্টিগত কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ তা বুঝতে পারে অর্থাৎ তাদের মধ্যে ন্যায়বোধের উন্মেষ ঘটে। এইভাবে বিদ্যালয়ে সামাজিক কাজের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যায়বোধের বিকাশ ঘটে।
4. *চারিত্রিক বিকাশ*—সকল ছাত্রদেরকে নিয়ে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস এবং বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিবস পালন করা ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশকে উৎসাহিত করা যায়। মনীষীগণের নিষ্ঠা, ধৈর্য, অন্যায়ের প্রতিবাদ, সকলকে সাহায্য করার প্রবণতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে।

   বিদ্যালয়ের কর্মসূচি ছাড়াও সমাজের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ব্যক্তি বা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ এবং পরিচয় গড়ে ওঠে। এই কর্মসূচিগুলির উল্লেখযোগ্য হল—(ক) বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী অঞ্চল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, (খ) বিভিন্ন দূষণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, (গ) নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষর করা, (ঘ) বিভিন্ন রকম কুসংস্কার দূর করা, (ঙ) বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা প্রভৃতি। এইসব ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়কে মুখ্য ভূমিকা এবং উদ্যোগ নিতে হবে।
5. *জাতীয় সংহতির শিক্ষা*—বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীরা ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্বিশেষে সকলেই একসঙ্গে পঠনপাঠন করে ও যাবতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সকলের মধ্যেই পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ ঘটে। ধর্ম, বর্ণ ও জাতির মধ্যে বিভেদ থাকে না অর্থাৎ জাতীয় সংহতির শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়।
6. *বৌদ্ধিক শিক্ষা*—বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। যেমন, কোনো সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বিতর্ক বা তাৎক্ষণিক বক্তৃতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার পূর্বে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত নতুন জ্ঞান, চিন্তন, মনন, যুক্তিকরণ ইত্যাদি মানসিক

গুণাবলির অনুশীলন করা প্রয়োজন। যার ফলে বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ও সামগ্রিকভাবে বুদ্ধির বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

7. *শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ*—সমষ্টিগত কাজ করার সময় অনেক সময় কায়িক শ্রমের প্রয়োজন। এর ফলে একদিকে যেমন শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে অন্যদিকে কোনো কাজ বা শ্রমকেই নিম্নচোখে দেখে না। শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই ঝাড়া-মোছা করতে হয়। এইভাবে কাজ করার ফলে কোনো কাজই ছোটো করে দেখা হয় না। বুনিয়াদি শিক্ষায় এই কর্মসূচিটির উপর আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করা হয়।

গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Home and School)

কোনো বিদ্যালয়ই গৃহের সহযোগিতা ব্যতীত সার্থকভাবে শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান অনেক জটিল হয়েছে। গৃহের পক্ষে এককভাবে জটিল জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে চলতে অসুবিধা হয়। একইভাবে বিদ্যালয়ের পক্ষে এককভাবে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়, যদি না গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সঠিক সমন্বয় হয়। এ প্রসঙ্গে ***Brown*** বলেছেন, শিক্ষালয়কে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এখন দেখা যাক কীভাবে বিদ্যালয় ও গৃহ পরিবেশের সঙ্গে উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

প্রথমত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শিশুর পরিবারের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা-সম্পর্কে জানতে হবে এবং তদনুযায়ী শিক্ষাদানের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের কাজ হবে শিশুদের মধ্যে পরিবারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করা।

তৃতীয়ত, পরিবারের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সহযোগিতা স্থাপন করা।

শিক্ষকের ভূমিকা বা শিক্ষকের কাজ (Role of a Teacher)

প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা ছিল মুখ্য। শিক্ষার কেন্দ্রে ছিলেন শিক্ষক। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক হলেও শিক্ষকের ভূমিকা কোনো অংশে হ্রাস তো পায়নি বরং বিস্তৃত এবং জটিল হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষকের বহুবিধ ভূমিকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হল।

ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষকের ভূমিকা (Teacher as a Person)

অতীতের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমরা জানতে পারি, শিক্ষক ছিলেন সর্বেসর্বা। তিনি ছাত্রদের উপর সব কিছু চাপিয়ে দিতেন। তাঁর নির্দেশমতো ছাত্রদের চলতে হত। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার অবকাশ ছিল না। শিক্ষকের ভূমিকা ছিল কিছুটা স্বেচ্ছাচারী।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষক এখন শিক্ষার্থীর বন্ধু, পথ-প্রদর্শক ও পরামর্শদাতা। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোনো চাপ সৃষ্টি করবেন না। তিনি অনুকরণযোগ্য হবেন। শিক্ষক 'রোল মডেল' হিসাবে কাজ করবেন। শিক্ষার্থীর প্রবণতা হল শিক্ষককে অনুকরণ করা। শিক্ষক সম্পর্কে শিশুর একটা 'ইমেজ' তৈরি হয়। সেই 'ইমেজ' অনুযায়ী শিক্ষককে আচরণ করতে হবে। শিক্ষক যেন শিক্ষার্থীর নিকট ভয়ের পাত্র না হন। তিনি শিক্ষার্থীর নিকট আনন্দের বার্তা নিয়ে আসেন। শিক্ষক যে শুধু একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হবেন তাই নয়। তাঁকে সময়নিষ্ঠ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। হতাশা তাঁর মধ্যে যেন না থাকে। তিনি আনন্দের প্রতীক হবেন।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতদিন শিশু গৃহ ও পরিবারে পিতা-মাতার স্নেহছায়ায় বড়ো হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সে বিদ্যালয়ে এসেছে। বিভিন্ন আর্থসামাজিক পরিবেশ থেকে অন্যান্য শিশু তার সহপাঠী হয়ে এসেছে। হঠাৎ এই পরিবর্তনকে সে মানিয়ে নিতে পারে না। তার মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। সে চায় পিতা-মাতার মতো শিক্ষক-শিক্ষিকাও তাকে ভালোবাসুক, আদর করুক, নিরাপত্তা দিক। শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে শিক্ষক মর্যাদা দেবেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবোধ ও বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্য গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক সমাজের নিয়ম-নীতি, বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করবেন। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার প্রবণতা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, মেজাজ হারিয়ে না ফেলা প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক নিজে সেই মতো আচরণ করবেন।

বিদ্যালয়ের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা (Limitations of School)

আদর্শগতভাবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করার কথা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত ত্রুটির জন্য বিদ্যালয় সব সময় সেই দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিগুলি হল—

1. সামাজিক বিকাশে অসম্পূর্ণতা: বিদ্যালয়ের একটি সমাজকেন্দ্রিক দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা। কিন্তু শিশু-শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ সামাজিক বিকাশ বিদ্যালয়ে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশ। তা ছাড়া শিশুরা যে পারিবারিক পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে সেই পরিবেশের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরিবেশের বিস্তর পার্থক্য। তাই তত্ত্বগত বক্তব্য যাই হোক না কেন, বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ পরিবেশে ও সংক্ষিপ্ত সময়ে শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ বাস্তবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

2. ব্যয়বহুল শিক্ষা: বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই বহু শিক্ষার্থী দারিদ্র্যের কারণে এই শিক্ষার অংশ নিতে পারে না। অনেকে ভরতি হয়েও মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

3. যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি: বিদ্যালয়ের পুথিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে সমাজজীবনের সঙ্গে ঠিকমতো যুক্ত করতে পারে না। পাঠক্রমের অতিরিক্ত বোঝা এবং একঘেয়ে যান্ত্রিক শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষার্থীকে আনন্দ তো দেয়ই না, বরং বিদ্যালয়ের প্রতি নিরুৎসাহী করে তোলে।

4. পরীক্ষার নম্বর-নির্ভর শিক্ষা: শিক্ষার অর্থ হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের উপর এমনই চাপ সৃষ্টি করে যে, শিক্ষার্থী হাঁপিয়ে ওঠে। তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থী কেবল পরীক্ষার নম্বর নিয়েই চিন্তা করে। ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক অবহেলিত হয়।

5. ব্যক্তিগত বৈষম্য বিবেচিত হয় না: বিদ্যালয়ের কোনো শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। সব শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি, সামর্থ্য, আকাঙ্ক্ষা, প্রক্ষোভ একই ধরনের হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষার্থীরা বেশি উপকৃত হয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তিবৈষম্যের নীতিটি অনুসৃত হয় না। ফলে সব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শ্রেণিশিক্ষণে সন্তুষ্ট হতে পারে না।

6. নির্দিষ্ট সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির অভাব: বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, যার নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপরেও পড়ে।

7. বিদ্যালয়ের স্বল্পতা: প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয় না। ফলে এক-একটি বিদ্যালয়ের উপর অত্যধিক ছাত্রছাত্রীর চাপ অনেকসময় পড়াশোনার সুস্থ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

8. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব: সার্থক এবং কার্যকরী শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব লক্ষ করা যায়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে দেশ, সমাজ ও গোষ্ঠীর পক্ষে বিদ্যালয় অপরিহার্য হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক চিন্তাভাবনা চলছে।

পরোক্ষ বা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্থা (Informal Agency of Education)

শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থাগুলি ছাড়া যে যে উৎস থেকে শিশু বা ব্যক্তিসকল শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেইগুলিই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্থা, এইগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল:

1. গৃহ পরিবার (Home Family) 2. কমিউনিটি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Community or Social Institution) 3. মাধ্যম (Media)। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

শিক্ষা সংস্থা হিসাবে কমিউনিটি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান
(Community or Social Institution as Agency of Education)

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমগুলির মধ্যে ব্যাপকতা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে পরিবারের পরেই স্থান দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে। কারণ ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের শিক্ষা, রুচি, মনোভাব, আদর্শবোধ, জীবনধারা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ক্রিয়া পরিচালনায় অংশ নিচ্ছে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ (Types of Social Institutions)

যে প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে সমাজের কার্যকরী সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে, তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে। বর্তমানে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। এইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

1. খেলাধুলাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান: বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা সেখান থেকে তাদের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। তাই তারা খেলাধুলাসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, টেবিল টেনিস ক্লাব, ক্যারাম ক্লাব ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত স্থানীয় ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার চাহিদা মেটানোর জন্য সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। বর্তমানে সরকারও এগুলির জন্য কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

2. সাহিত্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান: সাহিত্যানুরাগী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের বাইরে সাহিত্যচর্চার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়। এরা সপ্তাহে বা মাসে একটি করে দেওয়াল পত্রিকা বের করে নিজেদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। এইসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থাও করে। বছরে এক-দুবার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের ওই প্রতিষ্ঠানে এনে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন বয়সের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

3. বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিষ্ঠান: বিজ্ঞানে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। বর্তমানে ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও পাড়ায় পাড়ায় পরিবেশ রক্ষার জন্য 'ইকো ক্লাব' গড়ে তুলতে কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা, মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তোলা, পরিবেশ রক্ষা

করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞান প্রদর্শনী, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে।

4. ব্যায়াম ও শরীরচর্চার প্রতিষ্ঠান: বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যায়াম ও শরীরচর্চার জন্যও বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ছেলেমেয়েদের সুস্বাস্থ্য গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মেদহীন সুঠাম দেহগঠনের জন্য বহু ছেলেমেয়ে এ ধরনের ক্লাব বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানে কুস্তি, ক্যারাটে প্রভৃতি শেখানোরও ব্যবস্থা থাকে।

5. অভিনয়, নৃত্য ও সংগীতচর্চার প্রতিষ্ঠান: যেসব ছেলেমেয়ে অভিনয়, নাচ বা গানে বিশেষভাবে আগ্রহী, তারা এই ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের অভিনয়, নৃত্য বা সংগীত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তারা মানসিক দিক থেকে তৃপ্তিলাভ করে। কেউ কেউ অভিনয়, নৃত্য বা সংগীতে বিশেষ দক্ষতা লাভের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

6. যুব প্রতিষ্ঠান: যুব প্রতিষ্ঠান হল বর্তমান শতাব্দীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যুব অধিবেশন, যুব সম্মেলন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ব্রতচারী, স্কাউটিং, জুডো ও ক্যারাটে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি পরিচালনা করে। যুবসংগঠনের মাধ্যমেই সমাজের প্রকৃত সংস্কার ও উন্নয়ন সম্ভব। বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে যুবসমাজকে সচেতন করতে পারলে আগামী দিনে তারা সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারবে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক কাজ

আধুনিক শিক্ষায় বলা হয়েছে যে, শিক্ষা কেবল কিছু পুথিগত জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, সামাজিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি দিকগুলির যথাযথ বিকাশসাধন। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষার এই লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নীচে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক কাজগুলির আলোচনা করা হল—

1. সামাজিক উন্নয়ন: সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে এগুলি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটায়।

2. দৈহিক বিকাশ: বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম জনগণকে কর্মঠ এবং সক্রিয় হতে সাহায্য করে। বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকে। আবার কোনো কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, ব্রতচারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। ফলে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চার সুযোগ ঘটে, সু-অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে কু-অভ্যাসগুলি দূর হয়।

3. মানসিক বিকাশ: বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তর্ক-সভা, বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আবার কোথাও গানবাজনা, সাহিত্যচর্চা, নাটক, নাচ প্রভৃতির

ব্যবস্থা করা হয়। ফলে অংশগ্রহণকারী মানুষজনের মধ্যে যেমন বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে তেমনি তাদের মনোরঞ্জনও হয়।

4. প্রাক্ষোভিক বিকাশ: বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশে সাহায্য করে।

5. নৈতিক বিকাশ: বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে মানুষ সর্বদাই কয়েকটি আদর্শ বা নীতিকে ভিত্তি করে একত্রিত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্য ওই আদর্শ বা নীতি মেনে চলতে বাধ্য হয়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নৈতিক বিকাশ ঘটে।

6. জ্ঞানমূলক বিকাশ: বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের চর্চা করে থাকে। যেমন—অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা সভা, আলোচনাচক্র, বিতর্ক সভা ইত্যাদি।

7. সৃজনশীলতার বিকাশ: বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞানমেলা, দেওয়ালপত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। যারা এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেয় তাদের মধ্যে ওই বিষয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।

8. আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি: বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময়ে যদি কোনো সদস্য এককভাবে কোনো দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়, তাহলে নিষ্ঠাসহকারে ওই দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে যা তাকে ভবিষ্যতে যে-কোনো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

9. নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা: প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন তার প্রতিটি সদস্যকে মেনে চলতে হয়। প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, স্থায়িত্ব ও কাজের অগ্রগতির জন্য প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। এর থেকেই সদস্যরা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা পায়।

10. অবসর সময় যাপনের শিক্ষা: অবসর সময় যাপনের শিক্ষার ক্ষেত্রেও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা আছে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীরা গান, বাজনা, নাচ, ছবি আঁকা প্রভৃতি নান্দনিক বিষয় অনুশীলন করার সুযোগ পায়। বাস্তব জীবনে তারা আগ্রহের বিষয়গুলি চর্চা করে গঠনমূলকভাবে অবসর সময় কাটাতে পারে।

11. জাতীয় সংহতি স্থাপনের শিক্ষা: বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সুযোগ করে দেয়। ফলে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সদস্যদের মধ্যে সংহতির মানসিকতা স্থাপিত হয়।

12. দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার: বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে বিষয়ের আদানপ্রদান ঘটে। যার ফলে গোঁড়ামি দূর হয়ে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি

বর্তমান বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক ভূমিকা পালনের পরিবর্তে কেবল বিনোদনমূলক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বহু মানুষ সামাজিক কল্যাণকর কাজের পরিবর্তে আড্ডা দিয়ে সময় কাটানোর জন্য ওইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া বর্তমানে এমন অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে যেগুলি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছে না। তারা কেবল পদের মোহ বা ক্ষমতা দখলের জন্য একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ওই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক কাজের পরিপন্থী। সেই কারণে সব রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রসারের সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। তবে একথাও ঠিক যে, বেশিরভাগ সামাজিক প্রতিষ্ঠান কোনো-না-কোনো আদর্শ বা নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং তারা ওইসব নীতি বা আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করছে। দু-একটি ত্রুটিযুক্ত সংস্থাকে লক্ষ করে সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সকল প্রতিষ্ঠানেই ঘটে থাকে। সেগুলি বাদ দিলে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত সংস্থা হিসাবে মাধ্যম (গণমাধ্যম)
(Media as an Agency of Education—Mass Media)

জনগণ হল বিশ্বের যে-কোনো গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান সম্পদ। জনগণের উপরই নির্ভর করে কোনো একটি দেশের অগ্রগতি ও সাফল্য। সেই কারণে দেশের জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা এবং শিক্ষার প্রসার ঘটা বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন গণমাধ্যম (Mass Media)। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমকে গণমাধ্যম বলে। গণমাধ্যম যে-কোনো দেশের মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাদ ঘুচিয়ে পরস্পরকে আরও নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ করে। তাদের মধ্যে গভীর সংযোগ ও সম্প্রীতি আনে। সেই দিক থেকে গণমাধ্যম হল যে-কোনো রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমগুলি হল—1. সংবাদপত্র, 2. বেতার, 3. দূরদর্শন, 4. চলচ্চিত্র ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা

1. **সংবাদ পরিবেশন:** সংবাদপত্রের মূল কাজ হল সংবাদ পরিবেশন করা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর সংগ্রহ করে আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করে সংবাদপত্র। আমরা সংবাদপত্র থেকে নানান খবর পাই। সংবাদগুলি বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে পরিবেশন করা হয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

2. **সামাজিক চেতনার জাগরণ:** সংবাদপত্র পাঠকের মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগায়। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সংবাদ বা তথ্যগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য উৎস এবং ছবিসহ সংবাদ পরিবেশন করা হয়। নানা ঘটনাকে সুন্দর এবং সঠিকভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে সংবাদপত্র জনগণকে সচেতন করে তোলে। এ ছাড়াও এটি পাঠক-পাঠিকাকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে উৎসাহ জোগায়।
3. **জনমত গঠন:** সংবাদপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল জনমত গঠন করা। বিভিন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে জনগণের মতামত চাওয়া হয়। জনগণ সংবাদপত্র পড়ে ওই সমস্ত বিষয়ে ধারণা গড়ে তোলে এবং বিষয়টি বিচারবিশ্লেষণ করে তার পক্ষে বা বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। এইভাবে সংবাদপত্র জনমত গঠনে সাহায্য করে।
4. **ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি:** নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকার ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে সংবাদপত্রটি যে ভাষায় প্রকাশিত হয়, সেই ভাষায় তাদের দক্ষতা বাড়ে। নিত্যনতুন বহু শব্দ এবং তার যথাযথ ব্যবহার সংবাদপত্র থেকে আয়ত্ত হয়। ভাষাজ্ঞানের বিকাশ ঘটলে যে-কোনো ব্যক্তি ভালোভাবে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে।
5. **সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগসাধন:** সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু রচনা করে। সরকার জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ও অভিমত সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারে। অন্যদিকে জনগণও সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ইত্যাদি জানতে পারে সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমেই। সাংবাদিকরা এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ ভূমিকা, সংবাদপত্রের এই বিশেষ দিকটিকে নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
6. **পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সংগতিবিধান:** সার্থকভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এর প্রথম শর্ত হল কোথায় কী পরিবর্তন হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সংবাদপত্র এ ব্যাপারে সাহায্য করে। এই দিক থেকে সংবাদপত্রের শিক্ষামূলক ভূমিকা অনস্বীকার্য।
7. **দেশবিদেশ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ:** সংবাদপত্র দেশবিদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করে থাকে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক ধারণা গঠন করে জ্ঞানের আরও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়।
8. **স্বল্প খরচে সংবাদ প্রদান:** সংবাদপত্র স্বল্প খরচে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে। জনগণ অতি অল্প অর্থের বিনিময়ে সংবাদপত্র কেনে। দেশবিদেশের বিভিন্ন তথ্য প্রতিদিন মাত্র চার-পাঁচ টাকার বিনিময়ে হাতে পাওয়া যায়। গরিব মানুষ আর্থিক কারণে রেডিয়ো বা টিভি কিনতে পারে না। এই ধরনের অসুবিধা সাধারণত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

9. **মানসিক বিকাশে সহায়তা:** সংবাদপত্র পাঠক-পাঠিকার মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। যারা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ে তাদের চিন্তাশক্তি বেড়ে যায় এবং তারা বিভিন্ন বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। অল্প বয়স থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করলে তাদের জ্ঞানের পরিধি যেমন বাড়ে, তেমনি মনের বিকাশও ঘটে।
10. **শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি :** নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তারা সাহিত্য, ভাষা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলির প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং শিক্ষামূলক লেখাগুলি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বিভিন্ন দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে শুরু করে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে সংবাদপত্র ছাত্রছাত্রীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে থাকে।
11. **আচরণ সংস্কারে সহায়তা:** সংবাদপত্র পাঠক-পাঠিকাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো ব্যক্তি যদি অসামাজিক হয়ে ওঠে তাহলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ওই ধরনের আচরণের জন্য তার কী শাস্তি হতে পারে তা সে জানতে পারে। ফলে নিজের আচরণ সংশোধন করতে সে সচেষ্ট হয়। এইভাবে সংবাদপত্র ব্যক্তিকে সঠিক পথে চলার দিশা দেখায়।
12. **সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন:** সংবাদপত্র বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, মানবিকতা সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতা

শিক্ষার গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন—

1. **মাত্রাতিরিক্ত বিজ্ঞাপন:** বর্তমান সংবাদপত্রগুলি বিজ্ঞাপন-পত্রে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ সংবাদপত্রেই আজকাল এত বেশি বিজ্ঞাপন থাকে যে, সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা থাকে না এবং সেজন্য সংবাদকে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়।
2. **নিরপেক্ষতার অভাব:** বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রই কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট বিশেষ প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছে। আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়। ফলে ওই সব সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ এবং তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়। কোনো খবর যদি তাদের দলের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তারা এই সংবাদ নিরপেক্ষভাবে পরিবেশন করে না।

3. **পীত সাংবাদিকতা:** বর্তমানে অনেক সংবাদপত্র পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রের বিক্রি বাড়ানোর জন্য প্রকৃত সংবাদকে যথাযথভাবে পরিবেশন করে না, বরং অন্যভাবে বা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। এটি এখনকার সংবাদপত্রের একটি বিশেষ ত্রুটি।
4. **ব্যক্তি ও শিশুমনে কুপ্রভাব:** বর্তমান পত্রপত্রিকায় এত বেশি খুন, জখম, রাহাজানি, অত্যাচার, লাঞ্ছনা প্রভৃতির খবর ছাপানো হয় যে তা পাঠ করলে, বিশেষত শিশুদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
5. **নিরক্ষরদের শিক্ষাদানে অক্ষমতা:** আমাদের দেশের জনগণের একটি বড়ো অংশ নিরক্ষর। তারা সংবাদপত্র পড়তে পারে না। ফলে সংবাদপত্র যে তথ্যই পরিবেশন করুক না কেন তারা সেগুলি সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। এই অর্থে সংবাদপত্র নিরক্ষরদের কাছে গণশিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না।
6. **শিশু ও অন্ধদের কাছে আকর্ষণহীন:** কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে সংবাদপত্র বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও শিশু এবং অন্ধদের কাছে সংবাদপত্র বিশেষ আবেদন রাখতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সংবাদপত্র আমাদের দেশে এমন একটি জায়গায় আছে যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অল্প কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে সমাজসচেতনতা এবং জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র আজও তার বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ebook.dascoaching.in

গণশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বেতারের ভূমিকা

1. **সর্বজনগ্রাহ্য অনুষ্ঠান প্রচার:** বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহজ-সরল ভাষায় এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যে, নিরক্ষর মানুষও তা বুঝতে পারে। সহজ সরল ভাষায় সকলের বোধগম্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় বলে বেতার আজ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
2. **স্বল্প খরচ:** বেতারযন্ত্রের দাম তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় মানুষ, বিশেষত দরিদ্র মানুষও সহজেই এটি কিনতে পারে। তাই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের বাড়িতে বেতার আজ জায়গা করে নিয়েছে।
3. **বাস্তবভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার:** বেতারে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তা বাস্তবধর্মী হওয়ায় মানুষের মনকে ছুঁয়ে যায়। মানুষ তাই ওই ধরনের অনুষ্ঠানে আনন্দ পায়।
4. **সব বয়সের শ্রোতার চিত্তবিনোদনে সহায়ক:** বেতার চিত্তবিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে যেসব গ্রামে আজও বিদ্যুৎ পরিসেবা পৌঁছোয়নি সেখানকার মানুষ দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখতে পায় না। সেক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনযাপনে বেতার হল নিত্যসঙ্গী। নানা বয়সের মানুষের

জন্য গানবাজনা, নাটক, সংবাদ, কৃষিকথার আসর, গল্পদাদুর আসর, মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ধারাবিবরণী, অনুরোধের আসর, বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

5. **সমাজসচেতনতা জাগরণে সহায়তা:** বেতারের মাধ্যমে এমন অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয় যা শ্রোতাদের সমাজসচেতন করে তোলে। তা ছাড়া বেতারের মাধ্যমে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক অনুষ্ঠানও প্রচার করা হয়।
6. **সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা:** বেতারের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শ্রোতাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা করা। দেশের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিমূলক বিষয় নিয়ে বেতারে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সেই অনুষ্ঠানগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক বোধের বিকাশ ঘটায়।
7. **দৃষ্টিহীনদের সহায়ক:** বেতারের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। দৃষ্টিহীনতার কারণে তারা চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতি উপভোগ করতে পারে না। অন্যদিকে বেতার যেহেতু শ্রুতিনির্ভর অনুষ্ঠান প্রচার করে, তাই দৃষ্টিহীনরা এই অনুষ্ঠান থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়।
8. **দ্বিমুখী ব্যবস্থা:** বেতারের অনুষ্ঠানগুলিকে বর্তমানে অনেকক্ষেত্রে দ্বিমুখী করার প্রয়াস চলছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলাকালে টেলিফোনের সাহায্যে শ্রোতাদের কাছ থেকে অভিমত চাওয়া হয়। ফলে শ্রোতারা সক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিশেষ আনন্দ পায়।
9. **অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাঠদান :** বেতারের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাঠদান করা হয়। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি থাকে না, তাই বেতারের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান থেকে শ্রোতারা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে।
10. **বিশেষজ্ঞকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান:** বেতারের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ প্রচার করা হয়।
11. **বহনযোগ্যতা :** ক্ষুদ্রাকার বেতারযন্ত্র বা ট্রানজিস্টার অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের এবং সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় অনেকেই একে ব্যবহার করে থাকে।
12. **শ্রুতিনির্ভরতা :** কেবল শ্রুতিনির্ভর হওয়ায় সাধারণ কর্মজীবী মানুষ দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ পায়। দেখা গেছে, এর ফলে তাদের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়।
13. **পরিবেশসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা :** বেতারে পরিবেশসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। আমাদের পরিবেশ দিনে দিনে দূষিত হচ্ছে। মানুষের নানারকম অবিবেচক কাজের জন্য তো বটেই, তা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। কীভাবে পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এইসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতেও বেতারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

14. **সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন:** বেতারের মাধ্যমে সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সেইসব অনুষ্ঠান যখন একযোগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হয়, তখন সারা দেশের অগণিত মানুষ সেই সমস্ত ঘটনা এবং তার কারণ জানতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, স্বল্প খরচে বেতারে একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করে। শুধু তাই নয়, গণশিক্ষা বিস্তারে, ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে এবং চিত্তবিনোদনেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বেতারের সীমাবদ্ধতা

বেতার গণশিক্ষার মাধ্যমরূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ঠিকই কিন্তু এর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিও রয়েছে। নীচে সেই ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হল—

1. **শ্রুতিনির্ভরতা:** বেতার গণশিক্ষার কেবল শ্রুতিনির্ভর মাধ্যম। এতে অনুষ্ঠান দেখা যায় না। ফলে মানুষ বিশেষত অল্পবয়সিরা এর প্রতি খুব একটা আকৃষ্ট হয় না।
2. **শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পরিমাণ কম:** বেতারে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান খুবই কম প্রচার করা হয়। ফলে বেতারের শিক্ষাগত মূল্য কম।
3. **সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব:** সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে ধীরে ধীরে বেতার তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঠিকমতো সংযোগ রেখে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় না। ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান এমন সময় পরিবেশিত হয় যে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে ছাত্রছাত্রীরা তাতে অংশ নিতে পারে না।
4. **পরিকল্পিত শিখন কৌশল ব্যবহারের অসুবিধা:** দূরদর্শনের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজনমতো পরিকল্পিত শিখনের ক্যাসেট ব্যবহার করা সম্ভব, বেতারের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা নেই।

গণশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে দূরদর্শনের ভূমিকা

1. **বাস্তবধর্মী শিক্ষাদান:** দূরদর্শন হল এমন একটি মাধ্যম যেখানে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।
2. **সর্বজনীন গণমাধ্যম:** দূরদর্শন এমন একটি অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যম যা সমাজের সব স্তরের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। যেসব মানুষ লেখাপড়া জানে না, তারা দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি দেখে এবং কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা শুনে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হতে পারে।
3. **দর্শন ও শ্রবণনির্ভর মাধ্যম:** দূরদর্শন হল দর্শন এবং শ্রবণনির্ভর মাধ্যম। এই মাধ্যম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, কারণ এটি একই সঙ্গে মানুষের দুটি ইন্দ্রিয়কে কার্যকরী করে তোলে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই মাধ্যমের গুরুত্ব তাই অনেক বেশি।

4. **দ্বিমুখী শিক্ষামাধ্যম:** বর্তমানে দূরদর্শনকে শিক্ষার একটি দ্বিমুখী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষে যেমন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয় বুঝতে না পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে জিজ্ঞাসা করে সেই বিষয় সম্পর্কে জেনে নেয়, তেমনি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারকালে শিক্ষার্থীরা টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের উত্তর জানতে পারে।
5. **নান্দনিক রুচি বিকাশ সহায়তা:** দূরদর্শন জনগণের মধ্যে নান্দনিক রুচির বিকাশ ঘটায়। দূরদর্শনের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে মানুষের মধ্যে সুন্দর রুচি গড়ে ওঠে।
6. **সংস্কৃতির ধারক ও বাহক:** কোনো দেশের সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা ও বাঁচিয়ে রাখায় দূরদর্শনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অতীত দিনের বহু সিনেমা, নাটক, গানকে দূরদর্শন বিশেষ উপায়ে সংরক্ষণ করে রাখে।
7. **জনমত গঠন:** বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দূরভাষ বা এসএমএস-এ দর্শকের মতামত চায় দূরদর্শন। তাই জনমত গঠনের ক্ষেত্রে দূরদর্শনের অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকরী ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।
8. **বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার:** কেবল নাটক, গান বা সংবাদ নয়—এখন দূরদর্শন শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।
9. **'কেব্‌ল লাইন' সংযোগ:** বর্তমানে দূরদর্শন যন্ত্রের সঙ্গে 'কেব্‌ল লাইন'-এর সংযোগ ঘটানোর ফলে বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ ঘটেছে। সারা বিশ্বের খবরাখবর, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
10. **মানসিক বিকাশে সহায়তা:** দূরদর্শন জনগণকে মানসিক বিকাশে সহায়তা করে, যা তাদের বিচারবিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে, আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

দূরদর্শনের অনুষ্ঠান

ভারত সরকারের দূরদর্শন বিভাগ যেসব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে সেগুলি হল—

1. বিভিন্ন ধরনের খবর ও আবহাওয়া সম্পর্কিত বুলেটিন।
2. বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে আলোচনাচক্র।
3. নানান বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা।
4. কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, বাণিজ্য ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা।
5. বিভিন্ন ধরনের নাটক, অভিনয়, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমা প্রভৃতির সম্প্রচার।
6. বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত শিল্পকলার প্রদর্শনী।
7. স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠান।

8. নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইউজিসি, এনসিইআরটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সঞ্চালিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।
9. মহিলাদের জন্য বিশেষ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।
10. বয়স্কদের জন্য বিশেষ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।
11. ছোটোদের জন্য কার্টুন।
12. দূরশিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিচালিত অনুষ্ঠান।

দূরদর্শনের সীমাবদ্ধতা

দূরদর্শন যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, বর্তমানে দূরদর্শনের কয়েকটি সীমাবদ্ধতাও লক্ষ করা যায়। নীচে সে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল—

1. **বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের প্রাধান্য:** বর্তমানে দূরদর্শনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অনেক বেশি সম্প্রচার করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ওইসব চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের প্রতি এক ধরনের নেশার সৃষ্টি হয়, ফলে তাদের পড়াশোনা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
2. **ব্যয়বহুল:** দূরদর্শন যন্ত্র বা টিভির দাম এখনও বহু মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের দেশের আশি শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং এদের একটা বড়ো অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত, তাই তাদের পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে এই যন্ত্র কেনা সম্ভবপর নয়।
3. **বিদ্যুতের অভাব:** দূরদর্শন যন্ত্রটি চালানোর জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ। গ্রামগঞ্জে অনেক জায়গাতেই এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও সেখানে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখা যায় না।
4. **দ্বিমুখী অনুষ্ঠানের অভাব:** দূরদর্শনের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে দ্বিমুখিতা বজায় থাকে না। অর্থাৎ সব অনুষ্ঠানে শ্রোতারা প্রয়োজনমতো ফোন করে প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়ার সুযোগ পায় না।
5. **শিশুদের উপর বিরূপ প্রভাব:** শিশুরা অনুকরণপ্রিয় হওয়ায় তারা দূরদর্শনে প্রচারিত বিভিন্ন দুঃসাহসিক কাজ অনুকরণ করতে যায়। বহুক্ষেত্রেই তাদের প্রাণসংশয় এমনকি প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটে থাকে।

দূরদর্শনের কুপ্রভাব সম্পর্কে দুটি রিপোর্ট

UNICEF-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে,

1. দূরদর্শনে অনুষ্ঠান দেখার জন্য 57 শতাংশ অভিভাবক বাড়ির ছেলেমেয়েদের হোমওয়ার্কে সাহায্য করতে পারছেন না।
2. দূরদর্শনের প্রতি আকর্ষণ বা ঝোঁক বাড়ায় 33 থেকে 55 শতাংশ ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার প্রতি অনীহা এসে গেছে।

3. দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির কারণে 45 শতাংশ কিশোর-কিশোরীর সৃজনশীল ক্ষমতা কমে গেছে। তাদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

আরজি মার্গের রিপোর্ট—এই রিপোর্টে বলা হয়েছে 98 শতাংশ ছেলেমেয়ে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখার জন্য খেলাধুলার প্রতি অনাসক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পিতা-মাতার সঙ্গে বচসা-দ্বন্দ্ব এবং মুখে মুখে তর্ক করায় অভ্যস্ত হয়েছে। পিতা-মাতার বাধ্য সন্তানের সংখ্যা দিনে দিনে কমছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, দূরদর্শন গণশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও এটি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান কমিয়ে বিনোদন এবং বিজ্ঞাপনমূলক অনুষ্ঠানের প্রচারের বাহুল্য ছাত্রসমাজে কুপ্রভাব ফেলেছে। দূরদর্শন শিক্ষার্থী ও জনগণের জন্য শিক্ষা প্রসারের উপর জোর দিলে তা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

গণশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের ভূমিকা

চলচ্চিত্র হল আধুনিক বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত জনপ্রিয় গণমাধ্যম। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ হিসেবেও এটির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীচে চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক ভূমিকা আলোচনা করা হল—

1. **বাস্তবধর্মী তথ্য পরিবেশন:** শিক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র বাস্তব সমস্যার উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়। শিক্ষার্থীরা এই ধরনের চলচ্চিত্র থেকে বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা ও সমস্যা ভালোভাবে বুঝতে পারে। জটিল তথ্যও চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে অনেক সহজ হয়ে ধরা পড়ে।
2. **জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক:** চলচ্চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এটি প্রস্তুত হয়। চক্ষু এবং কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থী যখন কোনো চলচ্চিত্র উপভোগ করে তখন সেই চলচ্চিত্রের বিভিন্ন উপাদান সহজেই তার জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন নতুন জ্ঞানের সঞ্চালন করে এবং তাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।
3. **সামাজিক চেতনা বিকাশে সহায়তা:** চলচ্চিত্র বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ঘটনা বা সমস্যার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়, তাই সমাজ শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র থেকে জনগণ বা শিক্ষার্থীর সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে। এই সামাজিক চেতনা আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
4. **মানবিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব প্রদান:** চলচ্চিত্র সাধারণত মানবজীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা দর্শকের কাছে উপস্থাপন করে। মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুলতে এই ধরনের চলচ্চিত্র বিশেষভাবে সাহায্য করে।

5. **জনমত গঠনে সহায়তা:** চলচ্চিত্র জনগণের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ওই প্রতিক্রিয়া জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক চলচ্চিত্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জোগায়।
6. **মানসিক বিকাশে সহায়তা:** বাস্তবধর্মী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে।
7. **গ্রহণযোগ্যতা:** যে-কোনো ভাষার মানুষই চলচ্চিত্রের দ্বারা উপকৃত হয়। অনেক সময় মানুষ প্রাদেশিক বা বিদেশি ভাষা বুঝতে পারে না ঠিকই, কিন্তু অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের অঙ্গভঙ্গি, আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করে চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করতে পারে।
8. **ব্যক্তির চাহিদা পূরণে সহায়তা:** চলচ্চিত্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক দিক হল—এটি ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। বিভিন্ন চাহিদা পূরণ না হলে ব্যক্তির নানা ধরনের মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। চলচ্চিত্র এই জটিলতা প্রতিরোধে সহায়তা করে।
9. **চিত্তবিনোদনে সহায়তা:** চলচ্চিত্রের চিত্তবিনোদনমূলক প্রভাব খুব বেশি। এর মাধ্যমে কর্মব্যস্ত মানুষ জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসিকান্না, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিলতা প্রভৃতি অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়। অবসর সময় কাটানোর পক্ষে এটি একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত।

উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে, চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের মাধ্যমই নয়, এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক ভূমিকাও রয়েছে। সামাজিক দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ও চরিত্রগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশ ঘটানোও এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা

শিক্ষা প্রসারে চলচ্চিত্র ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও এর বেশ কিছু অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। নীচে এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হয়—

1. **কুপ্রভাব:** গণশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম চলচ্চিত্র আজ শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি বিকৃত রুচি সৃষ্টির একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে বিভিন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অঙ্গভঙ্গি নকল করে বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা অনেক সময় নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়। আবার অনেক সময় কমবয়সি ছেলেমেয়েরা চলচ্চিত্রের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেদের ভাবী জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

2. **কু-অভ্যাস ও কুসংস্কার গঠন:** চলচ্চিত্র বর্তমানে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কু-অভ্যাস গড়ে তুলছে। অল্পবয়সি এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীরা জনপ্রিয়

চিত্রশিল্পীদের দ্বারা প্রদর্শিত ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি কু-অভ্যাস নকল করতে আগ্রহী হয়। আবার, অনেক চলচ্চিত্রে কিছু অলৌকিক দৃশ্য দেখানো হয়। সেই দৃশ্য দেখে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কুসংস্কার গড়ে ওঠে।

3. **ভ্রান্তধারণা গঠন:** আজকাল বহু চলচ্চিত্র নির্মাতা চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় করার জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং অসত্য বিষয়কে চলচ্চিত্রে স্থান দেন। সেইসব বিষয় দেখে দর্শকরা বা ছাত্রছাত্রীরা আনন্দ পায় ঠিকই, তবে তাদের মনে বাস্তব সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা তৈরি হয়।

4. **সময়ের অপচয়:** চিত্তবিনোদনের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার কারণে ছাত্রছাত্রী বা দর্শক যদি সময় ব্যয় করে সেই সমস্ত চলচ্চিত্র দেখে তাহলে তারা হয়তো সাময়িক স্থূল আনন্দ পাবে, কিন্তু শিক্ষার কিছু পাবে না। এটা সময়ের অপচয় মাত্র।

5. **ব্যয়বহুল:** চলচ্চিত্র নির্মাণ ব্যয়বহুল হওয়ায় বর্তমানে চলচ্চিত্র দেখার জন্য দর্শককে ভালো পরিমাণে টাকা খরচ করতে হয়। দরিদ্র মানুষের পক্ষে ওই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে চলচ্চিত্র দেখা সম্ভব হয় না। তাই আর্থিক কারণে এই গণমাধ্যমটির সুযোগ খুব কম সংখ্যক মানুষই নিতে পারে।

6. **অর্থ উপার্জনের উপায়:** বর্তমানে বেশিরভাগ চলচ্চিত্র নির্মাতা অর্থ উপার্জনের দিকে লক্ষ রেখে ছবি তৈরি করে। ছবির ভালো বাজার পাওয়ার জন্য অকারণ যৌনতা, হিংসা মারামারিকে বেশি করে তুলে ধরে। ছবির শিক্ষামূলক দিক, সমাজ উন্নয়নের দিক অবহেলিত হয়। ধ্বংস হয় সংস্কৃতি। বিপর্যস্ত হয় মূল্যবোধ।

7. **একমুখী সংযোগ:** চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের যেসব বিষয় দেখানো হয়, তাতে যদি কোনো ভুল তথ্য থাকে, অথবা চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে যদি কিছু বলার বা প্রতিবাদ করার থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে কিছুই করার থাকে না। অর্থাৎ, চলচ্চিত্র একমুখী মাধ্যম হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ত্রুটি সংশোধনের কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না।

গণশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম চলচ্চিত্র। তাই চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতাগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলচ্চিত্র নির্মাতারা যদি ছবি তৈরি করেন এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে সচেতন থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন, তাহলে আগামী দিনে চলচ্চিত্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে। আশার কথা, আজকাল সরকারি তরফে বহু শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র বানানো হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ে তা প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা ওইসব চলচ্চিত্র দেখে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে শুরু করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, দেশের প্রগতি, দেশের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

উপরোক্ত গণমাধ্যমগুলি ছাড়াও কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটকেও গণমাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটকে জনগণের মধ্যে যোগাযোগের একটি উন্নত মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইন্টারনেটের সাহায্যে বিশ্বের যে-কোনো স্থানে যে-কোনো তথ্য আমরা মুহূর্তে অবগত হতে পারি এবং তা সংরক্ষণ করতে পারি। বর্তমানে Tele-conference-এর সাহায্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ করাও সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে দূরাভাষ বিশেষ করে মোবাইলের ব্যবহার এত দ্রুত সকলের মধ্য ছড়িয়ে পড়ছে যে তাকে গণমাধ্যমের একটি উদাহরণ হিসাবে মনে করা যেতে পারে।

দেশজ গণমাধ্যম: উপরে আলোচিত গণমাধ্যমগুলি প্রধানত বিজ্ঞানভিত্তিক। সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শন, কম্পিউটার—সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। এই মাধ্যমগুলি ছাড়াও আমাদের দেশে চিরায়ত কতকগুলি মাধ্যম আছে। বিশেষ করে গ্রামের দিকে। যেমন, যাত্রা, গ্রাম্যনাটক, কবিগান, কীর্তন, বাউল, ছৌ নাচ ইত্যাদি। এই গণমাধ্যমগুলি জীবন্ত হওয়ায় সহজেই মানুষের মন স্পর্শ করতে পারে।

শিক্ষার প্রকার: প্রথাগত, প্রথাবহির্ভূত ও অপ্রথাগত এবং ওই সংস্থাগুলির ভূমিকা
(Types of Education: Formal, Non-Formal and Informal and Role of their Agencies)

শিক্ষা হল প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল বিমূর্ত ধারণা। আমাদের জীবন প্রয়াসের সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেইজন্য আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অনুশীলন চলে। গৃহ, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, নানারকম সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার বিভিন্ন কাজ চলতে থাকে এবং তা প্রত্যাশিত জীবনপথে যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনে আমাদের সাহায্য করে। আমরা যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি। এই কারণে শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী মানবিক প্রয়াস। নিত্য পরিবর্তনশীল, গতিধর্মী ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতির জন্য এটি একটি বিমূর্ত ধারণা। মানবতা ও মনুষ্যত্বের যথার্থ উদ্‌বোধনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। সুনাগরিক ও আদর্শ চরিত্রগঠন করার মতো একটি চ্যালেঞ্জ সার্থকভাবে মোকাবিলা করার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবনে কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রগতি বা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়, এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। ভারতের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের বক্তব্যও এ বিষয়ে খুবই স্পষ্ট অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিশ্বে শিক্ষাই জনগণের সমৃদ্ধির মাত্রা, কল্যাণ এবং নিরাপত্তা দান করে। "In a world based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people"—

ebook.dascoaching.in

Indian National Education Commission। মোট কথা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। শিক্ষার সংস্থাগুলিকে অর্থাৎ যে উৎস থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করে থাকি তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

শিক্ষার রূপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education), প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা (Non-Formal Education) এবং অপ্রথাগত বা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Informal Education)।

প্রথাগত শিক্ষা এবং তার সংস্থার ভূমিকা
(Formal Education and Role of their Agencies)

আদিম সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবন ছিল সরল। তাই সে যুগে প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। গৃহপরিবেশে পরিবারই শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সমাজজীবনে জটিলতা বৃদ্ধির কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটলে মানুষ বুঝতে পারে যে, প্রশিক্ষণ ছাড়া ওই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিদ্যালয় শিক্ষা বা প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education)।

প্রথাগত শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Formal Education)

সমাজ দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনভাবে এবং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের যে বিশেষ শিক্ষাদান করা হয়, তাই হল প্রথাবদ্ধ বা বিধিবিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

শিক্ষাবিদ পি ডি শুক্লা *(P D Sukla)*-এর মতে প্রথাগত শিক্ষা হল এমন এক গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি যাতে পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণের দ্বারা ছাত্র ও শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

শিক্ষাবিদ *জে পি নায়েক (J P Naik)*-এর মতে, সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে যে শিক্ষা পরিচালিত করা হয় তাকে প্রথাগত শিক্ষা বলা যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Formal Education)

বিধিবদ্ধ শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে বিদ্যালয় স্থাপন করে। বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত রূপ পেয়েছে। বর্তমানকালে নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. **নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পিত:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা পরিকল্পিত হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে। দর্শন, মনোবিদ্যা, সামাজিক প্রত্যাশা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে এক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা হয়ে থাকে।

2. **নির্দিষ্ট সূচি দ্বারা সীমাবদ্ধ :** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট সূচি থাকে। কয়েকটি নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষা প্রদান করা হয়। সুপরিকল্পিত নির্দেশনার মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়।
3. **নির্দিষ্ট পাঠক্রম:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত পাঠক্রম থাকে। ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই পাঠক্রম নির্ধারণ করা হয়।
4. **যোগ্য শিক্ষক দ্বারা প্রদত্ত:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এই শিক্ষা যোগ্য এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়।
5. **কঠোর শৃঙ্খলা:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় কঠোর শৃঙ্খলা দেখা যায়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়কেই এই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিলে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কার্যক্রম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
6. **নির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার্থী:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বয়স আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষার্থীদের 3+ বছর বয়সে প্রাক্‌প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং 6+ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভরতি করা হয়।
7. **নির্দিষ্ট স্থান:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী প্রত্যেককেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতে হয়। শিক্ষার স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হয়। শিক্ষকরাও সেইসব স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাজ করেন।
8. **নিয়মিত উপস্থিতি:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় ছুটির দিনগুলি ছাড়া প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষালয়ে উপস্থিত হতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষালয়ে থাকতে হয়।
9. **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক পরস্পর মুখোমুখি আলোচনায় অংশ নেয়। শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীকে পড়ান, শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে প্রশ্ন করে। এই মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।
10. **নিয়মিত পরীক্ষা:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয়গুলির উপর কতখানি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে তা জানার জন্য নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।
11. **রাষ্ট্রের ভূমিকা:** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় আর্থিক দায়দায়িত্ব এবং পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা, পাঠক্রম তৈরি, নীতি নির্ধারণ, পরিচালন ব্যবস্থা সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হয়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই শিক্ষা সুপরিকল্পিত এবং পূর্বনির্ধারিত। শিক্ষার পাঠক্রম, ভরতি, সময়সীমা, পরীক্ষাব্যবস্থা সবই

নির্দিষ্ট। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই নির্দিষ্ট রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় থাকে।

প্রথাগত বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা (Limitations of Formal Education)

একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা থাকলেও এর সীমাবদ্ধতাও কম নয়। সেইসব সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিগুলি হল—

1. **যান্ত্রিক ও কৃত্রিম পদ্ধতি:** এটি একটি যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম শিক্ষাপদ্ধতি। কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার জালে আটক থাকায় এক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যান্ত্রিকভাবে শিক্ষালয়ে আসে, নির্দিষ্ট সূচি মেনে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ করে। চার দেওয়ালে ঘেরা এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই হাঁপিয়ে ওঠে।
2. **সুযোগসুবিধার অভাব:** স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে একদিকে প্রবল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে শিক্ষা বিষয়ে জনগণের বেড়ে চলা চাহিদা—এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজন ছিল বা আছে তার ব্যবস্থা করা এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি।
3. **শিক্ষকনির্ভরতা:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা মূলত শিক্ষকনির্ভর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত পড়ানোর কৌশলের উপর। কিন্তু দেশের অনেক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সে কাজে সক্ষম ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব দেখা যায়।
4. **বৈচিত্র্যহীনতা:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাঠক্রমে বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষণীয়। এই শিক্ষায় একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে একই বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয়। ফলে নিজস্ব রুচি, চাহিদা, আগ্রহ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম শিক্ষার্থীরা পায় না।
5. **পরিবর্তনশীল নয়:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় পাঠক্রম পূর্বনির্দিষ্ট হয় বলে যখন-তখন প্রয়োজনমাফিক তাতে রদবদল করা যায় না। তাই দরকারমতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাম্প্রতিকতম তথ্য সবসময় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, ফলে এই শিক্ষা থেকে সর্বাধুনিক তথ্য লাভ করার ক্ষেত্রে সমস্যা থেকে যায়।
6. **নির্দিষ্ট সময়:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষালয়ে উপস্থিত হতে হয়। বিভিন্ন কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ওই নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষালয়ে হাজির হতে পারে না। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে।
7. **পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা মূলত পরীক্ষাকেন্দ্রিক। পরীক্ষায় সফল হওয়া বা ভালো ফল করাটাই এখানে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। ফলে এই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ যথাযথভাবে ঘটে না। এই শিক্ষাব্যবস্থায়

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি বাঁধাধরা প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে কোনোরকমে পরীক্ষায় পাস করে। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে না।

8. **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের অবনতি:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক পাঠক্রমের চাপে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উপর জোর করে পাঠক্রমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সামর্থ্যকে বিবেচনা করা হয় না।
9. **সীমিত প্রবেশপথ:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-কোনো স্তরে মাত্র একটিই প্রবেশপথ থাকে। শিক্ষার্থী যদি সময়মতো ওই নির্দিষ্ট পথে কোনো শ্রেণিতে ভরতি হতে না পারে, তাহলে সেই শিক্ষাবর্ষে তার শিক্ষার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বেশ কিছু ত্রুটি থাকলেও এই শিক্ষাব্যবস্থাটি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান স্থান দখল করে আছে। সরকার বা রাষ্ট্র যেহেতু এই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই এই শিক্ষার উপাদানগুলি জনসাধারণের উপযোগী করে এবং সব দিক বিচারবিবেচনা করে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়। তাই বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও অনিয়ন্ত্রিত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার তুলনায় এই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার উপরেই অধিকাংশ মানুষ বেশি আস্থা রাখেন।

প্রথাগত শিক্ষার সংস্থা ও তার ভূমিকা
(Role of Agencies of Formal Education)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রথাগত শিক্ষার সংস্থাগুলি হল বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র এবং গ্রন্থাগার বিদ্যালয় সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থাগার ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

গ্রন্থাগার (Library)

শিক্ষার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য অংশ। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় ছাত্ররা পাঠ্য-পুস্তকের পাশাপাশি ভ্রমণ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, ছোটোগল্প, উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নানারকম পুস্তক, প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের লিখিত গল্প, ডিটেকটিভ ঘটনা ইত্যাদি পড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এইসব পুস্তকের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকমের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হয়।

গ্রন্থাগারের ভূমিকা (Role of Library)

গ্রন্থাগার নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার কাজকে সাহায্য করে।

1. ***জ্ঞানের চাহিদা পূরণ:*** বিদ্যালয়ে সীমিত সময়ের জন্য শিক্ষক বিস্তারিতভাবে সবকিছু আলোচনা করতে পারেন না। তখন তিনি উক্ত বিষয়ের জন্য কী কী বই গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে ওই বিষয় সম্পর্কিত অধিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে

সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাবী বা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র থাকে। তাদের বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল থাকে, অনেক কিছু জানতে চায় যা শ্রেণিকক্ষে আলোচনায় সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয় সম্পর্কিত উচ্চস্তরের আলোচনার পুস্তক রেফারেন্স হিসাবে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বা অন্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন। এইভাবে গ্রন্থাগার সবরকম শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের কৌতূহল নিবারণের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে।

2. ***স্ব-শিক্ষণের অভ্যাস গঠন:*** গ্রন্থাগারে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার রুচি, পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্ব-শিখনের অভ্যাস গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, যা আধুনিক শিক্ষামনস্তত্ত্ববিদগণ শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে চিন্তন, ধারণা এবং বোধগম্যতা বৃদ্ধি পায়।
3. ***অবসর সময়যাপনের শিক্ষা:*** অবসর সময় বা দিনগুলিতে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় অর্থহীনভাবে সময় কাটায় যার ফলে সমাজের মানবসম্পদের অপচয় ঘটে। অবসর সময় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য পাঠাগার থেকে পুস্তক সংগ্রহ করে পড়তে পারে।
4. ***সহ-পাঠক্রমিক কাজের সহায়ক:*** বিদ্যালয়ে নানা সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি যেমন সাহিত্যসভা, বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক, কুইজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারে।
5. ***চারিত্রিক বিকাশ:*** পাঠাগার ব্যবহার করার কতকগুলি নিয়ম-নীতি আছে যেমন—উপযুক্ত সময়ে বই নেওয়া, সময়মতো ফেরত দেওয়া, রিডিংরুমে পড়ার সময় শৃঙ্খলিতভাবে পড়া ইত্যাদি। এই নিয়মগুলি পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গুণাবলি বিকশিত হয়।
6. ***সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র:*** বহু ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠাগারকে কেন্দ্র করে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ গড়ে ওঠে। এর ফলে সুষ্ঠু সামাজিক জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যায়। এ ছাড়া পাঠাগারের প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক আলোচনা, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে পল্লি অঞ্চলের জনগণ আধুনিক বিশ্বে সাম্প্রতিক সব ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়।
7. ***আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সহায়ক:*** আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি, যেমন—সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, হিউস্টিক পদ্ধতি, ডাল্টন পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি, ওয়ার্কশপ পদ্ধতি ইত্যাদি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত গ্রন্থাগারের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা মন্তব্য করতে পারি যে, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর জন্য গ্রন্থাগার গঠন ও তার সুষ্ঠু পরিচালনা অপরিহার্য। এর জন্যই সমস্ত

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সরকার গ্রন্থাগারের পদ সৃষ্টি করেছে এবং তার জন্য আবশ্যিক যোগ্যতা এবং প্রয়োজনবোধে বাঞ্ছিত যোগ্যতাবলি নির্দিষ্ট করেছে।

রাষ্ট্র (State)

রাষ্ট্র শিক্ষার খুবই প্রভাবশালী সংস্থা। **গার্নার** মনে করেন, রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী একদল মানুষ যা একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকার দ্বারা পরিচালিত। প্রাচীনকালে শিক্ষা রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে তো বটেই, প্রত্যক্ষভাবেও বহুক্ষেত্রে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সর্বাধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুদায়িত্ব শিক্ষা। প্রতিটি ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী বিকশিত করে তোলাই গণতান্ত্রিক সমাজের মর্মকথা। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া এ ধরনের আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ***Laski*** বলেন, ''Education of the citizen is the heart of modern State.'' ভারতের সংবিধানেও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা সংযোজিত হয়েছে। এককথায়, আধুনিক রাষ্ট্র অপরিহার্য শিক্ষা সংগঠন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন গ্রিসের নগর স্পার্টার শিক্ষা রাষ্ট্র দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। সেখানে প্রতিটি ব্যক্তির সামরিক শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। বিদ্যার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, সামর্থ্য বা রুচি কোনো কিছুই গ্রাহ্য করা হত না। প্লেটো এক আদর্শ দার্শনিক রাজার অধীনে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। শিক্ষা ও রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, Education should flourish under the state guardianship.

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাচিত্র অন্যরূপ ছিল। ভারতে রাজারা শিক্ষার উন্নতিকল্পে নানাভাবে সাহায্য করতেন। কিন্তু শিক্ষার সামগ্রিক পরিচালনার ভার ছিল গুরু বা শিক্ষকের উপর। অবশ্য মধ্যযুগে মোগল বাদশাহরা সাধারণের শিক্ষার কোনো দায়িত্ব নেয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শিক্ষার প্রসারে কার্যকরীভাবে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়ার কমিশন, কোঠারি কমিশন প্রভৃতি নিয়োগ করেন। এইসব কমিশনের সুপারিশ অনুসারে জীবনমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্ব

1. **শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়:** দেশ-কাল-পাত্র ভেদে শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় শিক্ষানীতি রচনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রাষ্ট্র। শিক্ষাদর্শ সমাজ আদর্শেরই প্রতীক। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণই আজ শিক্ষার লক্ষ্য। রাষ্ট্র এই কল্যাণসাধনে

ব্রতী। জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা এবং জাতীয় শিক্ষার মান নির্ধারণ করে রাষ্ট্র। সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন সাধন করে রাষ্ট্র।

2. **পাঠক্রম নির্ধারণ:** বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যসূচি রচনায় বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতির উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র শিক্ষার মান এক করার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যসূচি নির্ধারণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত। NCERT বিদ্যালয় স্তরে, UGC উচ্চশিক্ষা স্তরে, NCTE শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরে অভিন্ন পাঠক্রম সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা ও সম্পদের জোগান অনুযায়ী রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাপর্ষদ, উচ্চশিক্ষা স্তরে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম প্রণয়ন করে।

3. **শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা:** শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রম নির্ধারণই যথেষ্ট নয়, লক্ষ্যপূরণের জন্য ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নানান ধরনের শিক্ষালয় স্থাপন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। তা ছাড়া নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে রাষ্ট্র। আবার উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনমতো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, উৎকর্ষতা কেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে তোলার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। শুধু তাই নয়, চাহিদা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহ জোগাতে হবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করবে। কারণ Grant-in-aid প্রদান করা রাষ্ট্রের অন্যতম শিক্ষামূলক কাজ। এককথায়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব বর্তমানে গণতান্ত্রিক সেবাব্রতী রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত।

4. **শিক্ষায় সমসুযোগ:** আধুনিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন সাক্ষরতা ও সমসুযোগের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এর ব্যবস্থা করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। এ ছাড়া নারীশিক্ষা ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর বিশেষ শিক্ষার সাংবিধানিক দায় রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী বয়স্কদের শিক্ষার দায়ও রাষ্ট্রের। ভারতেও বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে। সমসুযোগ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

5. **জাতীয় সংহতি:** রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষাকল্পে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক সমাজ আদর্শ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাকে জাতীয় সংহতি ও জীবন বিকাশের উপায় হিসাবে ধরলে রাষ্ট্রকে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের ভার নিতেই হবে। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের শিক্ষামন্ত্রকের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনার অংশরূপে শিক্ষাপরিকল্পনার কাজ বিভিন্ন দেশেই অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের দেশে 1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় ও রাজ্যস্তরে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্যে দূরশিক্ষাকে (Distance Education) কাজে লাগানো হচ্ছে।

6. **শিক্ষা গবেষণা:** সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। সমাজের গতিশীলতার সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষাগবেষণার ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্য শিক্ষালয়গুলিকে সহায়তা করার জন্য গবেষণামূলক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও করতে হবে। ভারতে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষালয়গুলিকে সহায়তা করার জন্য NCERT এবং রাজ্যস্তরে SCERT-এর মতো শিক্ষা গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষকদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করার জন্য নানাবিধ আলোচনাচক্র ও কর্মশালার আয়োজন করা জরুরি। এই ধরনের শিক্ষামূলক কনফারেন্স, সেমিনার, সিমপোজিয়াম সংগঠনে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং উৎসাহ দিতে হবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে।
7. **শিক্ষালয় পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ:** শিক্ষালয়গুলি যথাযথ পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে পরিদর্শনমূলক শিক্ষাসংস্থা গঠন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে যেমন UGC, NAAC, AICTE, NCERT, NCTE ইত্যাদি সংস্থাগুলি এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। তা ছাড়া পাঠক্রম প্রণয়ন, পুস্তক নির্বাচন, অর্থ সাহায্য, শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষকতার গুণাবলি, চাকুরির শর্ত ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে।
8. **গণমাধ্যম পরিচালনা:** রাষ্ট্র বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি গণমাধ্যম দ্বারা মানুষকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে পারে। এগুলি জনসাধারণের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে। তাই শিক্ষাপ্রসারে এগুলি বিরাট সম্ভাবনা তৈরি করে। তাই গণমাধ্যমের সুষ্ঠু পরিচালনা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
9. **শিক্ষাব্যবস্থার সমীক্ষা ও পর্যালোচনা:** সবশেষে বলা যায়, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সমীক্ষা করার জন্য মাঝে মধ্যে কমিশন ও কমিটি নিযুক্ত করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। সাধারণত কমিশন ও কমিটির সুপারিশমতো সারাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করা হয়।

উপসংহার

রাষ্ট্র শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করবে কিনা সে প্রশ্ন আজ আর ওঠে না। আজকের প্রশ্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না সীমাহীন। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সীমাহীন নয়। শিক্ষায় নাৎসি জার্মানির মতো স্বৈরাচারী শাসন কোনো অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম প্রণয়নে বা শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ যেন কোনোভাবেই 'শিক্ষা-স্বাধীনতা'-কে (Academic freedom) ব্যাহত না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দায়িত্ব শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের উপরেই ন্যস্ত হতে হবে।

তা ছাড়া সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির আবর্ত থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। সর্বাধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শিক্ষাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না—একথা সত্য, তবে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিলেও চলবে না। আজ রাষ্ট্র এক জনকল্যাণমূলক অতি শক্তিশালী শিক্ষামাধ্যমরূপে সর্বজনস্বীকৃত।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা বা বিধিমুক্ত শিক্ষা এবং তার সংস্থাগুলির ভূমিকা (Non-Formal Education and Role of their Agencies)

'বিধিমুক্ত শিক্ষা' কথাটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বেশি দিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল প্রণালীটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে তথা পৃথিবীর সর্বত্র অনুসরণ করা হচ্ছে। আমরা যদি মানবসমাজের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করি ও মানবসভ্যতার বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব যে, বিধিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক অবস্থায় মানবসমাজে ছিল না। মানুষের মূল চাহিদা ছিল খাদ্য ও বাসস্থান। এই খাদ্যসংগ্রহ ও আশ্রয়ের কৌশলই শিশুদের আয়ত্ত করতে হত পরিবারের অভিজ্ঞ সদস্যদের কাছ থেকে। শিশুদের শিক্ষা হত পরিবারের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাপনের মাধ্যমে। এই শিক্ষা ছিল স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত (informal)। এরপর ক্রমশ জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন প্রয়োজন হল নানা সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য নানা কৌশল আয়ত্তের। এক প্রজন্ম যে কৌশল আয়ত্ত করতে শিখল তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য প্রয়োজন হল ক্রমাগত সংশোধিত শিক্ষার। এইসব কৌশল বলতে বোঝাত যুদ্ধ, পশুশিকার, মৎস্যশিকার, রোগ আরোগ্যের জন্য ওষুধ তৈরি, শিশুপালন, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। সমাজের নতুন প্রজন্ম পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বা পরিবারের বাইরের কোনো দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে এই কৌশল শিক্ষালাভ করত। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আংশিক বিধিমুক্ত শিক্ষা বা Non-formal বলা যেতে পারে।

ক্রমশ সমাজজীবনের উন্নতি ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির ব্যাপ্তিও প্রসারিত হল। প্রয়োজন হল আরও সংগঠিত প্রশিক্ষণ। শিশুরা একটি বিশেষ বয়সে পৌঁছোলে, তাদের সমাজজীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করার কিছু আগে কিছুদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা হল। এটি সমাজ বা পরিবারের মাধ্যমে দেওয়া হত। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ যাঁরা দিতেন তাঁদের বলা হত পুরোহিত। এই পুরোহিত শ্রেণি গড়ে তুললেন নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এভাবেই শিক্ষা বিধিমুক্ত থেকে একসময় বিধিযুক্ত হল। এই সময় গৃহ-পরিবেশ ও ধর্মীয় সংস্থাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত।

এর পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনের যুগেও ভারতে ধর্মভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার (মক্তব, মাদ্রাসা) পাশাপাশি বিধিমুক্ত শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। ধর্মীয় প্রভাব

বিস্তারের জন্য ধর্মপ্রচারকেরা মানুষের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতেন। শরীরচর্চার জন্য ছিল নানা ব্যায়ামাগার। লোকশিক্ষার উৎস ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লোকনৃত্য, লোকসংগীত। এগুলিও এক একরকম বিধিমুক্ত শিক্ষা। ব্রিটিশ শাসনযুগে শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের উঁচুশ্রেণির মুষ্টিমেয় কিছু ভারতীয়দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। তাদের পরিকল্পিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল আনুষ্ঠানিক, পরীক্ষামুখী। এর ফলে বিশাল সংখ্যক ভারতীয় অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগল। স্বাধীনতার এত বছর পরেও কিন্তু আমরা সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আজও আনুষ্ঠানিক, মহার্ঘ শিক্ষাব্যবস্থাকেই গুরুত্ব দিই। তবে এই শিক্ষাধারার পাশাপাশি ক্রমশ বিধিমুক্ত শিক্ষাধারাও তার স্থান করে নিচ্ছে। পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাগার, জাদুঘর, সিনেমা, দূরদর্শন, যাত্রা-থিয়েটার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করছে। বিধিমুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, পরিবার পরিকল্পনার সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ ও বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর ভারতবাসী প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করছে ও গ্রামীণ জীবন ও জীবিকার অস্তিত্ব বজায় রাখছে। পরিবারের মেয়েরা গৃহস্থালির কাজ শেখে, শিশুপালন শেখে, রুগির সেবা করতে শেখে এই বিধিমুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে। কৃষকের সন্তানরা কৃষিকাজ শেখে, আবার তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, ছুতোর মিস্ত্রি, কর্মকার, কুম্ভকার, চর্মশিল্পী পরিবারের সন্তানরা নিজেদের বংশগত জীবিকা অর্জনে দক্ষতা লাভ করে।

ebook.dascoaching.in

বিধিমুক্ত বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Non-Formal Education)

বিগত 30 বছরের মধ্যে বিধিমুক্ত বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রশাসক, রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদগণ বিধিমুক্ত শিক্ষাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের মতে বিধিমুক্ত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার পরিপূরক। অনেকে একে প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প বলে মনে করেন।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার একজন বিশেষজ্ঞ **অধ্যাপক ম্যালকম আদিশেসাইয়া** ***(Malcom Adiseshiah)***-র মতে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সীমানা সুবিস্তৃত। কারণ প্রথাগত শিক্ষার বহির্ভূত সমস্ত শিক্ষাই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর কোনো সময় বা স্থানের মাত্রা নেই। **কুম্বস** এবং ***আহমেদ (Coombs & Ahmed)*** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা হল বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা কাঠামোর বাইরে সংগঠিত এবং ধারাবাহিক শিখন প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হল জনগণ, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের নির্দিষ্ট এক অংশের নিকট নির্বাচিত শিখন পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা। তারা আরও মনে করেন প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা বিদ্যালয়ের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন—কৃষি বিষয়ক কর্মসূচি, স্থানীয় অঞ্চলের উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এইসব

কর্মসূচি যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদের উপকারে আসে। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা যেহেতু কোনো সংগঠিত কার্যসূচি নয় সেজন্য এর জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রয়োজন নেই—এ ধারণা ভ্রান্ত। এটা অবশ্যই সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষণের উপাদানসমূহ যেমন শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আগ্রহ, সুবিধা এবং উপযোগিতা প্রভৃতি যথেষ্ট বিবেচনা করার পর পরিকল্পিত উপায়ে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার্থী কেবল বিষয় নির্বাচনেই সুযোগ পায় তা না, সময়, স্থান, স্থায়িত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পছন্দের সুযোগ আছে।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হয় যদি প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা কী নয় তা ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষাকে প্রতিস্থাপিত করে না। এই ধরনের শিক্ষা কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণি, অশিক্ষিত জনগণ বা অদক্ষ এবং নিরক্ষরদের জন্য নয়। শিক্ষিত এবং দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য ও সব ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্যই বিধিমুক্ত বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা উপযোগী। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প নয়। একে অপরের পরিপূরক এবং একে অপরকে শক্তিশালী করে। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার অনমনীয়তা এবং ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Non-Formal Education)

1. **প্রাসঙ্গিকতা:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কর্মসূচি প্রয়োজনভিত্তিক এবং সকল বয়সের শিক্ষার্থীদের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়।
2. **নমনীয়তা:** প্রথাগত শিক্ষার কড়াকড়ি প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় একেবারেই নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা সময়, স্থান, ব্যাপ্তি, হাজিরা, পাঠ্যসূচি, পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন প্রভৃতি দিক থেকে অত্যন্ত নমনীয়।
3. **ব্যাবহারিকতা:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় ক্ষেত্রের উপর পাঠদান বা কর্মসূচি গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে।
4. **বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীদের পুনরায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আর্থিক বা অন্যান্য কারণে যেসব ছেলেমেয়ে প্রথাগত শিক্ষায় অংশ নিতে পারে না বা পড়া শুরু করেও মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সেইসব ছেলেমেয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা পুনরায় মূল স্রোতে ফিরে আসার সুযোগ পায়।
5. **নির্দিষ্ট সময়সীমার অনুপস্থিতি:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। শিক্ষার্থী নিজের কাজের ফাঁকে যে-কোনো সময়ে পড়াশোনা করতে পারে। বাঁধাধরা নিয়মে প্রতিদিন কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হয় না।

6. **নির্দিষ্ট বয়সসীমার অনুপস্থিতি:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা থাকে না। যে-কোনো বয়সের শিক্ষার্থী এতে অংশ নিতে পারে। এই জাতীয় শিক্ষায় কোনো শ্রেণিতে ভরতি হওয়ার ক্ষেত্রেও বছরে একবারের পরিবর্তে দু-বার বা তারও বেশিবার সুযোগ পাওয়া যায়।
7. **নির্দিষ্ট শিক্ষালয় নেই:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার পঠনপাঠন চার দেয়ালের ঘেরা কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হয় না। সাধারণত ডাকযোগে শিখন বিষয়গুলি (Study materials) শিক্ষার্থীর বাড়িতে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থী নিজের বাড়িতেই সেগুলির সাহায্যে পড়াশোনা করে।
8. **কম খরচে শিক্ষা:** প্রথাগত শিক্ষার তুলনায় প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার খরচ অনেক কম। এই শিক্ষার খরচ এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এতে অংশ নিতে পারে।
9. **নির্বাচনে স্বাধীনতা:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় সব শিক্ষার্থীর জন্য এক ধরনের পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রম থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী আলাদা আলাদা পাঠক্রম নির্বাচন করতে পারে।
10. **মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নমনীয়:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রথাগত শিক্ষার মতো কঠোর নয়। একসঙ্গে সব পত্রের পরীক্ষায় না বসলেও চলে। যে-কটি পত্রে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি ভালো হয়েছে বলে মনে হয়, সে সেই ক-টি পত্রেই পরীক্ষায় বসতে পারে। ধীরে ধীরে সবকটি পত্রে পাশ নম্বর পেলে সে এক সময় ওই কোর্সে উত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।
11. **জীবনব্যাপী জ্ঞানলাভ:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় যেহেতু শিক্ষার্থীর বয়সজনিত কোনো বাধা নেই শিক্ষার্থী তাই সারাজীবন ধরে পড়াশোনা করতে পারে এবং এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সারাজীবন ধরে নতুন নতুন তথ্য ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।
12. **নির্দেশভিত্তিক শিক্ষা:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার স্টাডি মেটিরিয়াল বিশেষভাবে প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থীরা সেইসব নির্দেশ অনুযায়ী পড়াশোনা করলে সঠিকপথে চালিত হতে পারে।
13. **সাহায্যকারী শিক্ষাব্যবস্থা:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থী প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণে অপারগ হলে, এই শিক্ষাপদ্ধতি তাদের শিক্ষাগ্রহণে সাহায্য করে।
14. **শিক্ষকের ভূমিকা:** প্রথাগত শিক্ষার মতো প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষক শ্রেণি-শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা দেন না। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী সুন্দর ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তিকা বা মডিউল প্রস্তুত করেন। শিক্ষার্থী নিজেই সেই পুস্তিকা পাঠ করে প্রয়োজনীয় বিষয় শিখে নিতে পারে।

প্রথাগত বা বিধিবদ্ধ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য প্রথাবহির্ভূত বা প্রথামুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও এই শিক্ষাব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে সমাজের বিস্তৃত অংশের মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ায় এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

1986 খ্রিস্টাব্দের POA (Programme of Action) অনুযায়ী প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, ইন্সট্রাক্টর বা প্রশিক্ষক সহায়ক হিসাবে কাজ করেন।
(খ) শিক্ষণের থেকে শিখনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
(গ) কর্মসূচিকে এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যাতে শিক্ষার্থী তার ক্ষমতা অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারে।
(ঘ) শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এবং শংসাপত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
(ঙ) অংশগ্রহণকারী শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করে।
(চ) শিক্ষার্থীর বয়স, ভরতির সময়সীমা, বিষয় পছন্দকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয়তা অবলম্বন করা হয়।
(ছ) বাস্তব জীবনের উপযোগী কোর্স, পাঠ ত্যাগকারীদের পুনরায় ভরতির সুযোগ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
(জ) প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মানের সঙ্গে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মান তুলনাযোগ্য।
(ঝ) সংগীত, নৃত্য, নাটক, খেলাধুলা, স্পোর্টস প্রভৃতি আনন্দমূলক সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি সংগঠিত হয়।
(ঞ) বালিকা, বিভিন্ন অনগ্রসর জাতি/জনজাতি/উপজাতি, শিশুদের সমস্ত রকম সুবিধা নিশ্চিত করা হয়।
(ট) প্রশিক্ষকগণ স্থানীয় হওয়ায় কমিউনিটির মানুষদের পছন্দসই হয়।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সুবিধা (Advantages of Non-formal Education)

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সুবিধা বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) প্রথাগত শিক্ষা থেকে যারা বঞ্চিত এমন লক্ষ লক্ষ শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে পারে।
(খ) শিক্ষালাভ ও অর্থ উপার্জন একই সঙ্গে চলতে পারে।
(গ) শিক্ষাকে গণতন্ত্রীকরণের একটি কার্যকরী উপায়।
(ঘ) সামাজিক সম্পদ, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, পেশা, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সর্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে পারে।
(ঙ) এই ধরনের শিক্ষা পাঠক্রম, পদ্ধতি, শিখন মাধ্যম শিক্ষার্থীদের নিকট অধিক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

(চ) এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বয়ংসেবী সংস্থাকে ব্যবহার করা যায়, যার ফলে শিক্ষা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

(ছ) শিক্ষাব্যবস্থায় নমনীয়তা থাকার ফলে প্রথাগত শিক্ষার অসুবিধাগুলি দেখা যায় না। যার ফলে সকলেই এই শিক্ষায় স্বাগত।

(জ) একদিকে যেমন এই ধরনের শিক্ষায় অল্প অর্থের প্রয়োজন, অন্যদিকে পেশাগত ও আর্থিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয়, যার ফলে অর্থের বিনিয়োগ এবং শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয় হ্রাস পায়।

(ঝ) সারা জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ এই শিক্ষা সংগঠিত করতে পারে।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Non-Formal Education)

শিক্ষার সার্বিক প্রসারে এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের দিক থেকে নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না ঠিকই, তবে এই শিক্ষাব্যবস্থাতেও বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। ত্রুটিগুলি হল—

1. **সবধরনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক প্রভৃতি সবকটি চাহিদা পূরণ করতে পারে না। শিক্ষালয়ে প্রতিদিন না আসার কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়। কারণ শুধু বই পড়ে ওইসব চাহিদা পূরণ হয় না।
2. **সামাজিক বিকাশের সুযোগের অভাব:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় এককভাবে কোনো সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে না। শিক্ষার্থীরা যেহেতু দলগতভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না, তাই শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
3. **অনির্দিষ্ট পাঠক্রম ও শিক্ষা প্রক্রিয়া:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় পাঠক্রম অনির্দিষ্ট এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এইপ্রকার শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর যথাযথ বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয় না।
4. **পেশাকেন্দ্রিক শিক্ষা:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে দ্রুত জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। এই কারণে এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর কাছে পেশাকেন্দ্রিক এবং উৎপাদননির্ভর হয়ে পড়ে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না।
5. **সহযোগিতার অভাব:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিয়মিত শ্রেণিশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বোধ গড়ে ওঠে না।

6. **শংসাপত্রের গ্রহণযোগ্যতা কম :** অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত শংসাপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রথাগত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত শংসাপত্রের গুরুত্ব অধিকাংশ সময়েই প্রথবহির্ভূত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত শংসাপত্রের তুলনায় বেশি।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার বেশ কিছু অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা থাকলেও ভারতের মতো রক্ষণশীল দেশে যেখানে প্রথাগত শিক্ষা সব মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারে না, সেখানে এই শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকরী। তা ছাড়া দরিদ্র জনগণের কাছে স্বল্পব্যয়ের এই শিক্ষা আশীর্বাদস্বরূপ। শুধু তাই নয়, স্কুলছুট শিক্ষার্থী, অশিক্ষিত ও চাকুরিজীবী মানুষের কাছে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার বিভিন্ন রূপ (Forms of Non-formal Education)

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে নানান ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—1. দূরাগত শিক্ষা ও 2. মুক্ত শিক্ষা।

নীচে দূরাগত শিক্ষা ও মুক্ত শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

1. **দূরাগত শিক্ষা (Distance Education):** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরাগত শিক্ষা (Distance education) হল এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থাটি মূলত তিনটি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যথা—1. করেস্পন্ডেন্স শিক্ষা, 2. মুক্ত শিক্ষা এবং 3. দূরশিখন বা ডিসট্যান্স লার্নিং। বর্তমানে এই জাতীয় শিক্ষাকে 'ওপেন এয়ার স্কুল' এবং 'কন্টিনিউয়িং এডুকেশন' নামেও অভিহিত করা হচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দূরাগত শিক্ষা মোট 28টি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যথা—(i) কন্টিনিউয়িং এডুকেশন, (ii) করেস্পন্ডেন্স এডুকেশন, (iii) করেস্পন্ডেন্স লার্নিং, (iv) করেস্পন্ডেন্স স্কুল, (v) করেস্পন্ডেন্স টিচিং, (vi) ডিস্ট্যান্স এডুকেশন, (vii) ডিস্ট্যান্স টিচিং, (viii) ডিস্ট্যান্স লার্নিং, (ix) এক্সটারনাল ডিগ্রি প্রোগ্রাম, (x) এক্সটারনাল স্টাডিজ, (xi) এক্সটারনাল সিস্টেম, (xii) এক্সট্রামিউরাল সিস্টেম, (xiii) হোম স্টাডি, (xiv) ইনডিপেন্ডেন্ট লার্নিং, (xv) ইনডিপেন্ডেন্ট স্টাডি, (xvi) লাইফ লং এডুকেশন, (xvii) ননফর্মাল এডুকেশন, (xviii) অফ্ ক্যাম্পাস স্টাডি, (xix) ওপেন এডুকেশন, (xx) ওপেন লার্নিং, (xxi) ওপেন স্কুল, (xxii) ওপেন ইউনিভার্সিটি, (xxiii) আউট অফ স্কুল এডুকেশন, (xxiv) পোস্টাল কোর্সেস, (xxv) টিচ ইয়োরসেল্‌ফ প্রোগ্রাম, (xxvi) টেলি ইউনিভার্সিটি, (xxvii) ইউনিভার্সিটি অফ দি এয়ার, (xxviii) ইউনিভার্সিটি উইদাউট ওয়াল্‌স।

দূরাগত শিক্ষার সংজ্ঞা

1. যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না গিয়ে এবং শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই ডাকযোগে বা অন্য কোনো মাধ্যমের সহায়তায় শিক্ষালাভ করে, তাকে দূরাগত শিক্ষা বলে।

Our Online Class>>
www.online.dascoaching.in

2. **ডেভিড বাটস্**-এর মতে, দূরাগত শিক্ষা হল সেই ধরনের শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীদের নিজস্বতা বজায় রাখার সুযোগ থাকে এবং শিক্ষাপদ্ধতির নমনীয়তার ফলে তাদের ইচ্ছা ও সময়-সুযোগ অনুযায়ী পঠনপাঠনের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকে মনে করেন দূরশিক্ষা ও মুক্ত শিক্ষা শব্দ দুটি সমার্থক একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। প্রথাগত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সামাজিক ও শিক্ষাগত সমসুযোগের ব্যবস্থা করা যায় না তখন মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দূরশিক্ষাব্যবস্থা প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি চলতে পারে। ***Ruggles*** এবং তাঁর সহকারীগণ বলেন, সব দূর শিক্ষাব্যবস্থার কর্মসূচিতে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। কোনো কোনো দূর শিক্ষাব্যবস্থা খুবই কঠোর এবং অনমনীয়। যেখানে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা সর্বদাই নমনীয়।

Wedemeyer, Holmberg, Moore, Peters এবং ***Keegan*** প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ দূরশিক্ষার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দূরশিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। 1981 খ্রিস্টাব্দে ***Prof. Holmberg*** দূরশিক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন, সর্বস্তরে বিভিন্ন প্রকৃতির শিখন যা ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিকক্ষ বা একই স্থানে শিক্ষকের তাৎক্ষণিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় না তাকেই দূরশিক্ষা বলে। দূরশিক্ষার বিশেষজ্ঞ ***Desmond Keegan*** বলেছেন, ''Distance Education represents distance teaching with learning''. অর্থাৎ দূরশিক্ষা হল দূর শিক্ষণ এবং শিখন। ***Peters***-এর মতে, দূরশিক্ষা হল পরোক্ষ নির্দেশদান, কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না। এখানে উচ্চমাত্রায় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, যার ফলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ***Dr. Keegan*** দূরশিক্ষার সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তিনি দূরশিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দূরশিক্ষার ধারণাটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। এগুলি হল—

(ক) সমগ্র শিক্ষাকালব্যাপী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অল্প সময়ের সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন—শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রায়শ প্রস্তুতিতে মুখোমুখি হয়ই, এখানে তা হয় না।

(খ) এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা শিখন সামগ্রী পরিকল্পনা করে, উৎপাদন করে এবং শিক্ষার্থীদের পরিসেবার ব্যবস্থা করে। এইখানেই 'Private Study' এবং 'Teach Yourself' কর্মসূচির সঙ্গে এর পার্থক্য।

(গ) প্রযুক্তিভিত্তিক মাধ্যম যেমন—মুদ্রণ, অডিয়ো, ভিডিয়ো বা কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ ঘটানো হয় এবং শিখনের বিষয় বিনিময় হয়।

(ঘ) এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে উভয়মুখী যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারে। এমনকি কোনো আলোচনার সূচনা করতে পারে। এই বিষয়টিই দূর শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহারের পার্থক্য।

(ঙ) সমগ্র শিক্ষাকালের মধ্যে শিক্ষার্থীরা মাত্র কয়েকদিন শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এর ফলে দলগত শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। মাঝে মাঝে অবশ্য শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে দলগতভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং সামাজিকীকরণের সুযোগ তৈরি হয়।

কিগ্যান উল্লিখিত দূরশিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি দূরশিক্ষার ধারণার মূলভিত্তি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সাক্ষাৎকারের উপর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থী নিজে নিজেই শেখে। তবে এর জন্য বিশেষ শিখন পরিকল্পনা দূরশিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে থাকে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একইভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও মিথস্ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দূরশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এখানে ব্যাপক সাংগঠনিক উদ্যোগের প্রয়োজন। দূরশিক্ষার দুটি দিক আছে—শিক্ষাগত ও শিল্পগত।

শিক্ষাগত দিক হল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকরণ এবং শিল্পগত দিক বলতে বোঝায় শিখন সামগ্রী উৎপাদন ও তার বণ্টন। তাই দূরশিক্ষা হল দূর শিক্ষণ এবং দূর শিখন।

দূরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Distance Education)

দূরশিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—ভারতবর্ষে দূর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? বিগত 50-60 বছর ব্যাপী আমাদের দেশের শিক্ষাচিত্র বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে দূরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। বিষয়গুলি হল—

(ক) শিক্ষাকে সকলের কাছে নিয়ে যাওয়া।

(খ) শিক্ষার গুণগতমান।

(গ) প্রাসঙ্গিক শিক্ষা।

শিক্ষাকে সকলের নিকট নিয়ে যাওয়া—একথা বলা বাহুল্য যে, বিগত 60 বছরে ভারতবর্ষে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার অবস্থা আদপেই সন্তোষজনক নয়। আমাদের দেশে 17—23 বছরের যুবকদের মধ্যে মাত্র 6% উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। ফিলিপিনস (22%), দক্ষিণ কোরিয়া (21%), জাপান (35%) এবং USA (63%) ইত্যাদি দেশের তুলনায় এদেশে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রসংখ্যা এখনও অনেক কম।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রসারের ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ছাত্রদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে। অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আগামী 20 বছরে

উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ছাত্রসংখ্যা বিগত 10 বছরে যা ছিল তার কয়েক গুণ বৃদ্ধি হবে। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র বিস্ফোরণের সমস্যা সৃষ্টি হবে, যদি না উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এ ছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে আজও অসমতা আছে, যেমন—নারী-পুরুষের মধ্যে, শহর এলাকা ও গ্রাম এলাকার মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে। মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা মাত্র 31%। এর মধ্যে অর্ধেকই (52%) মানবিক শাখার ছাত্রী এবং বিজ্ঞানের ছাত্রী সংখ্যা হল 39%। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যও দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে যেখানে প্রতি লাখে 61 জন উচ্চশিক্ষায় ভরতি হয় সেখানে অরুণাচল প্রদেশে এর সংখ্যা 5366 জন। সর্বভারতীয় গড় হল 400 জন। একইভাবে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। গ্রামে প্রতি হাজারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে 5 জন সেখানে শহরে 43 জন (উপরোক্ত সব পরিসংখ্যান 1998 খ্রিস্টাব্দের)। এটা অবশ্যই শুভ লক্ষণ নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেখানে এই অবস্থা সমর্থনযোগ্য নয়। এই কারণে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অধিক সংখ্যক উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই চাপকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা খুব অল্প সংখ্যক গণতান্ত্রিক সরকারেরই আছে। এককথায় বলা যায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই মন্তব্যই করতে হয় যে, দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। প্রশ্ন হল এই দাবি পূরণে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। গতানুগতিক ব্যবস্থা হল আরও বেশি সংখ্যায় প্রথাগত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এর জন্য প্রয়োজন হল—

1. ***শিক্ষক***—পূর্ণ সময়ের জন্য।
2. ***ছাত্র***—পূর্ণ সময়ের জন্য।
3. ***স্থান***—শ্রেণিকক্ষ, যেখানে শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
4. ***মিথস্ক্রিয়া***—শিক্ষক ও ছাত্রদের মুখোমুখি অবস্থান।

স্বাভাবিক কারণেই উপরোক্ত ব্যবস্থাদি ব্যয়সাপেক্ষ। এছাড়া সরকার বা সমাজ এই ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষার আয়োজন করলেও অনেকেই এর সুযোগ নিতে অক্ষম। এমত অবস্থায় আমাদের এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন যা প্রচলিত ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে। দূরশিক্ষাব্যবস্থাই এর বিকল্প।

দূরশিক্ষার গুণগত মান (Quality of Distance Education)

জনগণের একটা বড়ো অংশ শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির কথা বলেন। মানের ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আছে যা আন্তর্জাতিক গুণমান সম্পন্ন। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানে খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীই ভরতি হওয়ার সুযোগ পায়। এ ব্যতীত উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ শহরে বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নিম্নমানের শিক্ষা নিয়েই গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই কারণেই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সর্বত্র এক নয়। কয়েকটি খুবই উচ্চমানের, আবার বেশির ভাগের মান সাধারণ। এমনকী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মানের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মানের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হল গুণমানের প্রতি লক্ষ না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও, ছাত্রপ্রতি গড় ব্যয় নিম্নাভিমুখী। বর্তমানে প্রয়োজন হল শিক্ষার গড় মান বৃদ্ধি করা এবং আরও বেশি সংখ্যায় ছাত্ররা যাতে উন্নত মানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা নেওয়া। এই ব্যাপারে দূরশিক্ষা একটি আদর্শ বিকল্প।

দূরশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Distance Education)

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আর-একটি বিরূপ সমালোচনা হল এর প্রাসঙ্গিকতা। অনেকে অভিযোগ করে বলেন, উচ্চশিক্ষা শুধু যে উচ্চবিত্তদের করায়ত্ত তাই নয়, সামাজিক চাহিদার দিক থেকেও এর গুরুত্ব ক্ষীণ। এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য না হলেও এর আংশিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। দেশের অগ্রগতিকে স্বাগত জানাতে আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাদান। অথচ আমরা মানবিক বিদ্যার সুযোগ দিচ্ছি। যেখানে আমাদের প্রয়োজন অধিক সংখ্যায় মাঝারি মানের প্রযুক্তিবিদ সেখানে আমরা তৈরি করছি অল্পসংখ্যক স্নাতক-প্রযুক্তিবিদ এবং চিকিৎসক। যেখানে আমাদের প্রয়োজন হল জ্ঞান ও দক্ষতাকে সাম্প্রতিকতম করে তোলার জন্য প্রবহমান শিক্ষার সেখানে আমরা সাধারণ শিক্ষার সুযোগ তৈরি করছি। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় প্রবহমান শিক্ষা এবং শিক্ষার সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার অন্বেষণ করতে হবে। এইরকম একটি ব্যবস্থা যা সারা বিশ্বের নজর আকর্ষণ করেছে তা হল দূরশিক্ষাব্যবস্থা। আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে বর্তমান প্রযুক্তির সহযোগিতায় দূরশিক্ষার মাধ্যমে আমাদের পক্ষে অধিক সংখ্যক জনগণের নিকট শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষার মানের উন্নয়ন এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে।

দূরাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

দূরাগত শিক্ষা প্রথাবহির্ভূত বা বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. **প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের সুযোগ অল্প:** দূরাগত শিক্ষায় শিক্ষক অতি অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ পান।
2. **মৌখিক নির্দেশিকা দান:** এই শিক্ষায় অল্প সময়ের মৌখিক নির্দেশিকা দেওয়া হয় এবং ওইসব নির্দেশ অনুযায়ী পঠনপাঠন করলে শিক্ষার্থীরা সঠিকপথে চালিত হতে পারে। নির্দিষ্ট কয়েকদিন অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।
3. **নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ অপ্রয়োজনীয়:** এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি প্রয়োজন না হওয়ায় কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ বা বক্তৃতাকক্ষ দরকার হয় না।
4. **ফিডব্যাকের অভাব:** শিক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থী কতখানি শিখতে পেরেছে সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয় না। শ্রেণি পঠনপাঠন না হওয়ার ফলে শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ায় যে ফিডব্যাকের সুযোগ আছে তা এখানে অনুপস্থিত।
5. **ব্যক্তিগত শিখন:** এই শিক্ষায় শিখন ব্যক্তিগতভাবে হয়, দলগতভাবে হয় না।
6. **বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ:** এই ধরনের শিক্ষায় বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন—রেডিয়ো, টেলিভিশন, ডাক পরিসেবা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়।
7. **আংশিক সময়ের শিক্ষা:** এই শিক্ষায় শিখনের সময় নির্দিষ্ট নয়। শিক্ষার্থী তার সুযোগ মতো সময় ঠিক করে নেয়। এজন্যই এটিকে আংশিক সময়ের শিক্ষা বলা হয়।
8. **ইচ্ছামতো বিষয় নির্বাচন:** এখানে শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামতো বিষয় নির্বাচন করতে পারে।
9. **খরচ অল্প:** এই শিক্ষাব্যবস্থায় পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে কম। পাঠ্যবিষয় বা মডিউল শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করা হয়, প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ভাড়াও লাগে না। এইসব কারণে অল্প খরচে এই শিক্ষা সম্ভব।
10. **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হওয়ার সুফল:** এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।
11. **শিক্ষার্থীর চাহিদা ও দাবি পূরণ:** এই শিক্ষার পাঠক্রম, পঠনপাঠন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি যথেষ্ট নমনীয় হওয়ার ফলে সব ধরনের শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।
12. **জীবিকাকেন্দ্রিক শিক্ষা:** এক্ষেত্রে পাঠক্রম সাধারণত জীবিকাকেন্দ্রিক হয়।
13. **ভরতির ক্ষেত্রে নমনীয়তা:** এই শিক্ষাব্যবস্থায় ভরতির শর্ত অনেকটাই নমনীয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কোনো বিশেষ কোর্সে ভরতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না।
14. **ব্যক্তিসামর্থ্যের গুরুত্ব:** এইপ্রকার শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী নিজস্ব গতিতে এগোনোর সুযোগ পায়। বাইরে থেকে কোনো কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

15. **প্রথাগত শিক্ষার সমতুল ডিগ্রি:** যারা কোনোদিন প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না, সেইসব শিক্ষার্থী এইপ্রকার শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে সমতুল ডিগ্রি লাভের সুযোগ পায়।
16. **প্রত্যন্ত এবং দূরাগত শিক্ষার্থীদের সুযোগ:** প্রত্যন্ত এবং দূরাগত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়।
17. **শিক্ষা পরিচালনায় ব্যয় কম:** নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন না থাকায়, পুরো সময়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন না হওয়ার ফলে শিক্ষা পরিচালনায় ব্যয় কম।
18. **শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত নয়:** আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট না হওয়ায় প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী এই শিক্ষার সুযোগ পায়।

Dr. B. M. Bhalla-**এর মতে, দূরশিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—**

1. **নমনীয়তা:** এই শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা রয়েছে। এ ছাড়া এই শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় বা স্থানের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, শিক্ষার্থী তার সুবিধামতো স্থানে নিজের সময়মতো অধ্যয়ন করতে পারে।
2. **নন-ফর্মাল শিক্ষা:** একে নন-ফর্মাল শিক্ষাও বলা যেতে পারে। কারণ এটি প্রথাযুক্ত শিক্ষা নয়। এটি পত্রাচারের শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষণ, মুক্ত শিখন, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নামেও পরিচিত।
3. **পরোক্ষ শিক্ষা:** এটি হল পরোক্ষ শিক্ষা। এক্ষেত্রে মুখোমুখি শিক্ষার উপর গুরুত্ব নেই। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহপাঠী ও শিক্ষকের যোগাযোগ তেমন নেই। কেবলমাত্র ডাকযোগের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে।
4. **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক:** এই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও শিক্ষার্থীর সুবিধার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় অর্থাৎ এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
5. **সহজলভ্য:** যে জায়গায় স্কুল অথবা কলেজ নেই সেখানকার শিক্ষার্থীরাও দূরায়ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যেসব শিক্ষার্থী শারীরিক দিক থেকে দুর্বল বা মানসিক দিক থেকেও দুর্বল এবং যারা প্রথাগত শিক্ষাকেন্দ্রে যেতে পারে না তারাও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
6. **ডিগ্রির সুযোগ:** দূরায়ত শিক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পাওয়া যেতেও পারে আবার নাও পাওয়া যেতে পারে।
7. **কম খরচে শিক্ষা:** দূরায়ত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার তুলনায় অনেক কম খরচে সম্ভব।
8. **গণশিক্ষা:** দূরায়ত শিক্ষাকে গণশিক্ষাও বলা যেতে পারে। কারণ এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
9. **গণমাধ্যমের ব্যবহার:** দূরায়ত শিক্ষায় বিভিন্ন গণমাধ্যম যথা—রেডিয়ো, পত্রপত্রিকা, টিভি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

***Prof S S Chill*-এর মতে**

1. দূরায়ত শিক্ষা হল সারাজীবনের শিক্ষা।
2. শিক্ষার্থী বৃদ্ধ হোন অথবা যুবক হোন যে কেউ এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।
3. একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন কখনোই শেষ হতে পারে না। তাঁকে নতুন নতুন ধারণা, মতবাদ ও তত্ত্ব জানতে হয়। তাই এই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।
4. স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যে-কোনো স্তরেই দূরাগত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দূরাগত শিক্ষার মাধ্যমে—
   (a) যে-কোনো স্তরের শিক্ষার সুযোগ (উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত) পাওয়া যায়।
   (b) কম্পিউটার শিক্ষা বা কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যায়।
   (c) এর মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া হয়।
   (d) কোর্স পছন্দের ক্ষেত্রে নমনীয়তা রয়েছে।
   (e) মহিলাদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এমনকি যাঁরা পশ্চাৎপদ শ্রেণি থেকে এসেছেন ও যাঁদের বাবা-মা অশিক্ষিত তাঁদের এবং যে সমস্ত বাবা-মা তাঁদের মেয়েদের প্রথাযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতে আগ্রহী নন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।
   (f) ভরতির ক্ষেত্রে বাঁধাধরা কোনো নিয়ম নেই।
   (g) চাকুরিরত ব্যক্তিরা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়াতে পারেন এই শিক্ষার মাধ্যমে।
   (h) Drop-out শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে।
   (i) অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই শিক্ষা নিতে পারেন ও তাঁদের নিশ্চিন্ত অবসর সময় কাটানো সম্ভব হয়।
   (j) যাঁদের কোনো বিষয়ে শেখার আগ্রহ আছে তাঁরাও যে-কোনো বিষয় শিখতে পারেন।
   (k) বৃত্তিগত শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সুযোগ রয়েছে।
   (l) দূরাগত শিক্ষার মাধ্যমে স্ব-শিক্ষা সম্ভব ও নিজের মানসিক ও বৌদ্ধিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।
   (m) শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
   (n) সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব।
   (o) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কোনো অনুপাত নেই।
   (p) খুবই অল্পসংখ্যক পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হলেই চলে, তবে কিছু আংশিক সময়ের শিক্ষক দরকার।
   (q) এই ধরনের শিক্ষার জন্য কোনো Building, শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই।

দূরশিক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Distance Education)

বিভিন্ন ধরনের দূরাগত শিক্ষা রয়েছে। যেমন—(a) পত্রযোগে শিক্ষা, (b) বেতারের মাধ্যমে শিক্ষা, (c) দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা এবং (d) মুক্ত শিক্ষা।

*(a) **পত্রযোগে শিক্ষা***

সবচেয়ে সহজতম দূরায়ত শিক্ষা। এক্ষেত্রে যে-কোনো কোর্সের (স্নাতক) বিষয়সূচি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্থিরীকৃত। Course material-কে কয়েকটি Module-এ ভাগ করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। Course material-এ নিজস্ব প্রশ্ন থাকে যার উত্তর শিক্ষার্থীরা পুনরায় পাঠিয়ে দেয়। প্রয়োজনে Centre মারফত অন্য কোনো নির্দেশ থাকলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও Periodic class-এর ব্যবস্থাও করা হয়। এর প্রধান অসুবিধা, শিক্ষার মাধ্যম হল একটিই। ফলে অনেক শিক্ষার্থী অসুবিধায় পড়ে। এ ছাড়া অনেক সময় ডাকবিভাগ মারফত সঠিক সময়ে Course material এসে পৌঁছোয় না।

1961 খ্রিস্টাব্দে CABE পত্রযোগে শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই সময়ের UGC-র চেয়ারম্যান ড. ভি এস কোঠারির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেন। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী *K L Shrimali* উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলির উল্লেখ করেন। যেমন—

(i) ভারতের জাতীয় উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অল্প ব্যয় অধিক কার্যকরী শিক্ষা সরবরাহ করে।

(ii) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ যাঁরা ব্যক্তিগত বা আর্থিক কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন না তাঁদের জন্য সুযোগ তৈরি করা।

(iii) যাঁরা চাকুরিরত তাঁদের চাকরির কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না করে পত্রযোগে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা।

UGC-ও নিম্নোক্ত শ্রেণির ছাত্ররা উপকৃত হবে এই প্রত্যাশা করে পত্রযোগে শিক্ষা প্রচলন করতে উৎসাহ দান করে।

(1) যে সমস্ত শিক্ষার্থী আর্থিক বা অন্যান্য কারণে প্রথাগত শিক্ষা ছেড়ে এসেছে।

(2) দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্র।

(3) যেসব ছাত্র উপযুক্ত প্রবণতা এবং প্রেষণার অভাবে প্রথাগত শিক্ষা ত্যাগ করেছে কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুনরায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়েছে।

(4) উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা আছে অথচ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি হওয়ার সুযোগ পায়নি তাদের জন্য।

(5) যেসব ব্যক্তি শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বলে মনে করেন এবং নিজ বিষয়ে আজীবন পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক বা অন্য বিষয়ে জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য। চাকুরিরত ব্যক্তিগণের পত্রযোগে শিক্ষার সম্ভাবনা উপলব্ধি করে শিক্ষা কমিশন (1964-66) এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন—

(a) অন্যান্য দেশ যেমন—USA, সুইডেন, জাপান, USSR এবং অস্ট্রেলিয়া পত্রযোগে শিক্ষার সফলতা অর্জন করেছে তেমনিভাবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(b) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা অপেক্ষা পত্রযোগে শিক্ষাব্যবস্থা নিম্নমানের—এ ধারণার কোনো ভিত্তি নেই।

(c) পত্রযোগে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আংশিক সময়ের শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করতে হবে এবং এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(d) এই ব্যবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এককালীন ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস করবে।

(e) যে সমস্ত ব্যক্তি আর্থিক কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরে চাকুরি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছাকে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে পারে।

কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কয়েক বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান পত্রযোগে শিক্ষা চালু করে। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পত্রযোগে BA, BCom, BEd, LLB, MA, MCom, MEd ইত্যাদি কোর্স চালু হয়। পেশাগত কোর্স হিসাবে BTech, BE, MCA, BCA, MBA পঠনপাঠনের ব্যবস্থা চালু হয়।

পত্রযোগে শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Disadvantages of Correspondence Education) যথেষ্ট সাফল্য সত্ত্বেও পত্রযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও দেখা যায়। এ ব্যাপারে UGC-র ***Mr. Muley***-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি সমীক্ষা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল পত্রযোগে শিক্ষার কাজকর্মের মূল্যায়ন করা এবং এর ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা। উক্ত কমিটির রিপোর্টে এর ত্রুটিগুলি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

1. পত্রযোগে শিক্ষাকে হেয় চোখে দেখা হয় এবং দ্বিতীয় স্তরের হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
2. অধিকাংশ পত্রযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মানবিক বিষয় অর্থাৎ কলা বিভাগের বিষয়গুলিতে শিক্ষার সুযোগ আছে। বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ খুব কম।
3. প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব কোর্সের সুযোগ আছে এখানেও সেইসব কোর্স চালু আছে। যার ফলে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে ভরতি ও পরীক্ষায় যে ধরনের কঠোরতা এবং অনমনীয়তা দেখা যায় এ ক্ষেত্রেও তা বর্তমান।

4. এদের অধিকাংশই একটি মাত্র মাধ্যম ব্যবহার করে, বহু মাধ্যম নয়।
5. এদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই শক্তিশালী ছাত্র পরিসেবা কর্মসূচি, যেমন—স্টাডি কেন্দ্র, কাউন্সেলিং, লাইব্রেরি ইত্যাদি।
6. গতানুগতিক মূল্যায়ন কর্মসূচি এবং যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন দুর্বল পরিমাপ ব্যবস্থা।
7. কোর্সগুলির পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানসম্মত নয়। চাহিদা এবং উপযুক্ত প্রস্তুতি আছে কিনা তা বিচার না করেই কোর্স চালু করা হয়।
8. আমাদের দেশের খুব অল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পত্রযোগে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করে। UGC-ও যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করে না।
9. কেন্দ্রের ও রাজ্যের মধ্যে পত্রযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, যার ফলে কোর্সগুলির ডুপ্লিকেশনের সম্ভাবনা দেখা যায়।
10. বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রযোগে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পদ স্থায়ী নয় এবং তাঁরা এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞও নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটিতে তাঁদের বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।

(b) বেতার

বেতারের মাধ্যমে শিক্ষাকে দূর শিক্ষার একটি শ্রেণি না বলে একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যম বলাই যুক্তিযুক্ত। বেতারের মাধ্যমে শিক্ষামূলক কর্মসূচির শুরু হয় 1920 খ্রিস্টাব্দে যখন BBC বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সম্প্রচার চালু করে। 1937 খ্রিস্টাব্দে AIR কলকাতা কেন্দ্র থেকে সংগঠিত উপায়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্মসূচি চালু করে। পরবর্তী সময়ে দিল্লি, মুম্বই, মাদ্রাজের AIR-এর কেন্দ্রের থেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক কর্মসূচি সম্প্রচারিত হয়। বর্তমানে AIR-এর মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষামূলক কর্মসূচি সম্প্রচারে বিভিন্ন সংস্থা সহযোগিতা করেছে। এর মধ্যে NCERT-র CIET (Central Institute of Educational Technology) বিভাগের বিশেষ ভূমিকা আছে। সংস্থা নিয়মিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর্মসূচি প্রস্তুত করছে।

1956 খ্রিস্টাব্দের গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বেতার শুরু হয়। এই কর্মসূচিটির নাম দেওয়া হয় Radio forum। গ্রামবাসীরা 30 মিনিটের জন্য বেতার কর্মসূচি শোনার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন্ কর্মসূচিকে গ্রামে চালু করা যেতে পারে।

গ্রামীণ সামাজিক পরিবর্তনকে আরও কার্যকরী করে তুলতে এবং এক্ষেত্রে বেতারের ভূমিকাকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য AIR 1966 খ্রিস্টাব্দে 'Forum of Home Broadcast' নামে এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর লক্ষ্য ছিল কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহ করা। যার ফলে তারা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ বোধ করে।

সংগঠিতভাবে AIR তার কর্মসূচি বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেতার কর্মসূচি চালু করে। 1965 খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়ের উপর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা এর প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করেনি। এ সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও প্রসারিত এবং সমাজের সকল স্তরের জনগণ যাতে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে সেজন্য বেতারের মাধ্যমে শিক্ষামূলক কর্মসূচিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বিভিন্ন কোর্সের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি প্রস্তুতের দায়িত্ব থাকবে পণ্ডিতগণের উপর এবং বেতার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে বেতার সম্প্রচারের সুবিধা হল

1. বিনিয়োগ অল্প, পরিচালনা ব্যয় কম এবং এর ব্যাপকতা।
2. অনেক সহজলভ্য।
3. শিক্ষার্থীরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে।
4. চিন্তা উদ্রেককারী।
5. আকর্ষণীয় ও প্রেরণা সঞ্চারকারী।
6. উৎপাদন সহজসাধ্য।

বেতারের সীমাবদ্ধতা

1. নমনীয়তার অভাব, শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়া একমুখী। শিক্ষক-শিক্ষিকার মিথস্ক্রিয়ার সুযোগের অভাব।
2. শিক্ষার্থীর মধ্যে অস্পষ্টতা দেখা দিলে তার সমাধানের সুযোগ নেই।
3. শিক্ষামূলক কর্মসূচি প্রস্তুতের জন্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন।
4. ভারতের মতো অসম জনসংযোগ বহুল দেশে (যেমন—নিরক্ষর, পাঠ-ত্যাগকারী, বেকার ইত্যাদি) বেতারের ব্যবহার যথেষ্ট কার্যকরী নয়।
5. যেসব ব্যক্তি বেতারে সম্প্রচারের জন্য কোর্স থেকে বেতার সম্প্রচারের বিষয় প্রস্তুত করে, শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাদের প্রায়শ থাকে না।

(c) *দূরদর্শন*

বেতারের মতো দূরদর্শনের শিক্ষামূলক সম্প্রচারের ব্যবস্থা দূরশিক্ষার পৃথক একটি শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না বরং তাকে দূরশিক্ষার অন্যতম বৈদ্যুতিন মাধ্যম বলা যায়। যা হোক দূরদর্শনে শিক্ষামূলক সম্প্রচারসূচি প্রথম প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্রে চালু হয় 1961 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। দিল্লিতে দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষামূলক কর্মসূচি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রচলন শুরু হয়। একাদশ শ্রেণিতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিতের উপর সপ্তাহে 3টি ক্লাস এবং হিন্দি ও ইংরেজির উপর সপ্তাহে 1টি ক্লাস চালু হয়। অতঃপর অন্যান্য রাজ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে দূরদর্শন কর্মসূচি বিস্তার লাভ করে। বিদ্যালয়ে দূরদর্শন কর্মসূচির সফলতার পরিচয় পেয়ে 1966 খ্রিস্টাব্দের 26 জানুয়ারি কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত

তথ্যাদি সরবরাহের জন্য 'কৃষিদর্শন' নামে একটি দূরশিক্ষা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় এই প্রকল্পটির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

1975 খ্রিস্টাব্দের 1 আগস্ট 1 বছরের জন্য SITE (Statellite Instructional Technology Experiment) প্রকল্প চালু হয়। এটি একটি বৃহৎ প্রকল্প এবং দূরশিক্ষার কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর দুটি উদ্দেশ্য ছিল।

(ক) কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক কর্মসূচি। সন্ধ্যায় কমিউনিটির সকলের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে যেমন—স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক শিক্ষার উপরে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদর্শিত হয়।

(খ) 6 থেকে 12 বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য হিন্দি, কানাড়া, উড়িয়া, তেলুগুর উপর 22 মিনিট 30 সেকেন্ডের একটি বিদ্যালয় কর্মসূচি প্রচার করা হয়।

1977 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নতুন SITE প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল—

(ক) গ্রামীণ জনগণকে কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করা।

(খ) জাতীয় ও প্রাক্ষোভিক সংহতি।

(গ) গ্রামীণ শিশুদের শিক্ষা ও সুস্থ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা।

শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে 1982 খ্রিস্টাব্দের 6 সেপ্টেম্বর INSAT-1A চালু হয়। 1983 খ্রিস্টাব্দের 30 আগস্ট INSAT-1B চালু হয়। INSAT কার্যসূচির মূল লক্ষ্য হল দূরদর্শনের সাহায্যে গ্রাম এবং পিছিয়ে পড়ার অঞ্চলগুলির জনগণকে জাতির মূল স্রোতে নিয়ে আসা, গ্রামের জনগণকে কৃষি উৎপাদন, শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, সাম্প্রতিক তথ্য এবং সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতন করা।

1984 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট UGC 'Currently hide Class-room' নামে UGC-INSAT কর্মসূচি চালু করে।

সুবিধা

1. শিক্ষা ও সামাজিক সমতা আনয়নে সাহায্য করে।
2. উন্নত পাঠদান।
3. শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস।
4. নমনীয়তা।
5. অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষকের ব্যবহার।
6. বিনিয়োগের উপযুক্ত ব্যবহার।
7. বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণ।
8. শ্রবণ ও দর্শনের সমন্বয়।
9. গণশিক্ষা।

Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in

সীমাবদ্ধতা

1. একমুখী যোগাযোগ।
2. শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন না।
3. ব্যয়বহুল।
4. সমন্বয়ের অসুবিধা।

(d) মুক্তশিক্ষা

মুক্তশিক্ষা দূরশিক্ষার একটি শ্রেণি। 'মুক্ত' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এই শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায়। কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয়তাই হল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দূরাগত শিক্ষার সুবিধা

প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে দূরাগত শিক্ষার উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই শিক্ষার বিশেষ কয়েকটি সুবিধা আছে যা নীচে উল্লেখ করা হল—

1. **সবার জন্যে শিক্ষা:** দূরাগত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত। যে-কোনো বয়সের যে-কোনো মানের উৎসুক শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষায় অংশ নিতে পারে। যেমন—চাকুরিরত ব্যক্তি, গৃহিণী, অসমর্থ ব্যক্তি, বিদ্যালয়ছুট ছেলেমেয়ে প্রভৃতি সকলেই এই শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।
2. **জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন:** দূরাগত শিক্ষা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দেশের যে সমস্ত মানুষ গতানুগতিক প্রথাগত শিক্ষায় অংশ নিতে পারে না, তারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের মানবসম্পদ বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নেয়।
3. **অবসরকালীন শিক্ষা :** দূরাগত শিক্ষার আর-একটি সুবিধা হল এখানে শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক শিক্ষার মতো প্রতিদিন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় না। তারা যে-কোনো কাজের ফাঁকে পড়াশোনা করে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা লাভের সুযোগ পায়।
4. **ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য:** দূরাগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা বিশ্রাম উপভোগ করে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষালয়ে উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা থাকে না।
5. **নমনীয় পদ্ধতি:** দূরাগত শিক্ষার পদ্ধতি যথেষ্ট নমনীয়। প্রথাগত শিক্ষার মতো শিক্ষাদানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয় না।
6. **মেধার ব্যবহার:** বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য যেসব মেধাবী ছেলেমেয়ে প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থা সেইসব শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

7. **ব্যক্তি শিখনে আত্মনির্ভর হয়:** এই শিক্ষায় ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় শিক্ষালাভ করে। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু নিজে পড়ে বোঝার চেষ্টা করে, ফলে শিক্ষার্থী শিখনে আত্মনির্ভর হয়।
8. **প্রস্তুত বিষয়বস্তুর সুযোগ:** দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা পাঠ্য বিষয় ছোটো ছোটো মডিউলের মাধ্যমে প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী প্রস্তুত বিষয়বস্তুই পায়।
9. **ভরতির সুযোগ:** প্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেক সময় যোগ্য শিক্ষার্থীরাও ভরতির সুযোগ পায় না। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। যত খুশি শিক্ষার্থী একই শিক্ষাবর্ষে ভরতি হতে পারে। ফলে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পায়।
10. **পাঠ্যবিষয়বস্তুর মান:** বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা দূরাগত শিক্ষার পাঠ্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং সেগুলির মান যথেষ্ট উন্নত হয়।
11. **পাঠক্রমের বৈচিত্র্য:** দূরশিক্ষার মাধ্যমে নানান বিষয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন—বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, পেশাগত শিক্ষা ইত্যাদি। অর্থাৎ এই শিক্ষার পাঠক্রম যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় হয়।
12. **গণমাধ্যমের সাহায্য:** বেতার, দূরদর্শন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী শিক্ষা পেতে পারে।
13. **কম খরচের শিক্ষা:** দূরশিক্ষায় স্থায়ী শিক্ষকের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। আংশিক সময়ের শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায়। এ ছাড়া নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না, ফলে শিক্ষার খরচ কম লাগে। শিক্ষার্থীরাও কম খরচে শিক্ষার সুযোগ পায়।
14. **বিশৃঙ্খলাহীন শিক্ষা:** দূরশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে দিনের পর দিন কোনো শিক্ষালয়ে উপস্থিত হয় না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ের কারণে কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটে না।
15. **অভিজ্ঞ শিক্ষকের সান্নিধ্য:** দূরশিক্ষার কনট্যাক্ট প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকের সান্নিধ্য পায়।
16. **জাতীয় সংহতি বিকাশে সহায়তা:** এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে জাতীয় সংহতির বোধ গড়ে ওঠে।
17. **উচ্চশিক্ষার সহযোগী শিক্ষা:** দূরশিক্ষা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে।
18. **পরিপূরক শিক্ষাপদ্ধতি:** দূরশিক্ষা গতানুগতিক প্রথাগত শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে সব মানুষের কাছ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করে।

ভারতে দূরাগত শিক্ষার সম্ভাবনা

ভারতে দূরাগত শিক্ষা সম্প্রতি চালু হলেও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। ভারতে এখনও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীদের একটি বড়ো অংশ উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের কাছে দূরাগত শিক্ষা ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। এইজন্যই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে। পৃথকভাবে স্থাপিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়। দূরাগত শিক্ষার সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলেই এই শিক্ষার এত দ্রুত প্রসার সম্ভব হয়েছে। আসলে ভারতের মতো একটি দরিদ্র তথা জনবহুল দেশের পক্ষে এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার অনেক বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষা অভিলাষীদের সংখ্যা এদেশে এত বেশি যে প্রথাগতভাবে সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে একমাত্র দূরাগত শিক্ষাই জনগণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দূরাগত শিক্ষা কেবল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও দূরাগত শিক্ষা ক্রমশ বিস্তারলাভ করেছে।

ভারতে দূরাগত শিক্ষার পটভূমি

ভারতে দূরশিক্ষা সর্বপ্রথম চালু হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। 1962 খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় করেস্পন্ডেন্স কোর্স চালু করে। 1982 খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের মধ্যে প্রথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Open University) স্থাপিত হয়। এরপর 1985 খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে আইন পাস করে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (Central Board of Secondary Education) নতুন দিল্লিতে 1979 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School) প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতরের অধীনে এই সংসদ একটি স্বশাসিত সংস্থা। ভারতের এই সংস্থা সর্বপ্রথম করেস্পন্ডেন্স কোর্সের মাধ্যমে বিদ্যালয়-শিক্ষার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে আন্নামালাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, সিকিম-মণিপাল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরাগত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও দূর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল উচ্চশিক্ষার আরও প্রসার ঘটানো। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন কারণে দেশের মানুষের মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের এক প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে দূরশিক্ষার একটা পটভূমি তৈরি হয়।

ভারতে দূরাগত শিক্ষার উদ্দেশ্য

ভারতে দূরাগত শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এই ধরনের শিক্ষার কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য আজ বিশ্বব্যাপী দূরাগত শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এই ধরনের শিক্ষার কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য থাকলেও দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু পার্থক্যও লক্ষ করা যায়।

1. **বিদ্যালয়ছুট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সহায়তা:** যেসব শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা থেকে কোনো না কোনো কারণে বঞ্চিত হয়েছে, দূরাগত শিক্ষা সেইসব শিক্ষার্থীর শিক্ষার চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়। বিদ্যালয়ছুট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।
2. **আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণির ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান:** আর্থিক কারণে ভারতে বহু ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় অংশ নিতে পারে না। দূরাগত শিক্ষা আর্থসামাজিক দিক থেকে অনুন্নত সেইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে।
3. **সকল আগ্রহী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান:** এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে সব আগ্রহী শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।
4. **কর্মরত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ:** বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ব্যক্তিরা দূরাগত শিক্ষার সাহায্যে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান।
5. **শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নয়নে সহায়তা:** দূরাগত শিক্ষার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নয়নে সহায়তা করা।
6. **কৃষিজীবীদের সহায়তা:** এই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস, ফসল সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করে।
7. **বয়স্ক এবং সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষার সুযোগ:** দূরশিক্ষা বয়স্ক মানুষ এবং সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।
8. **নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার চাপ হ্রাস:** এই শিক্ষার আর-একটি উদ্দেশ্য হল প্রথাগত শিক্ষার উপর থেকে চাপ কমানো। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গতানুগতিক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের এত ভিড় হয় যে অনেক সময় বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ভরতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। দূরশিক্ষা সেইসব ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেয়।
9. **মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ:** দূরশিক্ষার দ্বারা ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার শিক্ষা নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বহু শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করে।

10. **জ্ঞানের পার্থক্য হ্রাস:** দূর শিক্ষায় বিভিন্ন কৌশলের দ্বারা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে (Private) পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পার্থক্য কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।
11. **প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার:** দূর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছোয়। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে আসতে হয় না। ফলে যে অঞ্চলে স্কুল-কলেজের সেরকম সুযোগসুবিধা নেই, সেখানকার মানুষের পক্ষেও শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়।

দূরাগত শিক্ষার সমস্যা

দূরাগত শিক্ষার যেমন সুবিধা আছে তেমনি কিছু সমস্যাও আছে। সেইসব সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

1. **সম্পাদক ও লেখক নির্বাচনের সমস্যা:** দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল সম্পাদক নির্বাচন ও স্টাডি মেটিরিয়াল প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত লেখক-লেখিকার নির্বাচন। কারণ, পাঠক্রম নির্বাচন ও সেই পাঠক্রম অনুযায়ী উপযুক্ত পাঠ্য বিষয়বস্তু প্রস্তুতির উপর এই শিক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে।
2. **অনুবাদজনিত সমস্যা:** দূরাগত শিক্ষার জন্য বিষয়বস্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করা প্রয়োজন। ইংরেজি বা হিন্দি থেকে নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ না করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই আঞ্চলিক ভাষায় বিষয়বস্তু রচনা করা প্রয়োজন।
3. **পাঠ্য বিষয়বস্তু মুদ্রণের সমস্যা:** দূরাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু মুদ্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মুদ্রণে ভুল থাকলে শিক্ষার্থীরা ওই ভুলই সঠিক ভেবে অধ্যয়ন করে। ফলে তাদের শিক্ষায় ত্রুটি থেকে যায়।
4. **তথ্য সরবরাহজনিত সমস্যা:** দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কোর্সের সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা কোর্স শুরু সম্পর্কে ঘোষণা করা হলে তা যে সব ছাত্রছাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা নয়। ফলে অনেকেই এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।
5. **পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধার সমস্যা:** অধিকাংশ দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে না। নির্দিষ্ট অঞ্চলের মহাবিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে ও তাদের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে পঠনপাঠন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতির কাজ সম্পাদন করে। এতে অনেক সমস্যা দেখা যায়।
6. **ডাকবিভাগের সঙ্গে সমন্বয়জনিত সমস্যা:** দূরাগত শিক্ষায় স্টাডি মেটিরিয়াল মূলত ডাকযোগে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষের

সঙ্গে দূরশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা ঠিক সময়ে এই পাঠ্যপুস্তিকা হাতে পায় না।
7. **শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশজনিত সমস্যা:** দূরশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তা অনেকেই বুঝে উঠতে পারে না। তাই সরল, বোধগম্যভাবে এই নির্দেশিকাগুলি প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
8. **নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা:** দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর। এদের মধ্যে একটি হল নিয়মিত পঠনপাঠন এবং অন্যটি হল সততার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধরনের উত্তরপত্র (Assignment) লেখা সম্পূর্ণ করা। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই এই দুটি বিষয় অবহেলিত হয়।
9. **গ্রহণযোগ্যতার সমস্যা:** মুখোমুখি শিক্ষাদানের বিকল্প হিসেবে দূরাগত শিক্ষা এখনও জনমানসে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। আজও আমাদের দেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কাছে দূরাগত শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষা হিসাবে বিবেচিত হয়।
10. **প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবজনিত সমস্যা:** উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড়ো সমস্যা। বেশিরভাগ দূরাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকর্মীরা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা করেস্পন্ডেন্স কোর্সের শিক্ষার পরিচালনা সম্পর্কিত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথাগত শিক্ষার কাজকর্মের সঙ্গে অভ্যস্ত থাকায় তারা দূরাগত শিক্ষার ব্যাপারটি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না।
11. **গণমাধ্যমজনিত সমস্যা:** দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা হল গণমাধ্যমজনিত সমস্যা। বর্তমানে রেডিয়ো ও দূরদর্শনে বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানের সময়সীমা খুবই কম থাকে। ফলে ওই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নানারকম বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় না।
12. **ব্যাবহারিক শিক্ষার অভাব:** দূরশিক্ষায় ব্যাবহারিক বিষয়গুলি (Practical Subjects) যথাযথভাবে পঠনপাঠনের সুযোগ কম থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাত্র এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে কোনোরকমে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়গুলি অভ্যাস করানো হয়, ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যাবহারিক বিষয়গুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে না।

দূরাগত শিক্ষা ও প্রথাগত শিক্ষার পার্থক্য

দূরাগত শিক্ষা	প্রথাগত শিক্ষা
1. দূরাগত শিক্ষা শিক্ষার্থীর চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়।	1. প্রথাগত শিক্ষায় পাঠক্রম ও প্রতিষ্ঠানের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
2. এটি গৃহনির্ভর শিক্ষা।	2. এটি বিদ্যালয়নির্ভর শিক্ষা।
3. অনেক বছর ধরে কোনো একটি কোর্স সম্পূর্ণ করা যায়। যে-কোনো বয়সের ব্যক্তি এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।	3. এখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো একটি কোর্স শেষ করতে হয় এবং ভরতি হওয়ারও নির্দিষ্ট বয়স আছে।
4. এটি একপ্রকার পরোক্ষ শিক্ষাপ্রণালী, কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সরাসরি সংযোগ ঘটে না।	4. এটি প্রত্যক্ষ শিক্ষাপ্রণালী। এখানে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায়।
5. এই শিক্ষায় কম্পিউটার, বেতার এবং দূরদর্শন প্রভৃতি গণমাধ্যমের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।	5. এই শিক্ষায় গণমাধ্যমের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই।
6. এটি আংশিক সময়ের শিক্ষা।	6. এটি সম্পূর্ণ সময়ের শিক্ষা।
7. এতে খরচ তুলনামূলকভাবে কম।	7. এতে খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।
8. এই শিক্ষায় প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যথেষ্ট নমনীয়।	8. এই শিক্ষায় ভরতির যোগ্যতা নির্দিষ্ট।
9. এই শিক্ষা ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা প্রদান করে, আবার অনেক সময় করে না।	9. এটি সর্বদাই ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা প্রদান করে।
10. এটি একটি ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি।	10. এটি একটি দলগত শিক্ষাপদ্ধতি।
11. শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে খুব একটা সংযোগসাধনের সুযোগ পায় না।	11. এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়।
12. এইপ্রকার শিক্ষা সব স্থানেই পাওয়া যায়, যেখানে স্কুলকলেজ নেই সেখানেও।	12. যেখানে স্কুল-কলেজ নেই সেখানে এই শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।
13. এইপ্রকার শিক্ষার লক্ষ্য সেইসব শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করা, যারা এই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী।	13. এই শিক্ষা গতানুগতিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।
14. ভগ্নস্বাস্থ্য বা কোনো প্রতিকূল দৈহিক বা মানসিক সমস্যার কারণে যারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না তারাও এই শিক্ষার সুযোগ পায়।	14. শিক্ষার্থী যে-কোনো কারণেই হোক, বিদ্যালয়ে যেতে না পারলে, এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

(1) মুক্ত শিক্ষা (Open Education)

মুক্ত শিক্ষা দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি শ্রেণি যেখানে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে পাঠ গ্রহণের পরিবর্তে নিজেদের সুবিধামতো দূরের কোনো স্থানে পড়াশোনার সুযোগ পায়। 'প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশান 1992' তে মুক্ত শিক্ষার ব্যাখ্যায় বলা হয়—মুক্ত শিক্ষা হল শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টিকারী, সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, অর্থ সাশ্রয়কারী, তাৎপর্যপূর্ণ এবং নমনীয় এক পদ্ধতিক শিক্ষাব্যবস্থা।

প্রায় ষাট বছর আগেও আমাদের দেশে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়-শিক্ষা গ্রহণ করেনি এমন শিক্ষার্থীদের ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষার ব্যবস্থা করত, যা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার সমতুল্য বলে গণ্য হত। তবে এই ব্যবস্থার কিছু সীমবদ্ধতা ছিল। যেমন—(1) বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, (2) সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুযোগ ছিল না এবং (3) এর মাধ্যম ছিল ইংরেজি। পরবর্তী সময়ে বর্তমানীন শিক্ষা, বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, প্রবহমান শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণের জন্য মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটে। 1968 এবং 1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতিতে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Open Education)

মুক্ত শিক্ষা দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি শ্রেণি যেখানে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের দায়িত্ব নেন। শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে পাঠ গ্রহণের পরিবর্তে নিজেদের সুবিধামতো দূরবর্তী কোনো স্থানে পড়াশোনার সুযোগ পায়। মুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল—

1. **সার্বিক সমাজকল্যাণ:** সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাগুলিকে পৌঁছে দেওয়া এবং সার্বিক সমাজকল্যাণের লক্ষ্য পূরণ করা।
2. **দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থার সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন:** দূরাগত শিক্ষা-ব্যবস্থাগুলিকে সহযোগিতা করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।
3. **অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে শিক্ষাদান:** সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। শিক্ষাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলে, সাধারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা।
4. **বিদ্যালয়ছুট ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে শিক্ষাদান:** বিদ্যালয়ছুট এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজনের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।
5. **ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও জাতীয় সংহতিতে সহায়তা:** প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সহায়তা করা এবং শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ প্রসারের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি স্থাপন করা।

6. **প্রতিবন্ধীদের জন্যে শিক্ষা:** শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষ, যাঁরা প্রথাগত নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবেন না তাঁদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
7. **সকলের জন্য উচ্চশিক্ষা:** মুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগসুবিধা আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় যেহেতু ভরতির বয়সসীমা, ক্লাসে নিয়মিত হাজিরা প্রভৃতি বিষয়ে কোনো কড়াকড়ি থাকে না, তাই অনেক বয়স্ক মানুষদের পক্ষেও বেশি বয়সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
8. **চাকরিরত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ:** চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিজের কাজের ক্ষেত্রে আরও বেশি যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
9. **বয়স্কদের জন্য উচ্চশিক্ষা:** বয়স্ক ব্যক্তিরাও যাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা।
10. **প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন তথ্যের সংযোজন হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক প্রথাগত শিক্ষা অতি সাম্প্রতিক বিষয়ে জনগণের চাহিদাকে পূরণ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রথাগত শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, সেক্ষেত্রে পরিপূরক শিক্ষা হিসেবে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
11. **উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণ:** উচ্চশিক্ষা বিষয়ে জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা সবক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই জনগণের সেই চাহিদা পূরণ করা মুক্ত শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।
12. **জীবনব্যাপী শিক্ষা:** হবি বা শখ হিসেবে বহু মানুষের মধ্যেই সারাজীবন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ দেখা যায়। জনগণের এই আগ্রহ পূরণ মুক্ত শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য।
13. **সুনাগরিকতার শিক্ষা:** বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সারাবছর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। ফলে পরবর্তীকালে তারা সুনাগরিক হিসাবে দেশের বা রাষ্ট্রের উন্নতিতে সক্রিয় অংশ নেয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র স্থূল বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলি বিভিন্নভাবে শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করে। এই কারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারলে এইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানবসমাজের বিবিধ কল্যাণসাধন করতে পারে।

মুক্ত শিক্ষার সুবিধা

যে সমস্ত সুবিধার জন্য মুক্ত শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার মধ্যে রয়েছে—

1. **প্রবেশের ক্ষেত্রে শিথিল নিয়ম:** মুক্ত শিক্ষার একটি বিশেষ সুবিধা হল ভরতি হওয়ার সময়ে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট কোনো পূর্ব যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। যেসব শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে পড়াশোনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই বা যারা কোনো শ্রেণিতে পড়া শুরু করার পর কোনো কারণে তা শেষ করতে পারেনি, তারাও এই শিক্ষায় অংশ নিতে পারে। এক্ষেত্রে বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। যে-কোনো বয়সের ব্যক্তিই এই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।
2. **নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা:** মুক্ত শিক্ষায় শিক্ষার্থী নিজের ক্ষমতা এবং গতি অনুযায়ী শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়।
3. **স্বাধীনতা ও নমনীয়তা:** মুক্ত শিক্ষায় যে-কোনো ধরনের কম্বিনেশনের কোর্স নির্বাচন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা পায়। গতানুগতিক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় এই শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশি নমনীয়।
4. **ক্রেডিট স্থানান্তর:** মুক্ত শিক্ষায় কোনো একটি শাখার ক্রেডিট বা প্রাপ্ত নম্বর অন্য শাখায় স্থানান্তরের সুবিধা থাকে। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ক্রেডিট স্থানান্তর করা যায়।
5. **গৃহনির্ভর শিক্ষা:** মুক্ত শিক্ষায় পঠনপাঠনের জন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা নেই। মূলত বাড়িতে বসেই শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারে।
6. **যোগাযোগ প্রযুক্তি:** মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিখনের জন্য শিক্ষকের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে টেলিফোন, বেতার, দূরদর্শন, টেপরেকর্ডার এবং ক্ষেত্রবিশেষে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হয়।
7. **শিখনের উন্নত গুণগত মান:** মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখনের গুণগত মান খুবই উন্নত হয়। কারণ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার কর্মসূচি এবং শিখনের বিষয়বস্তু (Study materials) দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা প্রস্তুত করানো হয়।
8. **অন্যান্য কর্মসূচির সুবিধা:** মুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে কেবল ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা করা হয় না, এসবের পাশাপাশি এক্সটেনশন এবং কন্টিনিউয়িং শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকে।
9. **শিক্ষার আর্থিক ব্যয় কম:** এই শিক্ষাব্যবস্থায় পুরো সময়ের পরিবর্তে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সেজন্য বেতন ও অন্যান্য খাতে অর্থব্যয় অনেক কম হয়। এ ছাড়া, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটির দিনে কনট্যাক্ট কর্মসূচিগুলি সম্পন্ন হওয়ার ফলে আলাদা করে বিদ্যালয়গৃহ ও শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন হয় না, ফলে আর্থিক ব্যয় অনেক কম হয়।

10. কর্মরত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ: মুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় এবং নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মুক্ত শিক্ষায় সবক্ষেত্রেই, যেমন—ভরতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, বিষয় নির্বাচন, কর্মসূচি শুরু এবং শেষ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটা শিথিল বা নমনীয় মনোভাব প্রকাশ পায়।

1. ভারতে মুক্ত বিদ্যালয় সংগঠন

গতানুগতিক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা বিদ্যালয়ছুট, কর্মরত ব্যক্তি বা সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি একটি নমনীয়, গ্রহণযোগ্য, প্রথামুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে মুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজের বাড়িতে বসে পড়াশোনার সুযোগ পায়। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক বহু বছর আগে থেকেই এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করলেও তা বাস্তবায়িত হয় অনেক পরে। 1974 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে NCERT-র ডিরেক্টর দিল্লিতে 'মুক্ত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি তাদের রিপোর্টে 14+ বছর বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাধ্যমিক স্তরে 'মুক্ত বিদ্যালয়' খোলার প্রস্তাব দেয়। 1975 থেকে 1978 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক, NCERT (National Council of Educational Research and Training) এবং CBSE (Central Board of Secondary Education) যৌথভাবে কয়েকটি সভার আয়োজন করে। 1978 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে CBSE মুক্ত বিদ্যালয় বিষয়ক এক আলোচনাসভার (seminar) ব্যবস্থা করে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের 18 জন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ তাতে অংশ নেন। আলোচনার ভিত্তিতে CBSE-এর চেয়ারম্যান মুক্ত বিদ্যালয়ের একটি খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করেন এবং ভারত সরকারের শিক্ষা দফতর সেটি মঞ্জুর করে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে 1979 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে CBSE (Central Board of Secondary Education) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে। 1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশক্রমে ভারত সরকারের মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক 1989 খ্রিস্টাব্দে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School) স্থাপন করেন।

জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার প্রসার এবং প্রবহমান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(খ) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

(গ) দূর শিক্ষা এবং মুক্ত শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যের বিস্তারের একটি কার্যকারি সংস্থা।

(ঘ) রাজ্যের দূর শিক্ষা এবং মুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।

বর্তমানে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে National Institute of Open School (NIOS)। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণির শিক্ষা এর মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে। মাধ্যম হল হিন্দি এবং ইংরেজি।

NIOS-এর লক্ষ্য হল শিক্ষাকে সর্বজনীন করা। সামাজিক সমতা, ন্যায়বিচার এবং শিক্ষিত সমাজ তৈরি করা। গ্রামের যুবক, বালিকা এবং নারী, তপশিলি জাতি ও উপজাতি, প্রতিবন্ধী এবং যুদ্ধ ফেরত সৈনিকেরা এখানে অগ্রাধিকার পায়। 1990 খ্রিস্টাব্দে প্রাক্‌স্নাতক স্তর পর্যন্ত সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা NIOS-কে দেওয়া হয়। 1991 খ্রিস্টাব্দে NIOS সর্বপ্রথম মাধ্যমিক এবং সিনিয়র মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা পরিচালনা করে।

NIOS দ্বারা দেয় সার্টিফিকেট Association of Indian University এবং UGC দ্বারা স্বীকৃত। ক্রমশ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বোর্ড, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং শ্রমমন্ত্রক দ্বারা স্বীকৃত হচ্ছে।

NIOS সাধারণ, বৃত্তিমূলক এবং বিভিন্ন বিষয়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করার কোর্সের সুযোগ দিয়ে থাকে। সাধারণ কোর্সের মধ্যে আছে ব্রিজ কোর্স, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক কোর্স। শিক্ষার্থী তার চাহিদা আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী সাধারণ কোর্স পছন্দ করতে পারে। একমাত্র বাধ্যবাধকতা হল ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দি বা ইংরেজি নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার 1997 খ্রিস্টাব্দে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয়' চালু করেন। 2001 খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় আইন অনুযায়ী এটি রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় নামে স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এখানে উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। 2003 খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযান যুক্ত করে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 30 জন 9—13 বছরের বালক-বালিকা হলেই স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহে, পঞ্চায়েতের বাড়িতে বা অন্যান্য কোনো উপযুক্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী দিনের যে-কোনো সময়ে তাদের একত্র করে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের (VI—VIII) শিক্ষা দান করা হয়। অন্যান্য বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের দ্বারা সপ্তাহে 4 দিন শ্রেণির কাজ করা হয়। এই ধরনের মুক্ত বিদ্যালয় চালুকরণে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের অনুমতি প্রয়োজন। এদের জন্য শিক্ষোপকরণ ইত্যাদি জেলা প্রকল্প কেন্দ্র (Districts Project Centre) থেকে সরবরাহ করা হয়।

এইভাবে যারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের পরীক্ষার দায়িত্ব রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় গ্রহণ করে। উত্তরপত্রের মূল্যায়ন অবশ্য কেন্দ্রের শিক্ষকরাই করে থাকেন। রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের আরও একটি দায়িত্ব হল এইসব কেন্দ্রের 'রিসোর্স পার্সন' তৈরি করা। এই রিসোর্স পার্সন আবার তৃণমূল স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেন, যারা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের দায়িত্বে থাকেন। যেসব শিক্ষার্থী সাফল্যের সঙ্গে পড়া শেষ করে তাদের শংসাপত্র

দেওয়া হয়। এই শংসাপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা প্রথাগত বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে সরাসরি ভরতি হতে পারে।

জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়গুলি আগে CBSE দ্বারা অনুমোদিত ছিল। 1991-92 খ্রিস্টাব্দে তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। এই মুক্ত বিদ্যালয় নিজস্ব পাঠ্যসূচি ও টেক্সটবই তৈরি করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের ব্রিজ কোর্স তৈরি করতে পারে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠক্রম বিশেষ করে স্বাস্থ্য, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় চালু করতে পারে। পরিচালনা, মূল্যায়ন, পাঠ্যসূচি ইত্যাদি ব্যাপারে IGNOU সহযোগিতা নিতে পারবে।

তবে এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান ত্রুটিগুলি হল ঃ

1. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগের তেমন সুযোগ নেই।
2. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর, কথাবার্তা ও আলোচনার সুযোগ তেমন নেই—যা কিছু ঘটে পত্রযোগে।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য অবশ্য চিন্তাভাবনা চলেছে। বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় Study Centre গড়ে উঠছে। Study Centre-গুলিতে রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলিতে Class-এর ব্যবস্থা আছে। যে-কোনো মুক্ত শিক্ষার রেজিস্টার্ড শিক্ষার্থী সেই Class-গুলিতে যোগ দিতে পারে।

ebook.dascoaching.in

মুক্ত বিদ্যালয় সংগঠনের লক্ষ্য

ভারতে মুক্ত বিদ্যালয় সংগঠনের লক্ষ্য হল—

1. কর্মরত বয়স্ক ব্যক্তি ও মহিলা, যারা কোনো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, তাদের জন্য এই শিক্ষা। তাদের জন্য একটি ব্রিজ কোর্স বা প্রস্তুতি কোর্সের ব্যবস্থাও করা হয়।
2. সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী যারা আর্থিক কারণে প্রথাগত শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারেনি
3. বিদ্যালয়ছুট ছেলেমেয়ে অর্থাৎ যারা মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়েছে।
4. দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা।
5. যেসব শিক্ষার্থী পেশাগত বা অন্য কোনো কারণে আরও শিক্ষালাভে আগ্রহী অথচ যাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা আর্থসামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে। Drop-out, অনগ্রসর জাতি ও উপজাতি, মহিলা, শ্রমজীবী, গৃহবধূ, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রত্যেকের পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছে।

এই কারণে বর্তমানে গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের দেশেও মুক্ত শিক্ষা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মুক্ত শিক্ষা দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

যোগ্যতা

1. **বয়স:** যেসব শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বছরের 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে 14 বছর বয়স সম্পূর্ণ করেছে তারা মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য মুক্ত বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারে।
2. **শিক্ষা:** যেসব ছেলেমেয়ে লিখতে, পড়তে এবং লেখা বিষয়বস্তু নিজে পড়ে বুঝতে পারে এবং যাদের পাটিগণিতে মোটামুটি ধারণা আছে—তাদের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি অনুত্তীর্ণদের একটা ব্রিজ কোর্সে ভরতি করা হয় এবং অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণদের সরাসরি মাধ্যমিক স্তরে ভরতি নেওয়া হয়।

পাঠ-পরিকল্পনা

মুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে। অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে থেকে একটি ভাষাসহ মোট পাঁচটি বিষয় নির্বাচন করতে হয়। সেই বিষয়গুলি হল—(1) হিন্দি, (2) ইংরেজি, (3) গণিত, (4) বিজ্ঞান, (5) সমাজবিজ্ঞান, (6) অর্থনীতি (7) বাণিজ্য, (8) গৃহবিজ্ঞান, (9) টাইপ রাইটিং ইংরেজি বা হিন্দি।

পরীক্ষা ব্যবস্থা

মুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরীক্ষাটি CBSE-র নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সমতুল হিসেবে বিবেচিত হয়। পরীক্ষাটিকে একসঙ্গে মোট পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কোনো শিক্ষার্থী মোট পাঁচটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে পর্ষদের পক্ষ থেকে সেকেন্ডারি স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পাঁচটি বিষয়ে একসঙ্গে বা পৃথক পৃথক সময়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তবে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে হয়। যদি কোনো শিক্ষার্থী পাঁচটি বিষয় ছাড়াও একটি অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণ করতে চায়, তাকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়। অতিরিক্ত বিষয়ে পাস করলে সার্টিফিকেটে তার উল্লেখ থাকে। প্রতি বছর মার্চের পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে ওই বছরই জুলাই/আগস্টের পরীক্ষায় সে একটি বা দুটি বিষয়ে আবার বসতে পারে। প্রতি 100 নম্বরের মধ্যে 50 নম্বর থাকে লিখিত পরীক্ষায় এবং বাকি 50 নম্বর থাকে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্টে। শিক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে আলাদা আলাদাভাবে যথাক্রমে 30% ও 40% নম্বর পেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হয়।

ভারতে মুক্ত বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য

1. **সব ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা:** মুক্ত বিদ্যালয় কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও জীবন উন্নয়নে সহায়ক সবরকম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে।
2. **আঞ্চলিক কেন্দ্র:** মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক 'রিসোর্স কাম স্টাডি সেন্টার' স্থাপন করে। ওইসব কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 'স্টাডি মেটিরিয়াল' বা শিখন বিষয়বস্তু সরবরাহ করা হয়।

3. **পৃথক পাঠ্যসূচি:** শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিজ্ঞতা এবং চাহিদার প্রতি নজর রেখে, মুক্ত বিদ্যালয় সর্বদা একটি পৃথক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে।
4. **সহজ পাঠ্যপুস্তিকা:** মুক্ত বিদ্যালয়ের স্টাডি মেটিরিয়াল এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই নিজে পড়ে তা বুঝতে পারে।
5. **কোর্স টিম:** মুক্ত বিদ্যালয় পাঠক্রমের উন্নতির জন্য 'কোর্স টিম' ব্যবহার করে।
6. **ব্রিজ ও প্রিপারেটরি কোর্স:** SLC (স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট)-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শিক্ষার্থীরা মুক্ত বিদ্যালয়ে ব্রিজ কোর্স এবং প্রিপারেটরি কোর্সের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।
7. **ভরতির ক্ষেত্রে নমনীয়তা:** লিখতে এবং পড়তে সক্ষম এমন যে-কোনো ব্যক্তি মুক্ত বিদ্যালয়ে ভরতি হতে পারে।
8. **শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার:** মুক্ত বিদ্যালয় অডিয়ো ক্যাসেট, রেডিয়ো এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

2. মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা জগতে এক নতুন সংযোজন হল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। 1971 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় হায়দরাবাদে। তবে বর্তমানে কেবল ভারত নয়, এশিয়া মহাদেশের সব থেকে বড়ো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি হল ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি 1986 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 'নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা
(Present Position of Open University in India)

পত্রযোগে শিক্ষা কর্মসূচির অসুবিধা দূরীকরণে এবং তার মান উন্নয়নে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি হল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। সত্তর দশকের শেষের দিকে দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য শিক্ষামন্ত্রক জাতীয় স্তরে সেমিনারের আয়োজন করেন। উক্ত সেমিনারে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো সুপারিশ করা হয়। অবশ্য 1974 খ্রিস্টাব্দেই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য জি পার্থসারথির নেতৃত্বে 8 জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। পার্থসারথি কমিটি সমস্ত রকমের পর্যালোচনার পর পার্লামেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। দুঃখের বিষয় পরবর্তী 8 বছর কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবশেষে ভারত সরকার 1982 খ্রিস্টাব্দের 20 আগস্ট হায়দরাবাদে **বি আর আম্বেদকর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়** নামে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। 1985 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে পার্লামেন্টে **'ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি'** বা সংক্ষেপে 'ইগনু' প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইন পাস হয় এবং 1985 খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে দিল্লিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে এর আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। চালু হওয়ার প্রথম বছর সারা দেশে এর মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 4528 জন। 2003 খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মোট ছাত্র সংখ্যা হয় 11 লক্ষ 20 হাজার। 2008 খ্রিস্টাব্দে ছাত্র সংখ্যা হয় প্রায় 44 লক্ষ। বর্তমানে এটি এশিয়া তথা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। সব রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও 'ইগনু'-র একাধিক কেন্দ্র আছে যার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে, 'ইগনু' সমগ্র বিশ্বের মধ্যে অল্প কয়েকটি প্রথম শ্রেণির মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি অন্যতম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য শিক্ষার প্রসার এবং উন্নত গুণমান। 'ইগনু' এই শর্ত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পূরণ করতে সক্ষম হওয়ায় ভেঙ্কুবারে 'Commonwealth of Learning' IGNOU-কে ***'Centre of Excellence'*** এই বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা 10টি, এর মধ্যে রাজ্য স্তরে 9টি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি (IGNOU)।

পশ্চিমবাংলায় 1998 খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণ রেখে **'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়'** স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা প্রচুর এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সারা রাজ্যে প্রায় 60টি কেন্দ্রের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণ করে চলেছে।

সাধারণভাবে বলা যায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটছে এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিচার করলেই এর জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়।

1997 খ্রিস্টাব্দের এক রিপোর্টে দেখা যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 16% মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। 2000 খ্রিস্টাব্দের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় মোট 10টি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ছাত্রছাত্রী ভরতির সংখ্যা ছিল 4,72,102 জন।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

ভারতে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যগুলি প্রায় একই ধরনের। যেমন—

1. **উচ্চশিক্ষার প্রসার:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেয়।
2. **নিরক্ষরতা দূরীকরণ:** সামাজিক শিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে সাহায্য করে।

3. **আর্থিক বিকাশ:** বিভিন্ন পেশাগত বা বৃত্তিমূলক কোর্সের প্রচলনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে দেশের কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়নে সহায়তা করে এবং দেশের আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে।
4. **উচ্চশিক্ষার ব্যয় হ্রাস:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অতি কম খরচে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এনে দেয়।
5. **ঘরে বসে উচ্চাশিক্ষার ব্যবস্থা:** দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে নিজের অঞ্চলে থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
6. **শিক্ষার জটিলতা দূরীকরণ:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষার অনমনীয়তা ও জটিলতা দূর করতে সাহায্য করে। মুক্ত শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মতো শ্রেণি শিখন, পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার সময় প্রভৃতি বিষয়ে কড়াকড়ি থাকে না।
7. **আগ্রহীদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা:** যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণে উচ্চশিক্ষার স্তরে পৌঁছোনোর সুযোগ পায় না বা চাকরির কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।
8. **বৃত্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা:** চাকরিরত ব্যক্তিদের বৃত্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রোমোশন প্রভৃতির ক্ষেত্রে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

1. **স্বনিয়ন্ত্রণ:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বাধীন এবং স্বনিয়ন্ত্রিত।
2. **ভিন্ন প্রকৃতির সেনেট ও কাউন্সিল:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিল এবং সেনেট থাকে, যদিও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এগুলি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে।
3. **বিভিন্ন পদাধিকারী:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সেক্রেটারি, অ্যাকাডেমিক বিভাগের প্রধান, হোম স্টাডিজের ডিরেক্টর প্রমুখ পদাধিকারী নিযুক্ত থাকেন।
4. **ডিগ্রি:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাধারণ ডিগ্রি' এবং 'বিশেষ ধরনের ডিগ্রি' প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। তবে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।
5. **ফাউন্ডেশন কোর্স:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ফাউন্ডেশন কোর্সের ব্যবস্থা থাকে।
6. **কোর্সের সময়সীমা:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত তিন বছরের স্নাতক স্তর এবং দু-বছরের স্নাতকোত্তর স্তরের কোর্স থাকে। মেধাবী শিক্ষার্থীকে কম সময়ে কোর্স শেষ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে প্রতিটি কোর্স শেষ করার সর্বাধিক সময়সীমা পাঁচ বছর।
7. **ক্রেডিট স্থানান্তরকরণ ব্যবস্থা:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কোর্স থেকে অন্য কোর্সে ক্রেডিট বা প্রাপ্ত নম্বর স্থানান্তরকরণ করার ব্যবস্থা থাকে।
8. **মূল্যায়ন:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক অ্যাসেসমেন্ট এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়।

9. **পাঠ্য বস্তু প্রেরণ ও কনট্যাক্ট প্রোগ্রাম:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকযোগে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় শিখন বিষয়বস্তু (Study material) পাঠানোর ব্যবস্থা থাকে। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো কাছাকাছি কোনো জায়গায় ক্লাসেরও ব্যবস্থা করা হয়।
10. **ভরতির ক্ষেত্রে নমনীয়তা:** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতির ক্ষেত্রে কোনো কড়াকড়ি নেই। বহুদিন আগে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীরাও এখানে ভরতি হতে পারে। আসনসংখ্যা বেশি থাকায় আগের পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাও ভরতি হওয়ার সুযোগ পায়। ভরতির ক্ষেত্রে বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি

অভিজ্ঞ অধ্যাপক দ্বারা বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত শিখন বিষয়বস্তু (Study material) 'মডিউল' আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো হয় বা শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রতিটি পত্রের মডিউলের উপর অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে কয়েকটি করে প্রশ্ন দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবস্তু বাড়িতে পড়ার পর সেই প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখে ডাকযোগে স্টাডি সেন্টারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের বাসস্থানের কাছাকাছি কোনো জায়গায়, সাধারণত কোনো কলেজে রবিবার বা ছুটির দিন আলোচনা বা সেমিনারের ব্যবস্থা হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেখানে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া কাউন্সেলিং সার্ভিসেরও ব্যবস্থা থাকে। পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে কাউন্সেলিং-এর সুবিধা নিতে পারে। যেসব বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল থাকে, সেখানে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে সব প্র্যাকটিক্যাল করে আসতে হয়। মাঝে মাঝে বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রতি 100 নম্বরের পত্রে 20 থেকে 25 নম্বর নির্দিষ্ট থাকে 'ইনটারনাল অ্যাসেসমেন্ট' (Internal assessment)-এর জন্য। এ ছাড়া লিখিত পরীক্ষা হয় 75-80 নম্বরের। মোটের উপর প্রতি পত্রে 40% নম্বর পেলে, ওই পত্রে পাস বলে ধরা হয়। এক সঙ্গে বা বিভিন্ন সময়ে বিষয়গুলিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে গ্রেডভিত্তিক শংসাপত্র দেওয়া হয়।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গে 1997 খ্রিস্টাব্দে দূরাগত শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি আইনের মাধ্যমে কলকাতা 1 নং উডবার্ন পার্কে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় (State University)। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী অথচ নানান কারণে প্রথাগত উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অক্ষম মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্যই রাজ্যের পক্ষ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার নানা প্রতিষ্ঠান

যেসব প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয় প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব পালন করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

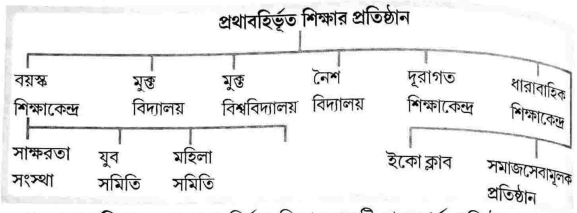

1. **বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র:** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে এই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনাগুলি করে থাকে। এ ছাড়া শ্রমবিভাগ, শিল্প, রেল, ডিফেন্স ইত্যাদিরও নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্র থাকে। এই কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—
   - **(i) সাক্ষরতা সংস্থা:** এই ধরনের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষালয়ে বিদ্যালয়ছুট বয়স্ক ব্যক্তিদের কেবল লেখা, পড়া এবং সহজ পাটিগণিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
   - **(ii) যুব সমিতি:** এই ধরনের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা, ব্যায়াম শরীরচর্চা, সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এখানে বিভিন্ন প্রকার ছোটোখাটো শিল্পদ্রব্য তৈরিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। এখানে দলগতভাবে সমাজ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা থাকে।
   - **(iii) মহিলা সমিতি:** এই ধরনের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সংস্থায় সূচিশিল্প, দরজির কাজ, শিশুর যত্ন, নারী উন্নয়ন, গৃহস্থালির কাজ ও পুষ্টি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে।
   - **(iv) জাতীয় সমাজসেবামূলক প্রকল্প:** এই ধরনের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সংস্থার মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা, জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষা (population education), পরিবেশদূষণ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই সংস্থায় সদস্য করা হয়।
2. **মুক্ত বিদ্যালয়:** এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ছুট এবং নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়।

3. **মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়:** কর্মরত, বয়স্ক ও অন্যান্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অল্প খরচে সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পায়।
4. **নৈশ বিদ্যালয়:** নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত চাষি, শ্রমিক বা অন্যান্য কাজকর্মে যুক্ত মানুষজন দিনের বেলা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। তাদের জন্য সন্ধেবেলা বা রাত্রে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দু-হাজার নৈশ বিদ্যালয় আছে।
5. **দূরাগত শিক্ষাকেন্দ্র:** এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরাগত শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এখান থেকে অনেক সময় স্টাডি মেটিরিয়াল বিতরণ করা হয় এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে কনট্যাক্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়।
6. **ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র:** এই ধরনের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সান্ধ্যকালীন কোর্স, রবিবারের জন্য কোর্স বা বিভিন্ন অবসরকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করে। শিক্ষাকেন্দ্রের আট কিলোমিটারের মধ্য বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা মূলত এই ধরনের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে। রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে এই শিক্ষার কেন্দ্র থাকে। NCERT এবং SCERT অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের কোর্সের ব্যবস্থা করে।
7. **সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান:** বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানেও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যে চললেও কিছু কিছু সরকারি অনুদানও পেয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন ধরনের বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
8. **ইকো ক্লাব:** পরিবেশরক্ষা, দূষণ প্রতিরোধ এবং পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা হয় এখানে। এই সংস্থায় পরিবেশ সম্পর্কে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা এবং সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়।
9. **বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সংস্থা:** বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সংস্থাও বর্তমানে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকে। ধর্মীয় সংস্থাগুলি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।
10. **বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা:** বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সংস্থা, যেমন—সরকারি শিক্ষা দফতর, সমবায় বিভাগ, সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, শিল্প বিভাগ প্রভৃতি প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এই সংস্থাগুলি নিজেদের দফতরের কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের গতানুগতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও কাজ করে। পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে UNESCO, FAO, WHO প্রভৃতিও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং তার সংস্থার ভূমিকা
(Informal Education and Role of their Agencies)

সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের বাইরে কোনোরকম পূর্বনির্ধারিত রীতিনীতি বা অনুষ্ঠান ছাড়াই শিক্ষার্থীরা যে ধরনের শিক্ষা লাভ করে, তাকে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলে। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা একদিকে যেমন নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা থেকে আলাদা, তেমনি এই শিক্ষা আবার নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার পরিপূরকও বটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা লাভ করে থাকে। এই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বিশ্বপ্রকৃতি প্রভৃতি উৎস থেকে প্রাত্যহিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। শিক্ষাবিদ **কুম্বস** ***(Coombs)***-এর মতে, "Informal education is education which takes place all the time informally or incidentally"। অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল এমনই এক শিক্ষা যা সর্বদা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঘটে। শিক্ষাবিদ **জে পি নায়েক** ***(J P Naik)***-এর মতে, সমাজজীবনে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু শেখা যায়, তাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Informal Education)

1. যে শিক্ষা সবসময় চলছে, যার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।
2. প্রত্যক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া শিশু বা শিক্ষার্থী অন্যান্য মাধ্যম থেকে যে শিক্ষা অর্জন করে, তাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।
3. পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে মানিয়ে নিতে গিয়ে এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশ থেকে কোনো শিশু যে শিক্ষা, দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা-ই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Informal Education)

1. **নিয়ন্ত্রণহীন শিক্ষা:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই শিক্ষায় কোনোরকম প্রথাগত নিয়ন্ত্রণ থাকে না। শিক্ষার প্রধান চারটি উপাদান, যথা—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ শিক্ষার্থীই কেবল এই শিক্ষায় প্রাধান্য পায় এবং বাকি তিনটি উপাদানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
2. **প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা:** এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান লাভ করে। এতে শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

3. **শিক্ষকনির্ভর নয়:** নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন না। শিক্ষার্থী প্রকৃতি, পরিবার এবং সামাজিক সংস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। বর্তমানে গণশিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন—বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এই শিক্ষা গ্রহণ করে।
4. **কৃত্রিমতাহীন স্বাভাবিক শিক্ষা:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সম্পূর্ণ কৃত্রিমতাহীন শিক্ষা। এখানে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হয় না। শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক উপায়ে বিভিন্ন উৎস বা মাধ্যম থেকে শিক্ষালাভ করে।
5. **নির্দিষ্ট পাঠক্রমের অনুপস্থিতি:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কোনো পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় না এবং কোনো বিষয়ও (Subject) নির্দিষ্ট থাকে না।
6. **চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়:** এই ধরনের শিক্ষা বিদ্যালয় বা বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার্থী যে-কোনো স্থান থেকে যে-কোনো সময়ে এই শিক্ষা লাভ করতে পারে। ট্রেনে বা বাসে কোনো যাত্রীর আচরণ থেকে, এমনকি রাস্তার ধারের পোস্টার থেকেও এই শিক্ষালাভ করা যেতে পারে।
7. **পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্বনির্ধারিত নয়:** এই শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো কিছুই পূর্বপরিকল্পিত বা পূর্বনির্ধারিত থাকে না। যেহেতু এখানে বিদ্যালয় থাকে না, পাঠক্রম থাকে না, কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না সেহেতু পূর্বপরিকল্পনার কোনো সুযোগ এখানে নেই।
8. **নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকে না:** এই ধরনের শিক্ষায় যেহেতু কোনো পাঠক্রম নেই, তাই এতে নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যপুস্তকও থাকে না।
9. **পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও অনুকরণনির্ভর শিক্ষা:** এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজে বাড়িতে বা বাইরের পরিবেশের কোনো উপাদানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজে নিজেই শেখে। ছোটোরা বড়োদের অনুকরণ করে যা শেখে তাও অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।
10. **নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তর ও বয়স থাকে না:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় নির্দিষ্ট শ্রেণি বা শিক্ষাস্তর থাকে না এবং এই শিক্ষাগ্রহণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেহেতু কোনো পাঠক্রম নেই, নিয়মশৃঙ্খলা বা কোনো পরিকল্পনার ব্যবস্থা নেই এবং কোনো বিদ্যালয়ও নেই, তাই এতে মূল্যায়নের কোনো সুযোগও নেই। শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইচ্ছানুসারে শিক্ষালাভ করে। এটি এক সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাব্যবস্থা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা সংস্থাগুলি হল পরিবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা কমিউনিটি, গণমাধ্যম এবং উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কার্যকেন্দ্র পূর্বে পরিবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা কমিউনিটি এবং গণ মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র
(Productive and Economic Activity Centre as Informal Agencies)

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। এগুলি হল—

1. **বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা প্রদান:** উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীকে জীবনের উপযোগী এবং বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেওয়া। এই সমস্ত কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে।
2. **সামাজিক বোধ সৃষ্টি:** উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্রগুলিতে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকতা বোধ গড়ে ওঠে।
3. **দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি :** উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্রগুলি ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীকে বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন একই কাজ করার সুবাদে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়ে। ফলে ওইসব বৃত্তিতে সে পরবর্তীকালে আরও বেশি সাফল্য পায়।
4. **পরিচালনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাদান :** উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি ব্যক্তিকে পরিচালন (Management) সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। পরিচালন দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে যে-কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত কার্যকরী।
5. **মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা :** দেশের অগ্রগতির জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনমূলক এবং অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করে।
6. **আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় সহায়তা:** এই ধরনের সংস্থাগুলি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার তাৎপর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে। দেশবিদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে নিজের দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য এই সংস্থাগুলি বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।
7. **জাতীয় সংহতি রক্ষায় সহায়তা:** উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিতে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের মানুষ কাজ করে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অমিল থাকলেও একসঙ্গে কাজ করার জন্য তাদের মধ্যে একটি সংহতি লক্ষ করা যায়। এই সংহতি জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।
8. **সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা:** উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক সংস্থা ব্যক্তির সাংস্কৃতিক বিকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে নানা জাতির মানুষ চাকরির জন্য এইসব সংস্থায় আসে। ফলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সুযোগ ঘটে।

ebook.dascoaching.in

9. **শিক্ষার গতি ত্বরান্বিত করা:** ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উন্নতির উপর তার শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। উৎপাদনমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্রগুলি ব্যক্তির আর্থিক চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে এবং কাজের বিনিময়ে ব্যক্তিকে অর্থ সরবরাহ করে পরোক্ষভাবে তার শিক্ষার গতিকে ত্বরান্বিত করে।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Informal Education)

শিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও এই শিক্ষা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধা উল্লেখ করা হল—

1. **অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা দান:** কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচি না থাকায় অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা দিতে পারে না। তা ছাড়া বর্তমানে জগৎ ও জীবন ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। এই জটিল জীবনের উপযোগী শিক্ষার কিছু অংশ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা থেকে পাওয়া গেলেও, পুরোটা পাওয়া অসম্ভব।
2. **চাহিদা পূরণে অসামর্থ্য:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা শিক্ষার সব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানের জগৎ ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বিভিন্ন জটিল এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ে পাঠদানের জন্য চাই অভিজ্ঞ শিক্ষক, উপযুক্ত শিক্ষালয় ও পরীক্ষাগার। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় যেহেতু শিক্ষক, শিক্ষালয় ইত্যাদি থাকে না, তাই এটি মানুষের ওইসব চাহিদা পূরণে অসমর্থ।
3. **সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী নয়:** এই ধরনের শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনে খুব একটা উপযোগী হয় না। সুনাগরিক হতে গেলে সামাজিক পরিবর্তনের রীতিনীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সামাজিক বিকাশে এই শিক্ষা বিশেষ সাহায্য করতে পারে না।
4. **সৃজনমূলক বিকাশে সহায়ক নয়:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটার সুযোগ খুবই কম। এক্ষেত্রে কেবল পর্যবেক্ষণ এবং অন্ধ অনুকরণের দ্বারা শিক্ষা আয়ত্ত হয়।
5. **প্রকৃত মূল্যায়নের অভাব:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান অর্জন করে, সেই জ্ঞানের প্রকৃত মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা এই শিক্ষা পদ্ধতিতে নেই। সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া কোনো শিক্ষাব্যবস্থা সফল হয় না। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্মক ত্রুটি।
6. **শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সুযোগ ও গুরুত্বের অভাব:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় যেহেতু কোনো সময়সূচি থাকে না, তাই শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সুযোগ পায়। বহু পরিবারে বিভিন্ন কাজের জন্য পিতা-মাতাকে দিনের বেশিরভাগ সময় বাইরে কাটাতে হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা চাহিদামতো বিষয় শেখার সুযোগ

কম পায়। তা ছাড়া অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থাগুলি আজকাল শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্তে অন্যান্য স্থূল বিনোদনের দিকে বেশি ঝুঁকেছে। ফলে সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

7. **বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব:** অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা মন চায় তাই শেখে। মূল্যায়ন নেই, পাঠক্রমও নেই, শিক্ষক নেই—তাই সমাজে এই জাতীয় শিক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই বললেই চলে।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বর্তমান জটিল জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ হলেও মানুষের শিক্ষা শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমেই। আজও অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমে পরিবার শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা দান করে। মোট কথা, আধুনিক জীবনের উপযোগী সব চাহিদা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা থেকে পূরণ না হলেও মানবশিশুর বিকাশে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-2

শিক্ষার চারটি স্তম্ভ কী কী? (What are the four pillars of education ?)

Ans. শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য বা শিখনের চারটি স্তম্ভের উল্লেখ করা হয়। যথা—

1. জ্ঞানার্জনের শিক্ষা (Learning to know)
2. কর্মের শিক্ষা (Learning to do)
3. একত্রে বাঁচার শিক্ষা (Learning to live together)
4. মানুষ হওয়ার শিক্ষা (Learning to be)।

শিক্ষার লক্ষ্যের গুরুত্বগুলি লিখুন। (Write the importance of the aims of education.)

Ans. শিক্ষার বিভিন্ন গুরুত্বগুলি হল—

1. শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষামূলক কর্মসম্পাদনের স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়।
2. একটি শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে অর্থবহ করে তোলে।
3. শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়নে সাহায্য করে।
4. শিক্ষায় মূল্যায়নের ভিত্তি তৈরি হয়।
5. শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষামূলক কর্মসম্পাদনের পথ নির্দেশ করে, সময় ও শ্রম সাশ্রয় করে।
6. শিক্ষার লক্ষ্যগুলি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
7. শিক্ষার লক্ষ্যগুলি শিক্ষা প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
8. শিক্ষার লক্ষ্য বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে

সাহায্য করে।

অর্থনীতিতে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি আলোচিত হয়ে থাকে? (What type of topics are discussed in economy ?)

Ans. অর্থনীতিতে যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়ে থাকে সেগুলি হল—

(i) মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা সংক্রান্ত নীতি ও প্রকৃতি।
(ii) মানুষের চাহিদার সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের সম্পর্ক নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা।
(iii) বিভিন্ন সম্পদ উৎপাদনের মূলে কী কী শক্তি কাজ করে।
(iv) চাহিদা ও সম্পদের পারস্পরিক সম্পর্ক।
(v) সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাবলি।
(vi) আন্তর্জাতিক ব্যাবসাবাণিজ্য, ব্যাংকের ভূমিকা ইত্যাদি।
(vii) সামাজিক ন্যায়বিচার ও তার প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কেও অর্থনীতিতে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

প্রথাগত শিক্ষার সংজ্ঞা দিন। (Give the definition of formal education.)

Ans. সমাজ দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনভাবে এবং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের যে বিশেষ শিক্ষাদান করা হয়, তাই হল প্রথাবদ্ধ বা বিধিবিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

শিক্ষাবিদ **পি ডি শুক্লা** ***(P D Sukla)***-এর মতে প্রথাগত শিক্ষা হল এমন এক গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি যাতে পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণের দ্বারা ছাত্র ও শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

শিক্ষাবিদ ***জে পি নায়েক (J P Naik)***-এর মতে, সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে যে শিক্ষা পরিচালিত করা হয় তাকে প্রথাগত শিক্ষা বলা যেতে পারে।

দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে বেতারের সীমাবদ্ধতাগুলি লিখুন। (Write the limitations of radio in the field of distance education.)

Ans. দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে বেতারের সীমাবদ্ধতাগুলি হল—

1. নমনীয়তার অভাব, শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়া একমুখী। শিক্ষক-শিক্ষিকার মিথস্ক্রিয়ার সুযোগের অভাব।
2. শিক্ষার্থীর মধ্যে অস্পষ্টতা দেখা দিলে তার সমাধানের সুযোগ নেই।
3. শিক্ষামূলক কর্মসূচি প্রস্তুতের জন্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন।
4. ভারতের মতো অসম জনসংযোগ বহুল দেশে (যেমন—নিরক্ষর, পাঠত্যাগকারী, বেকার ইত্যাদি) বেতারের ব্যবহার যথেষ্ট কার্যকরী নয়।
5. যেসব ব্যক্তি বেতারে সম্প্রচারের জন্য কোর্স থেকে বেতার সম্প্রচারের বিষয় প্রস্তুত করে, শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাদের প্রায়শ থাকে না।

▶ **দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে দূরদর্শনের সুবিধা লিখুন। (Write the advantages of television in the field of distance education.)**

Ans. দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে দূরদর্শনের সুবিধাগুলি হল—

1. শিক্ষা ও সামাজিক সমতা আনয়নে সাহায্য করে।
2. উন্নত পাঠদান।
3. শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস।
4. নমনীয়তা।
5. অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষকের ব্যবহার।
6. বিনিয়োগের উপযুক্ত ব্যবহার।
7. বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণ।
8. শ্রবণ ও দর্শনের সমন্বয়।
9. গণশিক্ষা।

▶ **জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the main objectives of National Institute of Open School ?)**

Ans. জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার প্রসার এবং প্রবহমান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(খ) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

(গ) দূর শিক্ষা এবং মুক্ত শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যের বিস্তারের একটি কার্যকারি সংস্থা।

(ঘ) রাজ্যের দূর শিক্ষা এবং মুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।

▶ **অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংজ্ঞা দিন। (Give the definition of informal education.)**

Ans. 1. যে শিক্ষা সবসময় চলছে, যার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

2. প্রত্যক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া শিশু বা শিক্ষার্থী অন্যান্য মাধ্যম থেকে যে শিক্ষা অর্জন করে, তাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

3. পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে মানিয়ে নিতে গিয়ে এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশ থেকে কোনো শিশু যে শিক্ষা, দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা-ই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— **মান-5**

▶ শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলি আলোচনা করুন। (Discuss the main causes to changing aims of education.)

Ans. 188 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষামূলক অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন। (Discuss about the objectives and content of educational economics.)

Ans. 194-195 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ভারতে জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে বাধাগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the obstruction in national development of India.)

Ans. 197-198 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে শিক্ষার ভূমিকা লিখুন। (Write the role of education to strong national integration.)

Ans. 198-199 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the limitations of school.)

Ans. 214-215 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন। (Mention the types of social institutions.)

Ans. 216-217 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক কাজগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the educational activities of social institution.)

Ans. 217-218 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতাগুলি লিখুন। (Write about limitations of newspaper.)

Ans. 221-222 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the characteristics of formal education.)

Ans. 231-232 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the limitations of formal education.)

Ans. 233-234 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the characteristics of non-formal education.)

Ans. 241-242 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the limitations of non-formal education.)

Ans. 244-245 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ দূরাগত ও প্রথাগত শিক্ষার পার্থক্য লিখুন। (Write the difference between distance education and formal education.)

Ans. 264 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সংজ্ঞা সহ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। (Discuss the characteristics of informal education with definition.)

Ans. 278-279 পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— মান-10

▶ শিক্ষার চারটি স্তম্ভ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। (Discuss about four pillars of education.)

Ans. 172-180 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জীবনব্যাপী শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা লিখুন। (Write about the role of school in fullfilling the objectives of life-long educational aims)

Ans. 182-185 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষার লক্ষ্যের মূল ধারাগুলির বিবরণ দিন। (Describe the basic aspects of education.)

Ans. 188-196 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষার সংস্থা হিসেবে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss about the role of family as an agency of education.)

Ans. 202-206 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিদ্যালয়ের কাজগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the functions of school.)

Ans. 208-210 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss about the role of newspaper as a media of mass education.)

Ans. 221-223 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেতারের ভূমিকা ও তার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন। (Discuss about the role of radio and its limitations as a media in mass education.)

Ans. 222-224 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত শিক্ষার সংস্থাগুলির ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss about the role of agencies of formal education.)

Ans. 234-238 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ দূরাগত শিক্ষার সংজ্ঞাসহ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। (Discuss the characteristics of distance education with its definition.)

Ans. 245-246, 250-253 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ দূরশিক্ষার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন। (Discuss the classification of distance education.)

Ans. 253-258 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ মুক্তশিক্ষার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। (Discuss about the objectives and characteristics of open education.)

Ans. 265-268 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ভারতবর্ষে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the objectives and characteristics of open university in India.)

Ans. 273-275 পৃষ্ঠা দেখুন।

This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in

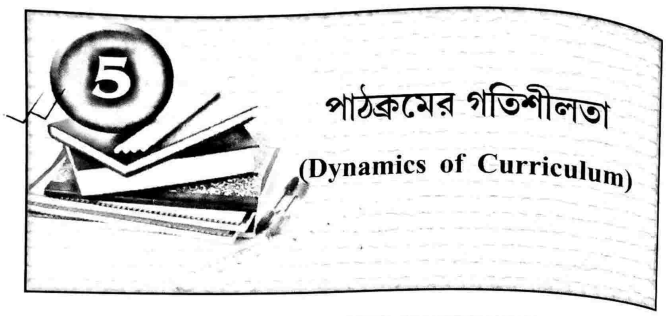

5 পাঠক্রমের গতিশীলতা
(Dynamics of Curriculum)

পাঠক্রম প্রণয়নে নির্ধারকসমূহ
(Determinants of Curriculum Development)

পাঠক্রম প্রণয়নে নির্ধারণ সমূহ আলোচনা করার পূর্বে পাঠক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

পাঠক্রমের ধারণা (Concept of Curriculum)

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological Meaning)

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে Curriculum বলতে বলা হয়েছে, A course of study laid down for the students of a university or school, or in a wider sense, for schools of certain standards। পাঠক্রম শব্দটির উৎপত্তি লাতিন শব্দ cureere থেকে। এর অর্থ হল দৌড়। সুতরাং পাঠক্রম (curriculum) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ। শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণভাবে এর অর্থ হল লেখাপড়া ও কাজকর্মের জন্য নির্ধারিত পথ। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ পাঠক্রমের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন, যেমন—

(a) ***John Dewey*-এর মতে,** "Curriculum is identical with all objects ideas and principles which enter as resources or obstacles into the continuous intentional pursuit of a course of action." অর্থাৎ একটি বিশেষ কোর্সের সমস্ত বিষয়, ধারণা ও নীতির সমন্বয় হল পাঠক্রম।

(b) ***Good*-এর মতে,** "It is defined as a general overall plan of the content or specific materials of instruction that the school should offer the students by way of qualifying him for graduation or certification for entrance into a professional or vocational field." অর্থাৎ কোনো পেশা বা বৃত্তি শিক্ষায় প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যে শংসাপত্র বা স্নাতক ডিগ্রি বিদ্যালয় দেয় তার মধ্যে সমস্ত বিষয় এবং পাঠদানের যাবতীয় ব্যবস্থাকেই পাঠক্রম বলে।

(c) ***Crow & Crow*-এর মতে,** "Curriculum includes all the learner's experience in or out side that are included in a programme which has been devised to help him to develop mentally physically, emotionally socially spiritually and morally." শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে পরিকল্পিত কার্যসূচি এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয় হল পাঠক্রম।

(d) ***Cunningham*-এর মতে,** "Curriculum is the tool in the hands of the artist (the teacher) to mould his materials (pupils) according to his ideals (aims and objectives) in his studies (the school)." অর্থাৎ পাঠক্রম হল শিল্পীর (শিক্ষকের) হস্তে এমন যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে তিনি তাঁর উপাদানকে (শিক্ষার্থীকে) তাঁর চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাঁর কর্মস্থলে (বিদ্যালয়) রূপ দিতে পারেন।

(e) ***Ross*-এর মতে,** "Curriculum includes Cognitive, Affective and Psychomotor activities." অর্থাৎ পাঠক্রমের মধ্যে বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক ও মনঃসঞ্চালনমূলক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

(f) **ফ্রয়েবেল-এর মতে,** "Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race." অর্থাৎ পাঠক্রম হল মানবজাতির সার্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুসমন্বিত রূপ।

(g) **মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন** বলেছেন, পাঠক্রম শুধু বিদ্যালয়ে গতানুগতিক বিষয়সমূহের শিক্ষাকে বোঝায় না। এর সাহায্যে একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা যায়। সেই অভিজ্ঞতা সংগ্রহ—শ্রেণি, লাইব্রেরি, ল্যাবোরেটরি, ওয়ার্কশপ, খেলার মাঠ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে।

(h) **19th Century Year Book-এ** বলা হয়েছে, "The curriculum may be defined as the totality of the subject matter, activities and experiences which constitutes pupils school life." অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনে সমস্ত বিষয়, কার্যাবলি এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়কে পাঠক্রম বলা যায়।

(i) **শিক্ষাবিদ *Penvne*** বলেছেন, "Curriculum consists of all the situations that the school may select and consciously organise for the purpose of developing personality of its pupils and making behaviour changes in them." অর্থাৎ "শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশ এবং তার মধ্যে আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষালয় যেসব কর্মসূচি নির্বাচন করে এবং সচেতন ভাবে পরিচালনা করে তার সমন্বয়ই হল পাঠক্রম।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে পাঠক্রমের মূল বিষয় হল—পাঠক্রমের পরিধি বিস্তৃত, এটি শিক্ষার্থীদের জীবনের সমস্ত দিককেই বিচার বিবেচনা করে, শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, পরিবেশ ইত্যাদি যা শিক্ষার্থীদের আচরণ ও জীবনের চলার পথকে নিয়ন্ত্রিত করে তাই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পাঠক্রমের সাফল্য আসবে তখনই যখন সেই পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র নিজের নয়, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে। বস্তুতপক্ষে, শিক্ষাকালীন সমস্ত জীবনই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পাঠক্রমই শিক্ষার্থীকে সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে সাহায্য করে। শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে চাই একটি সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives), বিষয়বস্তু (Content), পদ্ধতি (Teaching Method) ও মূল্যায়ন (Evaluation) এই চারটি উপাদানের সার্থক সমন্বয়ের যে কর্মসূচি রচনা করা হয় তাই হল পাঠক্রম। (Curriculum is an integrated system of element of education like objectives, content, method and evaluation programme for effective management of the system.)

পাঠক্রমের গতানুগতিক ধারণা (Traditional Concept of Curriculum) মানবসভ্যতার ইতিহাসে মধ্যযুগ পর্যন্ত পাঠক্রমের যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাকেই গতানুগতিক ধারণা (Traditional Concept) বলে।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী—

(i) পাঠক্রম পুস্তককেন্দ্রিক অর্থাৎ কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ব্যাবহারিক প্রয়োগ, দক্ষতা ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করা হয়। সুতরাং পাঠক্রমের গতানুগতিক ধারণা শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে।

(ii) প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রম হল যান্ত্রিক। এখানে একজন শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষ শ্রেণির জন্য লিখিত বইয়ের বাইরে কোনো কিছু জানার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাবহারিক জ্ঞানের চেয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়। প্রচলিত ধারণায় পাঠক্রমের অধিকাংশই শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, দক্ষতা, প্রবণতা ইত্যাদি কেন্দ্রিক নয় এবং শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের সহায়ক নয়।

(iii) প্রচলিত পাঠক্রমে নমনীয়তার অভাব রয়েছে। পাঠক্রমে ছবি, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি ইত্যাদি অবহেলিত। তা ছাড়া পাঠক্রমে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রত্যেককে একই পাঠক্রমের সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আগ্রহ এইগুলির প্রতি কোনো গুরুত্ব নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠক্রম জীবনকেন্দ্রিক নয়, ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমে আগ্রহ পায় না।

(iv) প্রচলিত পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিক্ষকই প্রধান ও শিক্ষার্থীরা নীরব শ্রোতা।

(v) পাঠক্রম মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় অর্থাৎ বাস্তব জীবনে এদের তেমন প্রয়োগ নেই।

(vi) পাঠ্যতালিকায় নির্বাচিত বই পড়া, শিক্ষকের বক্তৃতা, শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কতকগুলি পাঠ্য বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই গতানুগতিক পাঠক্রম তৈরি হয়।

(vii) গতানুগতিক পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংগতির (correlation) অভাব রয়েছে।

(viii) এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি তাত্ত্বিক বিষয় পড়তে হয় যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে কষ্টকর হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Heavy এবং Over loaded curriculum.

(ix) এই পাঠক্রম পরীক্ষাকেন্দ্রিক। এখানে সেই সমস্ত বিষয়গুলি রয়েছে যেগুলিকে গতানুগতিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা যায়। এই কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই পরীক্ষায় পাস করানো ও পাস করার দিকেই নজর বেশি দেয়।

(x) গতানুগতিক পাঠক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত নয় কারণ সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রযুক্তির অগ্রগতি বিষয়ক বিষয়বস্তু পাঠক্রমে নেই।

(xi) গতানুগতিক পাঠক্রমে নৈতিক শিক্ষা, জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষা ইত্যাদির উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে এই পাঠক্রম থেকে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সঠিক চরিত্র গঠন সম্ভব নয়।

(xii) বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বের অভাব। ব্যাবহারিক কাজের (Practical work) প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। H.S. level-এ বিজ্ঞানের পাঠক্রমের ব্যাবহারিক কাজের ব্যবস্থা থাকলেও তা অনেকটাই প্রহসন।

(xiii) ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা ইত্যাদি দিকগুলি প্রচলিত পাঠক্রমে অবহেলিত।

(xiv) গতানুগতিক পাঠক্রমে বিষয়বস্তুকে মুখস্থ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, মানসিক প্রস্তুতি ও তাদের মৌলিকতা জাগিয়ে তোলার মতো বিষয় ও কার্যাবলি গতানুগতিক পাঠক্রমে নেই।

(xv) গতানুগতিক পাঠক্রমে অপ্রথাগত সংস্থাগুলিকে (যেমন—পরিবার, প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান) গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এগুলির সঙ্গে সমন্বয়সাধনের কোনো ব্যবস্থা নেই।

গতানুগতিক পাঠক্রমের উপরোক্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভারতবর্ষে স্কুল স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর, সর্বক্ষেত্রেই এই ধরনের পাঠক্রম এখনও পর্যন্ত চলছে। গতানুগতিক পাঠক্রমের সমালোচনা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নতুনভাবে যে পাঠক্রমগুলি তৈরি হচ্ছে সেগুলি তেমনভাবে গতানুগতিকতার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। সন্দেহ নেই, বর্তমান প্রতিটি স্তরের পাঠক্রমে বেশ কিছুটা আধুনিকতা এসেছে। তবে

পাঠক্রমকে সচল রাখতে হলে প্রয়োজন—(a) পাঠক্রমকে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করা, (b) পাঠক্রম হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত, (c) পাঠক্রম হবে বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে, (d) দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, (e) পাঠক্রমের মাধ্যমে যাতে নৈতিকতা বোধ, চরিত্র গঠন হয় সেই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ইত্যাদি।

পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা (Modern Concept of Curriculum)

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের মতে, যেহেতু শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া সেহেতু পাঠক্রম জীবন পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা মনোবিদ ***Crow & Crow*** বলেছেন, "Curriculum includes all the learner's experience, in or outside school that are included in a programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally." অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্যে, বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ও বহির্ভূত যে সাহায্যকারী অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করা হয়, তাকেই বলে পাঠক্রম। পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে হলে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ

(a) পাঠক্রম এমন হবে যাতে তা শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে।

(b) শিখন ও শিক্ষণের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করা আধুনিক পাঠক্রমের একটি বৈশিষ্ট্য।

(c) স্বাধীনতা, সাম্য, সুবিচার, দলগত মনোভাব প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশে আধুনিক পাঠক্রম গুরুত্ব আরোপ করে।

(d) পাঠক্রম যেন শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে।

(e) পাঠক্রম হবে চরিত্র গঠনের সহায়ক।

(f) আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ও মানসিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হবে। এই চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে হলে পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, দক্ষতা, ক্ষমতা, প্রবণতা, মনোভাব ইত্যাদির ভিত্তি করেই রচনা করা দরকার।

(g) পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশই ঘটবে না—এর মাধ্যমে যেন শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় অর্থাৎ পাঠক্রমের বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক হয়।

(h) পাঠক্রম শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়ক হবে।

(i) জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকমের অভিজ্ঞতার সমন্বয় হল আধুনিক অর্থে পাঠক্রম। এই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(j) আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জীবনধর্মী অভিজ্ঞতা দিতে হবে। এই ধারণা দিতে হলে শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে।

(k) আধুনিক মতানুযায়ী পাঠক্রম হল একটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতা তন্ত্র।

(l) আধুনিক পাঠক্রম মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক উভয় ধরনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(m) আধুনিক পাঠক্রম গতিশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহের পরিবর্তন ঘটছে এবং সেই পরিবর্তনশীল চাহিদা, আগ্রহকে ভিত্তি করেই পাঠক্রম তৈরি হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে পাঠক্রম হবে নমনীয়।

(n) পাঠক্রম হবে জাতির জীবনদর্শনের আয়না। শিক্ষার্থীর জীবনদর্শন এবং জাতির জীবনদর্শন পাঠক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

(o) আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন থাকবে পাঠক্রমে।

(p) আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন সবই পাঠক্রমের সক্রিয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ।

(q) আধুনিক পাঠক্রমে শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব বেশি।

পাঠক্রম প্রণয়নে নির্ধারকসমূহ (Determinants of Curriculum Development)

পাঠক্রমের উপাদান বলতে বোঝায় পাঠক্রম বিকাশ বা গঠনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়। উপাদানগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বিষয়ের প্রকৃতি, বিকাশমূলক বিষয়, পারিপার্শ্বিক ও আর্থিক বিষয়, সমাজ ও সংস্কৃতি, শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয়। এই উপাদানগুলিকে একটি চিত্রের রূপ দেওয়া যেতে পারে।

পূর্বের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পাঠক্রম গঠনে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীর বিকাশ, পরিবেশ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমস্ত উপাদানগুলির ভূমিকা বর্তমান। প্রতিটি উপাদানই পাঠক্রম প্রণেতাদের বিবেচনার বিষয়। এ ছাড়া বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। নিম্নে উপাদানগুলির সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি (Nature of Subject)

পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়, যেমন—সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিটি বিষয়ের নিজস্ব গঠন ও বৈশিষ্ট্য আছে। বিষয়গুলির গঠন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিখুঁত ও বিশদ জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর বিকাশ (Student Development)

পাঠক্রম গঠনে উপাদান হিসাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য বিশেষ প্রয়োজন। এই বিভিন্ন তথ্যাদির মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষার্থীর বিকাশগত তথ্য। বিগত 70 বছর ব্যাপী শিশুর বিকাশ সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার কোন্ স্তরের জন্য পাঠক্রম গঠন করা হবে, সেই শিক্ষার্থীদের পরিণমনের স্তর কীরকম, তাদের ক্ষমতা, সামর্থ্য ও আগ্রহ সম্পর্কে বিশদ তথ্যসংগ্রহ করতে হবে। পাঠক্রম রচনায় শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশমূলক তথ্যের অন্যতম দিকগুলি হল—(ক) শারীরিক বিকাশ, (খ) মানসিক বিকাশ, (গ) বৌদ্ধিক বা জ্ঞানমূলক বিকাশ, (ঘ) সামাজিক বিকাশ এবং (ঙ) প্রাক্ষোভিক বিকাশ।

শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই স্মরণ করা প্রয়োজন। যেমন—

(ক) শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি ও বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন এবং ক্রমপর্যায়ে ঘটে।

(খ) বিশ্বের সমস্ত শিশুই বিকাশের স্তরগুলি অতিক্রম করে, যদিও তার মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে।

(গ) বিভিন্ন দিকের বিকাশ পরস্পর নির্ভরশীল।

(ঘ) কোনো বিষয় শিখন বা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ন্যূনতম পরিণমনের প্রয়োজন। শিখনের হার পরিণমনের স্তরের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক বিষয় (Social Aspect)

সমাজ তার প্রয়োজনেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করেছে। সমাজের মধ্যেই শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী হয়। যে-কোনো সময়ে সমাজ-অন্তর্ভুক্ত সামাজিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়। সে জন্য পাঠক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষাব্যবস্থার উপর যে সমস্ত সামাজিক শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হয় তাদের সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল, সমাজের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিশেষ করে যেগুলি সমাজের পক্ষে বাঞ্ছিত সেগুলির সুরক্ষা এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া। একটি উত্তম পাঠক্রম সামাজিক ব্যবস্থাসমূহকে সমন্বিত করে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রার উন্নত মান নিশ্চিত করে। পাঠক্রমে কী থাকবে, চালু পাঠক্রমে কী নতুন কিছু সংযোজিত হবে, না বাতিল হবে তা নির্দিষ্টকরণে সামাজিক শক্তিসমূহ প্রভাব বিস্তার করে। পাঠক্রম সংগঠনে সামাজিক শক্তিসমূহ, বিভিন্ন সংগঠন এবং জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরের জনগণের দ্বারা কার্যকরী হয়।

আর্থিক বিষয় (Economic Aspect)

পাঠক্রমের ব্যবহারযোগ্যতা বিচারে আর্থিক বিষয়ের গুরুত্ব খুবই বেশি। পাঠক্রম কার্যকরীকরণ বিভিন্ন শর্তের উপর নির্ভরশীল। যেমন—অনুকূল পরিবেশ, শিক্ষা উপকরণের যথেষ্ট সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি। এই সমস্ত শর্তাদি পূরণের জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান। সরকার, কমিউনিটি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই অর্থের জোগান দেয়। পাঠক্রম প্রণেতাগণ পাঠক্রমে কী ধরনের শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্দিষ্টকরণে আর্থিক সংস্থানের উপর বিশেষ নজর রাখেন। শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরীকরণে সরকার আর্থিক সাহায্যে করলেই কমিউনিটিকেও শিক্ষার ব্যয়ের কথা চিন্তা করতে হয়। তাদেরকেও আর্থিক সংস্থানে সক্রিয় হতে হবে। তাই কোনো পাঠক্রম প্রস্তাবনায় কমিউনিটির আর্থিক ক্ষমতা অবশ্যই বিবেচনার প্রয়োজন। পাঠক্রম প্রণেতাগণ চারটি দিক থেকে আর্থিক উপাদানকে বিবেচনা করবেন—প্রাথমিক ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়, পরিপূরক ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যয়। যেমন—একটি কম্পিউটারের পাঠক্রমের জন্য প্রাথমিক খরচ হল কম্পিউটার ক্রয়; কম্পিউটার চালু রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় প্রয়োজন; পরিপূরক ব্যয় বলতে বোঝায় বিদ্যুৎ, কলেজ ইত্যাদির জন্য ব্যয় এবং ব্যক্তিগত ব্যয় হল কম্পিউটার-অভিজ্ঞ শিক্ষকের জন্য ব্যয়।

পরিবেশগত বিষয় (Environmental Aspect)

এখানে পরিবেশ বলতে বোঝায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কমিউনিটির প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ স্বাভাবিক হতে পারে এবং মনুষ্যসৃষ্ট হতে পারে। মানবজাতির অস্তিত্ব ও বিকাশ নির্ভর করে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক পরিবেশ ও সম্পদের ব্যবহারের উপর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করে, প্রয়োজন মতো পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে আমরা অভূতপূর্ব উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নতি আমাদের অনেক ক্ষতিরও কারণ ঘটেছে। যেমন—পরিবেশদূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে, বস্তি অঞ্চল বিস্তৃতি লাভ করেছে, নতুন ধরনের রোগ দেখা দিয়েছে, মারাত্মক মারণাস্ত্র তৈরি হয়েছে এবং মূল্যবোধের অবনমন হয়েছে।

পাঠক্রম রচয়িতাগণ যেমন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির কথা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবেন তেমনি এর ক্ষতিকর দিকটিও পাঠক্রমে উল্লিখিত থাকবে। এই ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন সে ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠক্রম রচয়িতাদের বিশেষ নজর রাখতে হবে। পাঠক্রমের অন্যতম দায়িত্ব হল পরিবেশকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো। প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সাহিত্য, জ্ঞান ও দক্ষতা পাঠক্রমের এই উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে।

প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় (Institutional Aspect)

কোনো প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম প্রস্তুতকালে পাঠক্রম প্রণেতাদের প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সমাজ তার বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়। প্রতিষ্ঠান সমাজেরই একটি উপব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে পাঠক্রম প্রণেতাগণ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি বিশেষ করে এর কার্যকরী দিকের প্রতি বিশেষ নজর দেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় (Educational Aspect)

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) কোন্ স্তরের জন্য পাঠক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে—প্রাক্-প্রাথমিক, প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি।

(খ) কোন্ ধরনের শিক্ষা যেমন সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা ইত্যাদি। সাধারণ শিক্ষায় যে সব বিষয়বস্তু এবং কার্যাবলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় বৃত্তি শিক্ষার পাঠক্রমে তার থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন হয়।

(গ) পাঠক্রম সমাপ্ত করার জন্য কী পরিমাণ সময় বরাদ্দ করা হয়েছে এক বছর, দু-বছর বা তিন বছর।

(ঘ) পাঠক্রম কীভাবে বাস্তবীকরণ বা প্রয়োগ করা হবে, কী ধরনের শিক্ষাপোকরণ প্রয়োজন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কীভাবে এবং কত সময়ের জন্য দেওয়া হবে।

(ঙ) পাঠক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতি যেমন গঠনমূলক, সমষ্টিমূলক, শিক্ষকদের বক্তব্য এবং মন্তব্য, শিক্ষার্থীদের মন্তব্য ইত্যাদি।

(চ) প্রণীত পাঠক্রম কত বছরের জন্য স্থায়ী হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে পাঠক্রম প্রণয়নে নির্ধারক সমূহ অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষা দর্শনের উপর যেমন আদর্শবাদী শিক্ষা দর্শন, প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দর্শন দেন, প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন, মানবতাবাদী শিক্ষা দর্শন, অস্তিত্ববাদী শিক্ষা দর্শন ইত্যাদি, তবে উপরে আলোচিত নির্ধারকগুলি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পাঠক্রম প্রণয়নের তত্ত্ব
(Theories of Curriculum Development)

পাঠক্রম প্রণয়নের তত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভেই পাঠক্রমের তত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পাঠক্রমের তত্ত্বের ধারণা ও গুরুত্ব (Concept and Importance of Curriculum Theory)

পাঠক্রম সম্পর্কিত নানাবিধ তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উত্তরের প্রধান উৎস হল পাঠক্রমের তত্ত্ব। এই জিজ্ঞাসাগুলি হল পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদান বা নির্ধারক, কীভাবে পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয়, পাঠক্রমের বাস্তবিকীকরণ এবং মূল্যায়ন কীভাবে হবে ইত্যাদি। পাঠক্রমের তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি পাঠক্রমের সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা এবং পাঠক্রমের লক্ষ্য নির্ধারণ, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তি কী।

যে সব বিষয়গুলির উপর পাঠক্রমের তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তা হল;

—পাঠক্রমের বিকাশ অর্থাৎ পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং নতুন কোনো চিন্তাভাবনা।

—পাঠক্রমের সক্রিয়তা যা পাঠক্রমকে প্রভাবিত করে বা বাধার সৃষ্টি করে।

—পাঠক্রমের মূল্যায়ন, পাঠক্রমে নতুন চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি এবং তার সমর্থন।

—পাঠক্রমের উপকরণ অর্থাৎ শিক্ষকদের নির্দেশিকা, পাঠ্যপুস্তক এবং শিখন সামগ্রী।

পাঠক্রমের তত্ত্বের কার্যকারিতা নির্ভর করে

—কীভাবে পাঠক্রম কার্যকরী হবে এবং যে সব উপাদান বা পাঠক্রম কার্যকরীকরণে প্রভাব সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।

—পাঠক্রমকে আরও কার্যকরী করে তোলা যার ফলে পাঠক্রমকে আরও যুক্তিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে।

—পাঠক্রমিক বিষয়গুলিকে আরও সংগঠিত করে তোলা যাতে তাৎক্ষণিকভাবে বা সাময়িকভাবে কিছু করার প্রয়োজন হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, পাঠক্রমের তত্ত্ব শব্দটিকে বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহার না করাই সংগত। তবে বাস্তব প্রমাণ সাপেক্ষে হাইপোথিসিস বা প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

পাঠক্রম তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Curriculum Theories)

শিক্ষার্থী এবং আর্থসামাজিক পরিবেশের ভিত্তিতে পাঠক্রমের তত্ত্বগুলিকে প্রক্রিয়ামূলক (Process) এবং গঠনমূলক (Structural) হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এ ব্যতীত আরও কিছু তত্ত্ব আছে যার উদ্দেশ্য হল কী ধরনের জ্ঞান পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ও তার যুক্তি প্রদান করা যাতে পাঠক্রম যুক্তিপূর্ণ হয় এবং বৈধতা পায়।

প্রক্রিয়ামূলক তত্ত্ব (Process Theory)

পাঠক্রমের প্রক্রিয়া তত্ত্বের ভিত্তি হল বহুস্তরীয় যুক্তির অবতারণা করা যা সমবেতভাবে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে পাঠক্রমের বিকাশকে স্থায়ী করে। চিন্তাপূর্ণ যোগাযোগ (Reflective thinking) এবং মিথস্ক্রিয়া (Interaction) ব্যতীত পাঠক্রমে নতুন কোনো চিন্তা-ভাবনা প্রকৃত অর্থে স্থায়ী হয় না। এই মিথস্ক্রিয়া এবং অভিযোজন adjustment বা মানিয়ে চলা হল পাঠক্রমের প্রক্রিয়ামূলক তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নতুন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে অভিযোজনের অর্থ হল নতুন চিন্তা-ভাবনাকে অনুধাবন করা এবং তার যোগাযোগ (Communication) রক্ষা করা এবং বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এর মূল্য বা প্রয়োজনীয়তাকে বোঝা। একই সঙ্গে স্থানীয় পরিস্থিতিতে এর কার্যকারিতা পরিমাপ করা।

এইভাবে বলা যায় প্রক্রিয়ামূলক তত্ত্বে পাঠক্রম পরিবর্তনে সে সূচনা করা হয় তার প্রধান বিষয়গুলি হল;

—ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পাঠক্রম পরিবর্তনের চাহিদা এবং প্রাসঙ্গিকতাকে কীভাবে বিচার করে।

—সময়ের প্রেক্ষিতে, সদিচ্ছা এবং বিকল্পের তুলনায় পরিবর্তনের ক্ষমতা কতখানি।

—পাঠক্রম কর্মসূচির গুণগত মান এবং অভিযোজনের পরিমাণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পাঠক্রমের প্রক্রিয়ামূলক তত্ত্বের সমর্থকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ***Ranekh*** (1987) এবং ***Hamejer*** (1978)।

গঠনমূলক পাঠক্রমের তত্ত্ব (Structural Theory of Curriculum)

গঠনমূলক পাঠক্রমের তত্ত্বে যে বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল—

বিষয়বস্তুর সীমারেখার মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং তার সংগঠনকে নির্দিষ্ট করা এবং তার যৌক্তিকতা বিচার করা। এই ধরনের তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে তিন ধরনের উৎকর্ষতা অর্জন করবে। যেমন—

1. বিষয় এবং ইন্টার ডিসিপ্লিনারি (বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্সম্পর্ক) বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করবে।
2. সমাজের চাহিদার সঙ্গে মোকাবিলা (Coping) করবে।
3. ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

উপরোক্ত উৎকর্ষতাগুলিকে ভিত্তি করে পাঠক্রম প্রণেতাগণ পাঠক্রমের লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থির করবেন। কোনো কোনো গঠনবাদী তাত্ত্বিকগণ পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবার অনেকে কোন্ কোন্ জ্ঞানগুলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যাবলি, আর্থিক প্রসঙ্গ, ধর্মীয় এবং সমাজ-রাজনৈতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পাঠক্রমের গঠনমূলক তত্ত্বের সমর্থকগণের মধ্যে একটি শ্রেণি হল জ্ঞানবাদী (Epistomologists) যারা পূর্বে উল্লিখিত বিষয়সমূহের জ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হন। এরা জ্ঞানকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—পুনঃ ব্যবহারযোগ্য (Replicable), সংযোগমূলক (Associative), ব্যবহারযোগ্য (Applicable) এবং মতব্যমূলক (Interpretative)।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে গঠনমূলক পাঠক্রম তত্ত্বের সমর্থকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ***Robinsonte, Bruner*** (1960), ***Broedy*** (1976) প্রমুখ।

পাঠক্রমের আরোহী এবং অবরোহী তত্ত্ব (Inductive and Deductive Theory of Curriculum)

Kerr-এর মতে পাঠক্রমের তত্ত্ব পাঠক্রম সম্পর্কীয় চারটি বিষয়ের উপর দর্শন, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে উদ্দেশ্য, জ্ঞান, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কিত যে-কোনো তাৎক্ষণিক সমস্যার উত্তর দিতে সক্ষম হবে।

তিনি আরও বলেন পাঠক্রমের তত্ত্ব গঠনে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় আরোহী এবং অবরোহী।

অবরোহী (Deductive)

এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য বিষয় বা ডিসিপ্লিন থেকে তাত্ত্বিক সূত্র (Formula) গ্রহণ করে, ধারণা (Concept) প্রতিস্থাপন করে, প্রকল্প বা হাইপোথিসিস গঠন করে, নিয়ম অনুসরণ করে এবং পর্যবেক্ষিত (Observed) তথ্যকে পরীক্ষা করে।

যেসব পাঠক্রমিক তত্ত্ব অবরোহী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তা হল—

1. ফর্মাল তত্ত্ব (Formal Theory)—নির্দিষ্ট বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্যকে ব্যাখ্যা করে বিশেষ করে তার কাঠামোকে।
2. রিয়েলিটি তত্ত্ব (The Reality Theory)—এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল:
   (i) বিষয়বস্তুর পাঠদানে কয়েকটি প্রস্তাবের উল্লেখ করে।
   (ii) অংশগুলি কীভাবে সম্পর্কিত হয় এবং কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা ব্যাখ্যা করে।
3. ভ্যালুয়েশনাল তত্ত্ব (Valuational Theory)—প্রধানত পাঠক্রমের উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে এই তত্ত্বটি সংযুক্ত।
4. প্রক্সিলজিক্যাল তত্ত্ব (Proxilogical Theory)—কীভাবে পাঠক্রমের উদ্দেশ্যগুলিকে সঠিকভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে অনুমান করে।

অবরোহী পদ্ধতিগুলির সমালোচনার প্রসঙ্গে বলা হয়—

(ক) মানুষের কার্যাবলি যা অনেকাংশে মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল অবরোহী যুক্তির সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

(খ) পাঠক্রম মূল্যায়ন অবরোহী যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

আরোহী (Inductive)

আরোহী (Inductive) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন উৎস থেকে পর্যবেক্ষিত তথ্যগুলিকে সংশ্লেষিত করে পাঠক্রমে রূপ দেওয়া হয়। পাঠক্রম প্রণয়নকারীরা পাঠক্রম বিকাশের ভিত্তি নির্দিষ্ট করে এবং এর প্রেক্ষিতে পাঠক্রমের নকশা এবং মূল্যায়নের সুপারিশ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা হল এখানে কোনো মৌলিক তত্ত্ব নেই। অর্থাৎ পাঠক্রমের সিদ্ধান্তগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য সুপরিকল্পিত কোনো নীতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না।

তা ছাড়া এই মডেলে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। সেইজন্য পাঠক্রমের নিয়ত পরিবর্তশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় না।

পাঠক্রমের স্পাইরাল তত্ত্ব (Spiral Theory of Curriculum)

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **মিয়েল** *(Miel)* পাঠক্রম তত্ত্বের একটি গতিশীল মডেলের কথা উল্লেখ করেছেন, এই মডেলে পাঠক্রমের পরিবর্তনশীলতাকে স্পাইরাল (Spiral) আকারে রূপ দেওয়া হয়। স্পাইরাল যত ঊর্ধ্বে ওঠে ততই এটি বৃহৎ হয় এবং একটি সময় রেখার (Time line) ভিত্তিতে প্রতিটি স্তরে যে ধরনের বিষয় এবং চিন্তাভাবনাগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত সেইগুলি দেওয়া হয়।

আরও সহজভাবে বলতে গেলে, কোনো আলোচনা শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে বিন্যাস করা হয়। যেমন সম্রাট আকবর সম্পর্কে আলোচনা অষ্টম শ্রেণিতে হয় আবার আরও উচ্চশ্রেণিতেও হয়। অষ্টম শ্রেণিতে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় সেইগুলি উচ্চশ্রেণিতে আরও বিস্তৃত হয় এবং গভীরভাবে হয়। এককথায় বলা যায় একটি বিষয় শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পাঠক্রমকে যখন রূপ দেওয়া হয় তাকে স্পাইরাল পাঠক্রম (Spiral curriculum) বলে। এই ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত এবং গভীরতা পায়। শিক্ষার্থী বিভিন্ন শ্রেণিতে কোনো একটি বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করে। পরবর্তী স্তরে ওইগুলি একত্রিত হয় যার ফলে জ্ঞান ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়। এখানে শিক্ষার্থী একাধিকবার একই বিষয় পড়ে যদিও তার বিস্তার এবং গভীরতায় পার্থক্য আছে। প্রতিটি শিক্ষাস্তরেই শিক্ষার্থীকে বিষয়টি পড়তে হয় যার ফলে জ্ঞান গভীরতা এবং স্থায়িত্ব পায়।

এই পদ্ধতির প্রধান সমালোচনা হল পাঠক্রমের অংশগুলির বিকাশ (যেমন উদ্দেশ্য, জ্ঞান এবং শিখন অভিজ্ঞতা) একইভাবে গড়ে ওঠে না যা এই তত্ত্ব অনুমান করে।

পাঠক্রমের অন্যান্য তত্ত্বসমূহ (Other Theories of Curriculum)

পাঠক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে পাঠক্রমের সমন্বিত (Consolidate) তত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তেমনি অনেকে মনে করেন পাঠক্রমের নকশাকরণ শিক্ষার দার্শনিক বিস্তার উপর নির্ভরশীল।

হলমস *(Holmes)*-এর মতে ইউরোপে পাঠক্রমের উপর চার ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব দেখা যায়। প্রাচীন তত্ত্বগুলির ভিত্তি হল অপরিহার্যবাদ (Essentialism) এবং এনসাইক্লোপিডিয়াবাদ (Encyclopaedism)। অপেক্ষাকৃত নতুন তত্ত্বগুলি হল প্রয়োগবাদ (Pragmatism) এবং পলিটেকনিয়াসিস (Polytechnicialism)।

অপরিহার্যবাদ অনেকাংশেই আদর্শবাদীদের (Idealists) পাঠক্রমের ন্যায়। এখানে শ্রেণিভিত্তিক সুবিধাবাদী পার্থক্যকে স্বীকার করে এবং রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক নেতৃত্বের বক্তব্যকে শিক্ষাক্ষেত্রে শিরোধার্য হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিমূর্ত বিষয়গুলিকে অনুশীলন করা হয়, বৃত্তি শিক্ষা বিবেচনা করা হয় না। সাধারণ শিক্ষায় যে সব বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল—সংগীত, জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), জ্যামিতি এবং গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দ এবং দর্শন। তর্কবিদ্যা হল এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে অপরিহার্য (Essential) জ্ঞান অর্জন করা হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়াবাদে মনে করা হয় সমস্ত রকমের মানবজ্ঞান অর্থাৎ সর্বজনীন শিখন শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে। প্রথমে শিখন হবে ইন্দ্রিয়ের (Senses) মধ্য দিয়ে, যেখানে জ্ঞান প্রকৃতি (Nature) থেকে অর্জন করা হয়। শিশুরা মাতৃভাষা এবং ব্যাকরণকে সামনে রেখে পড়া এবং লেখা শিখবে। গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলি, পরিমাপ এবং মূল্যবোধ অর্জন করবে। অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প ইত্যাদি মাতৃভাষায় শিখবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসবাদকে ভিত্তি করে যে পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয় তাকেই পলিটেকনিকবাদ পাঠক্রম বলা হয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে থাকবে ঐতিহাসিক এবং মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়গুলি। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণি দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণি সংগ্রামকে উত্তমভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

প্রয়োগবাদী পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল শিশুদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল করে তোলা এবং গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করবে। শিক্ষার্থীরা সমস্যাসমাধান সংক্রান্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। প্রসঙ্গত বলা যায় জন ডিউই হলেন প্রয়োগবাদের অন্যতম স্রষ্টা। তিনি মনে করেন উৎপাদনমূলক কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে আদর্শবাদের উপর নয় শিক্ষাকে তিনি (জন ডিউই) প্রক্রিয়ামূলক বিষয় হিসাবে মনে করতেন কোনো বিষয়বস্তুর মডেল হিসাবে নয়।

প্রয়োগবাদে দু-ধরনের পাঠক্রম দেখা যায়—উন্নয়নমূলক (Progressive) এবং পুনর্গঠনমূলক (Reconstructive)। প্রথমোক্ত পাঠক্রমে শিশুকেন্দ্রিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরের অর্থাৎ পুনর্গঠনমূলক পাঠক্রমে মনে করা হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সমাজের পুনর্গঠন।

সবশেষে বলা যায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাদের পাঠক্রম হল এনসাইক্লোপেডিক পাঠক্রম। তবে গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রমে প্রয়োগবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ebook.dascoaching.in

স্তরভিত্তিক পাঠক্রম—প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক
(Stage Specific Curriculum–Pre-Primary, Primary, Secondary, Higher Secondary)

স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় সতেরো বছর পরে কোঠারি কমিশন (1964-66) সর্বপ্রথম জাতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর যেমন প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের সুপারিশ করে এবং তা পরে চালু হয়। এইগুলি হল;

❶ প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (Curriculum for Pre-Primary Stage)

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির 'Committee on child care (1961 62)' মতামতকে গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুপারিশ করেন—

খেলাধুলা (Play Activities)

(i) এর মধ্যে রয়েছে খেলনা। এখানে বিভিন্ন Indoor এবং Outdoor খেলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে সব শিশু মুক্তভাবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। (ii) শারীরিক ক্রিয়াকলাপ। (iii) শারীরশিক্ষা—যার মধ্যে রয়েছে সাধারণ ব্যায়াম, নাচ ইত্যাদি। (iv) মানসিক শিক্ষা—যার মধ্যে রয়েছে বাগান তৈরি, বিভিন্ন সামাজিক সহজ কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। (v) প্রাকৃতিক বস্তু ও বিশেষভাবে তৈরি জিনিসপত্র দিয়ে শিক্ষা। (vi) বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ; আঙুলের দক্ষতা বাড়ে এমন ধরনের কাজ ইত্যাদি। এই কারণে অঙ্কন, পেন্টিং, গান প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হল। (vii) শিখনমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে ভাষা, স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম, প্রাথমিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা (অর্থাৎ প্রকৃতিতে আশ্রিত বিভিন্ন জীবন, জীবজন্তু সম্বন্ধে ধারণা)। (viii) গণনা শেখা ও পাটিগণিত শেখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। (ix) স্কুলের জীবনযাত্রায় নিজের কাজ নিজে করার ইচ্ছা (বড়োদের সাহায্য নিয়ে)।

❷ প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (Curriculum for Primary Stage)

কোঠারি কমিশন প্রাথমিক স্তরকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—নিম্নপ্রাথমিক স্তর (প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি) এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তর (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি)।

(ক) নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) (Curriculum for Lower Primary Stage)

(a) একটি ভাষা—মাতৃভাষা অথবা একটি আঞ্চলিক ভাষা।

(b) **গণিত** (a) ও (b)-এর উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে শিশুদের মধ্যে শিখনের প্রাথমিক ধারণাও (basic tools) বিকাশসাধন করা যায়।

(c) **পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা** (III & IV-এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা থাকা দরকার, তবে এই বিষয়গুলিতে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে)। IV-এর শিক্ষার্থীদের Roman alphabet শিক্ষা দিতে হবে। এ ছাড়া ম্যাপ, চার্ট ও রাশিবিজ্ঞানের টেবিল ব্যবস্থা শেখানো দরকার।

(d) **সৃজনশীল কাজ**—সংগীত, কলা, নাটক ও বিভিন্ন হাতের কাজ করতে হবে শিশুদের নিজেদের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের জন্য।

(e) **কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা**— কাগজ কাটা, কার্ডবোর্ড কাটা ও ভাঁজ করা, মাটি বা প্লাস্টিসিন দিয়ে মডেল তৈরি, সুতো কাটার কাজ, ছুঁচের কাজ, রান্নার কাজ, বাগান তৈরি ইত্যাদি। এই স্তরে সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে পড়ে ক্লাসঘর পরিষ্কার, স্কুল সাজানো ইত্যাদি।

(f) **স্বাস্থ্য শিক্ষা**—এই স্তরে শিশুদের ভালো স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া দরকার।

(খ) উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি) (Curriculum for Upper Primary Stage)

❸ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম
(Curriculum for Secondary Stage of Education)

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে কোঠারি কমিশন দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—নিম্ন মাধ্যমিক (নবম থেকে দশম শ্রেণি) এবং উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)

(ক) নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম (Curriculum for Lower Secondary)

(a) ***তিনটি ভাষা আবশ্যিক।*** অহিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের শিশুদের পড়তে হবে—(i) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা, (ii) উচ্চ অথবা নিম্নস্তরের হিন্দি, (iii) উচ্চ বা নিম্নস্তরের ইংরেজি।

হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের শিশুদের পড়তে হবে—(i) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, (ii) ইংরেজি (অথবা হিন্দি যদি ইংরেজি মাতৃভাষা হয়), (iii) হিন্দি ছাড়া অন্য আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা। এ ছাড়াও আরও একটি প্রাচীন ভাষাকে ঐচ্ছিক হিসেবে নেওয়া যাবে। এ ছাড়াও রাশিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, চাইনিজ অথবা জাপানি ভাষা শেখানোর জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা দরকার। প্রতিটি রাজ্যে কয়েকটি নির্বাচিত স্কুলে ওই ভাষাগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই ভাষাগুলি আলাদাভাবে অথবা ইংরেজি বা হিন্দির বদলে পড়তে পারে।

(b) **গণিত**—প্রচলিত গণিতের মধ্যে যেমন পাটিগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রাশিবিজ্ঞান, ক্যালকুলাস ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়গুলিতে up to date করা প্রয়োজন। 'Set language'-এর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(c) *বিজ্ঞান*—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞান আবশ্যিক হিসেবে পাঠক্রমে দিতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিজ্ঞানের পাঠক্রমের বিষয়বস্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে হওয়া দরকার।

(d) *সমাজবিজ্ঞান*—ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান। তবে এইসব শিক্ষার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় গভীরতা আনতে হবে। বর্তমানের সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং প্রয়োজনানুযায়ী এইসব বিষয়গুলিকে পৃথক বিষয় হিসেবে পড়াতে হবে।

(e) *চারুকলা*

(f) *কর্মশিক্ষা*—কর্মশিক্ষার মধ্যে থাকবে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, চামড়ার কাজ, সিরামিক, সাবান তৈরি, সেলাই, ইলেকট্রিক্যাল রিপেয়ারিং, মডেল তৈরি, সরল বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তৈরি, ক্লাসঘর সাজানো, বই বাঁধানো, কার্পেট তৈরি, দর্জির কাজ, খেলনা তৈরি, বাস্তুর যত্ন নেওয়া, শস্যের যত্ন নিতে শেখানো, মাটির যত্ন নিতে শেখানো ইত্যাদি। কর্মশিক্ষার জন্য কৃষি খামার, ওয়ার্কশপ ও অন্য উৎপাদনশীল ইউনিট-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

(g) *সমাজসেবা*—প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজসেবার কাজ করতে হবে। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজের জন্য বছরে 10 অথবা নিম্ন মাধ্যমিক মোট স্তরটির জন্য 30 দিন নির্দিষ্ট করতে হবে। স্বাধীন জনজীবনের নানা কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজসেবা পরিকল্পনা প্রথা করতে হবে।

(h) *শারীরশিক্ষা*—শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন Sports, games এবং atheletics-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(i) *সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা*—এক্ষেত্রেও প্রাথমিক স্তরের মতো সপ্তাহে একটি অথবা দুটি পিরিয়ড এই ধরনের শিক্ষার জন্য রাখতে হবে। এই স্তরে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ (value) নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা দরকার।

সুতরাং কমিশন উচ্চপ্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয়গুলিই পড়ানোর কথা বলেছেন, তবে বিষয়গুলির ব্যাপকতা ও গভীরতা বাড়াতে হবে।

(খ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম (Curriculum for Upper Secondary)

স্কুলের দশ বছর শেষ করার পর একটি সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হবে এবং এর পরে শিক্ষার্থীরা বিশেষ আগ্রহ ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে আর সেইসময় সুপরিচালনা ও সুনির্দেশনার মাধ্যমে তাকে ভবিষ্যৎ শিক্ষাক্রম ও বৃত্তি নির্বাচন করতে সাহায্য করা প্রয়োজন। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা দরকার। এই কারণে

কমিশন দশম শ্রেণি পাস করা ছাত্রছাত্রীর 50%-এর জন্য সাধারণ শিক্ষা ও 50% ছাত্রছাত্রীদের জন্য পূর্ণ সময়ের বা আংশিক সময়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলা হয়। কমিশন টেকনিক্যাল, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়গুলিকে বিশেষ ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানোর কথা বলেছেন। তৎকালীন প্রচলিত ধরনের elective বিষয়গুলিকে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে পড়ানোর কথা বলেছেন। তবে সুপারিশে একথাও বলা হয় যে, দুটি বিভাগের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকবে না অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা তিনটি elective বিষয়ের মধ্যে পছন্দমতো বিষয় গ্রহণ করতে পারবে। তারা বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়কেও যেমন পড়তে পারবে তেমনি দুটি বিজ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে একটি কলা বিষয় বা একটি বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে দুটি কলা বিষয় বা তিনটি কলা বিষয়কে elective বিষয় হিসেবে নিতে পারবে।

এই তিনটি elective বিষয় ছাড়াও একজন ছাত্র আরও পড়াশোনার দুটি ভাষা বেছে নিতে পারবে। এই বিষয়গুলি নিম্নমাধ্যমিক স্তরের তিনটি ভাষার মধ্যে যে-কোনো দুটি হতে পারে। তবে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ভাষাগুলি ছাড়াও একজন শিক্ষার্থী যে-কোনো আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা বা যে-কোনো বিদেশি ভাষা অথবা যে-কোনো প্রাচীন ভাষা নিতে পারবে। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হিন্দি অথবা আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজি নেবে। এ ছাড়াও কমিশন বেশ কিছু নির্বাচিত স্কুলে ইংরেজি ছাড়াও বিদেশি ভাষা হিসেবে রাশিয়ান ভাষা পড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছিল।

সুতরাং কোঠারি কমিশনের উচ্চমাধ্যমিক (XI & XII) স্তরের পাঠক্রম হল নিম্নরূপ—

1. ভাষা—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজি, যে-কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যে-কোনো আধুনিক বিদেশি ভাষা, যে-কোনো প্রাচীন ভাষা তার মধ্যে যে-কোনো দুটি।
2. নীচের মধ্য থেকে যে-কোনো তিনটি elective বিষয় হিসেবে বেছে নিতে হবে—
   (a) একটি অতিরিক্ত ভাষা, (b) ইতিহাস, (c) ভূগোল, (d) অর্থনীতি, (e) তর্কবিদ্যা, (f) মনোবিজ্ঞান, (g) সমাজবিজ্ঞান, (h) চারুকলা, (i) পদার্থবিদ্যা, (j) রসায়ন, (k) গণিত, (l) জীববিজ্ঞান, (m) ভূ-তত্ত্ব, (n) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান।
3. কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা।
4. শারীরশিক্ষা।
5. চারুকলা বা হস্তশিল্প।
6. নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

এইগুলি কমিশনের সুপারিশমাত্র। এই পাঠক্রম স্থির করবে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাদেশিক সরকারের স্কুলশিক্ষা বোর্ডগুলি, প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদের তৈরি একটি expert body।

এ ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন স্কুলের বিষয়গুলি নিয়ে advanced course চালু করতে পারেন। প্রথমে কয়েকটি ভালো স্কুলে এই ধরনের advanced course চালু করা যেতে পারে। সুতরাং ভালো স্কুলগুলিতে দু-ধরনের পাঠক্রম থাকবে—

(a) সাধারণ ছাত্রদের জন্য এক ধরনের পাঠক্রম।

(b) ভালো শিক্ষার্থীদের জন্য advanced course।

Advanced Course সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ

(a) Class VII থেকে এটা শুরু হবে। তবে এটি ছাত্রদের ঐচ্ছিক হিসেবে গণ্য হবে।

(b) নিম্নমাধ্যমিক স্তরে গণিত, বিজ্ঞান ও ভাষার উপর advanced course চালু করা যেতে পারে।

(c) তবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই advanced course প্রতিটি বিশেষ বিষয়ের জন্য করা দরকার। তবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শেষের ক্ষেত্রে দুই-এর বেশি বিষয়ে advanced course-এর ব্যবস্থা থাকবে না।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কর্মশিক্ষার বিষয়গুলির মধ্য থেকে গ্রহণ করতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কৃষি খামারে কাজের বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই স্তরে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ও চাষবাসের কাজকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম প্রচলিত হওয়া উচিত।

তাই কমিশন মনে করেন, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনের জন্য school assembly, বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, সমস্ত ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, কর্মশিক্ষা, খেলাধুলা, বিভিন্ন ধরনের সমাজ-সেবামূলক প্রোগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব, শৃঙ্খলা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সততা ইত্যাদি বিভিন্ন গুণাবলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি ছাড়াও কমিশনের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল—

(a) ছেলে অথবা মেয়েদের জন্য আলাদা কোনো পাঠক্রম থাকবে না। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান আবশ্যিক হবে না।

(b) তবে মেয়েদের অধিকাংশের জন্য গান, চারুকলার ব্যবস্থা থাকবে। তাদেরকে গণিত ও বিজ্ঞান পড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে।

(c) বুনিয়াদি শিক্ষার মূল কথা হল বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজ, উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে পাঠক্রমের সমন্বয়, জনজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ

ইত্যাদি। কিন্তু কোঠারি কমিশনের report-এ কোন্ বিশেষ শিক্ষাকে বুনিয়াদি শিক্ষা বলা হবে—এই ধরনের শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ঈশ্বর ভাই প্যাটেল কমিটি, আদিশোফিয়া কমিটি, জাতীয় শিক্ষা নীতি (1986), NCERT (2000) ইত্যাদি। জাতীয় স্তরে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পাঠক্রম সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন সহ কোঠারি কমিশনের পাঠক্রমই চালু আছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম
(Curriculum for Pre-Primary, Primary Secondary & Higher Secondary Stages of West Bengal)

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের সব রাজ্যগুলি এবং ইউনিয়ন টেরিটরিকে জাতীয় স্তরের পাঠক্রমকে ভিত্তি করে রাজ্যভিত্তিক প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়। নিম্নে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পাঠক্রম উল্লেখ করা হল।

❶ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum for Pre-Primary Education)

এই স্তরের পাঠক্রম সম্পূর্ণভাবে খেলা ভিত্তিক। কোঠারি কমিশনে এই স্তরের পাঠক্রমে যে সব খেলাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তাকেই অনুসরণ করা হয় (যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) তবে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করে।

❷ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum of Primary Stage)

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রচলিত রয়েছে সেটি প্রণীত হয়েছিল 1979 খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের বিনয় ভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত রাজ্য সরকার নিযুক্ত একটি শিক্ষাকমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের একটি আদেশনামা অনুসরণে।

এই কমিটির মূল সুপারিশগুলি গ্রহণ করে রাজ্য সরকার 1980-81 শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিতে এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করেন। তার পূর্বে বিদ্যালয়গুলিতে রাজ্য সরকার প্রবর্তিত 1950 খ্রিস্টাব্দের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত ছিল। তবে বর্তমানে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

পরবর্তীকালে অশোক মিত্র কমিশন (1991) এবং পবিত্র সরকার কমিটি (1998) খ্রিস্টাব্দে পাঠক্রমকে কিছু পরিবর্তন করা হয় তবে বর্তমানে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

1. প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে (1996) জ্যাকিডেলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি শিক্ষার চারটি স্তম্ভ নির্দেশ করেছিলেন, যথা—জ্ঞানের জন্য শেখা (learning to know), কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য শেখা (learning to do), প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে শেখা (learning to be) এবং একত্রে বাঁচতে শেখা (learning to live together)। নতুন পাঠক্রম পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার এই চার স্তম্ভের বিষয়টি মনে রাখা হয়েছে।
2. শ্রেণি দিবসের সঙ্গে সংগতি রাখা হয়েছে।
3. স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
4. মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
5. বর্তমান পাঠক্রমে মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে অবিকৃত রেখে অধিকতর প্রাসঙ্গিক বিষয় সংযোজন করে নতুন পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি তৈরি হয়েছে।

পাঠক্রম হল একটি সমন্বিত কর্মধারা, যার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও অভীষ্ট সাধিত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পাঠক্রমের রূপরেখা নীচের বিষয়গুলির সমন্বয় হিসাবে প্রণীত হয়েছে। যেমন—

1. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ।
2. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ।
3. পঠনপাঠন নির্ভর কাজ।

পঠনপাঠন নির্ভর কাজের আগেই স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হল। কারণ—সুস্থ শরীর না হলে সুস্থ মন তৈরি হতে পারে না এবং সুস্থ শরীর ও মনের সমন্বয় ব্যতীত কোনোরকম শিক্ষাগ্রহণই সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

	পিরিয়ডের সংখ্যা
গড় বয়স—আনুমানিক 5+ ও 6+ বছর সময় প্রতিদিন—30 মিনিট	1ম পর্ব—(মে—আগস্ট)—41 2য় পর্ব—(সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর)—37 3য় পর্ব—(জানুয়ারি—এপ্রিল)—57

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

কৃত্যসূচি

স্বাস্থ্যশিক্ষা

একক 1: ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন—নখ, চুল, দাঁত.....ইত্যাদির যত্ন, জামা, পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি।

একক 2: প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ। যেমন—আহার, মলমূত্র ত্যাগ, নিয়মিত স্নান ইত্যাদি।

একক 3: সপ্তাহের বা মাসের একটি বিশেষ দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

শারীরশিক্ষা: শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলি অনুশীলন ও প্রয়োগ—হামাগুড়ি দেওয়া, বসা, হাঁটা, আরামে দাঁড়ানো, জোড়পায়ে লাফানো, ঝোলা, ছোঁড়া, টানা, চড়া ইত্যাদি।

সহজসাধ্য খেলা: হাতির মতো চলা, সাইকেল চালানো, ঘোড়ার মতো চলা, পাখির মতো ওড়া, ইঁদুর-বিড়াল, চোর-পুলিশ এবং গল্পচ্ছলে খেলা, ছড়ার মাধ্যমে খেলা ইত্যাদি। খালি হাতের ব্যায়াম, পদ্মাসন, বজ্রাসন, শবাসন। জিমন্যাসটিক্স্ (প্রস্তুতিমূলক অভ্যাস)।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিন মাস অন্তর শিক্ষার্থীর উচ্চতা, ওজন, ছাতির মাপ ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি

	পিরিয়ডের সংখ্যা
আনুমানিক গড় বয়স 7+ থেকে 8+ বছর সময় প্রতিদিন—30 মিনিট	1ম পর্ব—(মে-আগস্ট)—41 2য় পর্ব—(সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)—37 3য় পর্ব—(জানুয়ারি-এপ্রিল)—57

কৃত্যসূচি

স্বাস্থ্যশিক্ষা: 1ম ও 2য় শ্রেণির অভ্যাসের অনুশীলন। প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের অভ্যাস গঠন।

গ্রাম ও শহরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংক্রামক রোগ সম্পর্কে ধারণা ও প্রতিরোধের পদ্ধতি সম্বন্ধে জানা।

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শারীরশিক্ষা: পূর্ববর্তী শ্রেণির কাজগুলি নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে।

সহজসাধ্য খেলা—স্ট্যাচু খেলা, নেতা খোঁজা, রেলগাড়ি, অশ্বচালনা, চোর-পুলিশ, বুড়ি ছোঁওয়া, ছড়ার মাধ্যমে খেলা, রিলে গেমস জাতীয় খেলা।

লোকনৃত্য—ঝুমুর, সারি, বাউল, করমনাচ, পাতানাচ।

জিমন্যাসটিক্স—ডিগবাজি খাওয়া, গোরুর গাড়ির চাকা, ব্যাং ভাসা।

যোগাসন—পূর্ববর্তী আসনের অভ্যাস এবং ধনুরাসন, সর্বাঙ্গাসন, ভুজঙ্গাসন।

অ্যাথলেটিক্স—50 মিটার দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চলম্ফন, টেনিসবল ছোড়া, কবাডি, খোখো, ফুটবল খেলা।

শিক্ষক দ্বারা শরীর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তালিকা প্রস্তুত করা।

পঞ্চম শ্রেণি

	পিরিয়ডের সংখ্যা
আনুমানিক গড় বয়স 9 + বছর সময় প্রতিদিন—30 মিনিট	1ম পর্ব—(মে-আগস্ট)—41 2য় পর্ব—(সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)—37 3য় পর্ব—(জানুয়ারি-এপ্রিল)—57

কৃত্যসূচি

স্বাস্থ্যশিক্ষা

1. দেহের গঠন ও কার্যাবলি।
2. ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা।
3. সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক চেতনা।
4. নিরাপত্তা, সেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা।
5. পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ও শারীরিক বিকাশ।
6. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমাজসেবামূলক কাজ।
7. শিক্ষিকা-শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও স্বাস্থ্যপত্র নিয়মিত রক্ষা করা।

শারীরশিক্ষা: পূর্ববর্তী শ্রেণির কাজগুলি আরও উচ্চতর পর্যায়ে এই শ্রেণিতে অভ্যাস করতে হবে।

বিভিন্ন গঠনমূলক ব্যায়াম।

কাঠিনৃত্য, বীরনৃত্য, কোদাল চালাই, ব্রতচারী, লোকনৃত্য।

যোগাসন—উপরোক্ত কৃত্যসূচি এবং সলভাসন, গোমুখাসন, হলাসন।

জিমন্যাস্টিক্স—পূর্বের এবং পিরামিড, আর্চ, হেডস্ট্যান্ড, হ্যান্ডস্ট্যান্ড, ময়ূর চলা, লাঠি, কুস্তি, ক্যারাটে।

অ্যাথলেটিক্স—দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চলম্ফন, লৌহবল নিক্ষেপ, রিলে রেস।

খেলাধুলা—কবাডি, খো খো, ক্রিকেট।

ক্রীড়া দিবস ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও পরিচালনা।

শারীরিক সক্ষমতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নথিকরণ (শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা)।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ

1. শিশুর নিজস্ব, পারিবারিক ও সমাজজীবন ভিত্তিক কাজ।
2. বিদ্যালয় জীবনের প্রাত্যহিক ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজ এবং উৎসব অনুষ্ঠানের কাজ।
3. শ্রেণি সজ্জার কাজ।
4. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন।
5. আলোচনা সভা, পাঠচক্র এবং সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান।
6. পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ।
7. চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য কিছু সমাজসেবামূলক কাজ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতির জন্য সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনার কাজও করা যেতে পারে।

পিরিয়ড সংখ্যা: সাধারণভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের সংরক্ষণ, খবর, খেলার কাজ, শ্রেণিসজ্জার কাজ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষার কাজ ইত্যাদির জন্য প্রতিদিন 15 মিনিট করে বরাদ্দ করা যেতে পারে। সপ্তাহে মোট 90 মিনিট এইসব কাজের জন্য লাগবে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শুরুতে সমাবেশ, সমবেত সংগীত, প্রেরণামূলক পাঠ ইত্যাদির জন্য প্রত্যহ 15 মিনিট করে মোট 90 মিনিট সপ্তাহে নির্দিষ্ট থাকবে। বিদ্যার্থীর আসর/সাহিত্য সভা ইত্যাদি 30 মিনিট করে, সপ্তাহে একদিন প্রয়োজনে সপ্তাহে দু-দিন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। উৎসব অনুষ্ঠান পালনের জন্য এবং অনুশীলনের জন্য দুই পিরিয়ড সময় বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ ছাড়া থাকবে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণমূলক ভ্রমণ (2/3 পিরিয়ড)।

সৃজনশীল কাজ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

1. চিত্রাঙ্কন। মোট পিরিয়ড 5—বালির উপর কাঠি ও আঙুল দিয়ে ছবি আঁকা, বোর্ডে রঙিন খড়ি দিয়ে, কাগজের উপর কালি দিয়ে।
2. কোলাজের কাজ—পিরিয়ড—5।
3. কাগজের কাজ। থলি, ব্যাগ, টুপি, নৌকা—পিরিয়ড—4।
4. পাতা ও কাঠির কাজ। তাল, নারকেল, খেজুর পাতার খেলনা—পিরিয়ড—4।
5. খেলনা। মাটি-ন্যাকড়ার পুতুল, ডিমের খোসা, দেশলাই বাক্স, খালি শিশি ইত্যাদি দিয়ে খেলনা—পিরিয়ড—5।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি

পূর্বের শ্রেণির পাঁচটি বিভাগের কাজের সঙ্গে নতুন নতুন কিছু কাজ যোগ করা যেতে পারে। আরও বেশি দক্ষতা, ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হয় এমন কাজ।

গৃহে ব্যবহার্য নতুন নতুন জিনিস যেমন, ধূপদানি, পেনদানি, ফুলদানি ইত্যাদি। পাতা দিয়ে আসন, হাত পাখা, রডের ব্যবহার, কারুকার্য যোগ করা যেতে পারে।

উৎপাদনাত্মক কাজ: কাজ শুধু শিক্ষণীয় হলেই চলবে না। কাজটিকে উৎপাদনধর্মীও হতে হবে। উৎপাদন কথাটির অর্থ হল কোনো জিনিস বা কাজের উপকরণকে নিয়ে শ্রমের দ্বারা একটি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা।

পঠনপাঠন নির্ভর বিষয়

প্রথম ভাষা *(বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি)*

প্রথম শ্রেণি

5 + বছর—কিশলয় 1ম ভাগ। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ (1ম ভাগ)।

1. দেখা ও শোনা। 2. শোনা, বোঝা, বলা। 3. পড়া ও লেখা—1500 শব্দ আয়ত্ত করবে।

প্রত্যহ 1টি করে শ্রেণি ঘণ্টা ধরে—সপ্তাহে 6টি শ্রেণি ঘণ্টা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

6 + বছর—কিশলয় 2য় ভাগ। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ (2য় ভাগ)।

1. শোনা, বোঝা ও বলা। 2. পড়া ও লেখা—যুক্তবর্ণ, 2000 শব্দ আয়ত্ত করবে।

প্রত্যহ 1টি করে শ্রেণি ঘণ্টা ধরে—সপ্তাহে 6টি শ্রেণি ঘণ্টা।

তৃতীয় শ্রেণি

7 + বছর—কিশলয় তৃতীয় ভাগ।

1. শোনা, বোঝা ও বলা—যুক্তাক্ষর চিনতে পারা। বর্ণনা, বিবরণ, গল্প বলতে ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারা। 2. পড়া ও লেখা—সুস্পষ্ট উচ্চারণ, অর্ধযতি, যতিচিহ্ন ঠিক রেখে পড়তে পারা। 3000 শব্দ আয়ত্ত করবে।

প্রত্যহ 1টি করে সপ্তাহে মোট 6টি শ্রেণি ঘণ্টা।

চতুর্থ শ্রেণি

8 + বছর—কিশলয় 4র্থ ভাগ।

1. শোনা, বোঝা ও বলা—সাধারণ বক্তব্য বোধসহ শোনা, অপরিচিত কথাবার্তা, আলাপ বুঝতে পারা। 2. পড়া ও লেখা—ভ্রমণ কাহিনি, নাটকের অংশ, হাস্যকৌতুক পড়তে ও লিখতে পারা।

প্রত্যহ 1টি করে সপ্তাহে 6টি শ্রেণি ঘণ্টা।

পঞ্চম শ্রেণি

9 + বছর—কিশলয় 5ম ভাগ।

1. শোনা, বোঝা ও বলা—আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদি বোধসহ শুনতে ও বলতে পারা, অভিনয় দেখে বুঝতে পারা। 2. পড়া ও লেখা—চিঠি, শিশুপাঠ্য পত্রিকা পড়তে ও লিখতে পারা, সুন্দর সমান ছাঁদে লিখতে ও টানা লিখতে পারা, যতিচিহ্ন সহ শ্রুতিলিখন নিতে পারা।

প্রত্যহ 1টি করে সপ্তাহে মোট 6টি শ্রেণি ঘণ্টা।

দ্বিতীয় ভাষা *(ইংরেজি)*

প্রথম শ্রেণি

1. শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে পরিচিত কয়েকটি জিনিসের ইংরেজি নাম বলা। 2. বাংলা ও ইংরেজিতে একই রকম শোনায় এমন কয়েকটি শব্দ দিয়ে তৈরি ছড়া শোনা ও বারবার শিক্ষিকার সঙ্গে বলা। 3. ইংরেজি বর্ণমালা—বড়ো অক্ষর পরিচিতি। 4. ইংরেজি বর্ণমালা—ছোটো অক্ষর পরিচিতি। 5. ইংরেজি অক্ষর দিয়ে তৈরি ছড়া শুনে বলা।6. 1 থেকে 10 পর্যন্ত ইংরেজি সংখ্যা পরিচিতি। বাংলা সংখ্যার সঙ্গে ইংরেজি সংখ্যা মিলিয়ে বারবার বলা। 7. 11-20 পর্যন্ত ইংরেজি সংখ্যা বারবার বলা।

সংখ্যাগুলির বিষয়ে ছড়া—শোনা ও বলা।

অনুশীলনীর মাধ্যমে 11-20 পর্যন্ত সংখ্যা শেখা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

1. মাতৃভাষায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দ সহকারে লিখিত দুটি ছড়া পরিচিতি। 2. ইংরেজি আরও একটি ছড়া পড়া। 3. মাতৃভাষায় ছড়ার মাধ্যমে ইংরেজিতে বড়ো ও ছোটো দু-ধরনের বর্ণের পরিচিতি। 4. ইংরেজি বড়ো ও ছোটো বর্ণগুলি পর পর সাজানো 5. ছবির মাধ্যমে ইংরেজি শব্দ শেখা। 6. ছড়া ও ছবির সাহায্যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত ইংরেজি সংখ্যার নাম শেখা। 7. এলোমেলোভাবে দেওয়া ইংরেজি সংখ্যাগুলি চেনা ও পড়া। 8. ইংরেজি সংখ্যার পাশে বাংলার সঠিক সংখ্যা বসানো। 9. ছড়ার মাধ্যমে নানারকম ধারণা সম্পর্কে বাংলার কয়েকটি শব্দের ইংরেজি শব্দ শেখা। 10. ছড়ার সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে কিছু ইংরেজি শব্দ পড়া ও লেখা।

English

তৃতীয় শ্রেণি

(i) Recognition and Pronunciation of English names. (ii) Recognition and writing of capital and small letters. (iii) Writing of numerals upto 50. (iv) Reading words and forming words by inserting letters. (v) Copying words and sentences. (vi) Use of Pronouns. (vii) Rhymes.

চতুর্থ শ্রেণি

(i) Vowels and Consonants. (ii) Use of A and An. (iii) Use of This and That. (iv) Use of Pronouns. (v) Days and Months. (vi) Rhymes.

পঞ্চম শ্রেণি

(i) Use of Introductory There. (ii) Use of verb to Have. (iii) Common use of 'The'. (iv) Use of Parts of Speech. (v) Practice in English writing. (vi) Practice in listening and speaking English.

গণিত

প্রথম শ্রেণি

1. কমবেশি, লম্বা-খাটো, ভারী-হালকা। 2. 1-9 পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে আগের, পরের ও মাঝের সংখ্যা চিনতে পারা। বেশি, কমের ধারণা, সমান, অসমান, বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর ধারার জন্য গাণিতিক প্রতীক বা চিহ্নের (< >) অবতারণা করতে হবে। 3. +, – এর ধারণা দিতে হবে। 4. যোগ, বিয়োগের নামতা তৈরি (যোগফল 9-এর বেশি হবে না এবং বিয়োগফল 1 এর কম হবে না)। 5. ০ প্রতীক এর অবতারণা। 6. মুদ্রা পরিচিতি। 7. সময় পরিচিতি। 8. যোগ, বিয়োগের সহজ সমস্যার সমাধান। 9. স্থানীয় মান অনুসারে দু-অঙ্কবিশিষ্ট দুটি দুটি করে সংখ্যা স্তম্ভাকারে সাজিয়ে যোগ, বিয়োগ অনুশীলন (হাতে থাকবে না এবং ফল 99-এর বেশি হবে না)।

দ্বিতীয় শ্রেণি

1. প্রথম শ্রেণি পাঠের অনুশীলন। 2. 1-99 পর্যন্ত আগের ও পরের, মাঝের সংখ্যা নির্ণয়। 3. একক, দশক, শতক। 4. হাজারের স্থানীয় মানের ধারণা। 5. স্থানীয় মানের ছকে দু-অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে হাতে থাকে এমন যোগ অঙ্ক এবং পরে তিনটি সংখ্যা নিয়ে যোগ। 6. গুণ ছোটো, ছোটো। 7. ভাগ। 8. মুদ্রা অধিকতর ব্যবহার। 9. লম্বা, খাটো, ভারী, হালকা আরও সুস্পষ্ট করা। 10. তরল পদার্থ পরিমাপ। 11. সময়, পরিমাপ, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড, ঘড়ি দেখতে ও পড়তে শেখানো।

তৃতীয় শ্রেণি

দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠের পুনরনুশীলন (একক—দেড়মাস)।

1. স্থানীয় মানের বিস্তার ঘটিয়ে ছয় অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে ও পড়তে পারা। 2. কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ ছয় অঙ্কের মধ্যে থাকবে। 3. 11 থেকে 20-এর ঘর পর্যন্ত গুণের নামতা তৈরি ও ব্যবহার করতে শেখা। 4. স্থানীয় মান অনুযায়ী দুই তিন বা ততোধিক অঙ্কের সংখ্যার গুণ। 5. স্থানীয় মান অনুযায়ী ভাগ। 6. মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা। 7. ভগ্নাংশ। 8. দশমিক ভগ্নাংশের অবতারণা। 9. ওজন পরিমাপ, তরল পদার্থের আয়তন। মিটার, গ্রাম, লিটার। 10. দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড।

চতুর্থ শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণির পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস)।

1. স্থানীয় মানের আরও বিস্তার আট অঙ্ক পর্যন্ত। 2. গুণ ভাগের বাস্তব সমস্যার সমাধান। 3. লসাগু, গসাগু—সমস্যা সৃষ্টি। 4. ভগ্নাংশ 5. দশমিক ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ। 6. গড়। 7. ঐকিক নিয়ম। 8. দশমিকের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। 9. পরিমাণ, ওজন পরিমাপ, তরল।

পঞ্চম শ্রেণি

চতুর্থ শ্রেণির পাঠের পুনরনুশীলন।

1. ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। 2. দশমিক ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ। 3. সাধারণ ভগ্নাংশ—দশমিক ভগ্নাংশ। দশমিক ভগ্নাংশ—সাধারণ ভগ্নাংশ। 4. ঐকিক নিয়ম। 5. শতকরা। 6. হিসাব রক্ষণ। 7. বিভিন্ন একক। 8. জ্যামিতি। 9. আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের অঙ্ক (ক্ষেত্রফল, পরিসীমা)। 10. স্তম্ভ লেখচিত্র।

পরিবেশ পরিচিতি

প্রথম শ্রেণি

1. শিশুর পরিচয়—বাবা, মা, ভাই-বোনের নাম—গ্রাম ও শহরের নাম। 2. শিশুর বাড়িঘর—কোন্ ঘর কীজন্য ব্যবহার করা হয়। 3. পাকা ঘর, কাঁচা ঘর সম্পর্কে ধারণা। 4. কীসের জন্য বাড়িঘরের দরকার। 5. কাছাকাছি কোনো বাড়ি পর্যবেক্ষণ। 6. মাটি, দেশলাই বাক্স দিয়ে ঘর তৈরি। 7. কোলাজ পদ্ধতিতে বাড়ি তৈরি। 8. শিশুর বিদ্যালয়—বিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা। 9. শ্রেণিকক্ষের নকশা আঁকা।

দ্বিতীয় শ্রেণি

1. শিশুর পারিবারিক পরিবেশ। 2. বাড়িঘর—কীসের জন্য তৈরি হয় এবং কী দিয়ে। 3. কাঁচা, পাকা বাড়ি তৈরির উপাদান সম্পর্কে ধারণা। 4. কাঁচা, পাকা বাড়ির মডেল। 5. রোদ, হাওয়া, পানীয় জল কেন দরকার। 6. বাড়িতে উঠোন থাকার সুবিধা ও অসুবিধা। 7. শিশুর পাড়ার পরিবেশ। 8. পাড়ার বিভিন্ন মানুষের পেশা। 9. চাষের খেত, তাঁত ঘর, কারখানা পর্যবেক্ষণ করা। 10. বিভিন্ন যানবাহনের মডেল ও ছবি। 11. সূর্য, চন্দ্র, তারা। 12. পারিবারিক নানা অনুষ্ঠান। 13. ফল, ফুল। 14. উৎসব, মেলা।

ইতিহাস

তৃতীয় শ্রেণি

প্রথম পর্ব (মে-আগস্ট) পিরিয়ড—18।

পাঠ একক: 1. আজকের কথা, 2. আদিমযুগের কথা, 3. মানুষ জোট বাঁধল—কথা বলল, 4. গুহাবাসী মানুষ, 5. উন্নত হাতিয়ার, 6. পশুপালন, 7. গোচারণ।

দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 8. চাষবাস, 9. চাকা, 10. ধাতুর ব্যবহার, 11. শিল্প ও কারিগরি বোঝাপড়া, 12. গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, 13. ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দান প্রথা।

তৃতীয় পর্ব (জানুয়ারি-এপ্রিল) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 14. মানুষের নানা সংস্কার ও অনুষ্ঠান। 15. নদীর অববাহিকা অঞ্চলের সভ্যতা। 16. লোহার আবিষ্কার। 17. সভ্যতার অবদান।

চতুর্থ শ্রেণি

প্রথম পর্ব (মে-আগস্ট) পিরিয়ড—18।

পাঠ একক: 1. পুরোনো যুগের কথা, 2. কারখানা, 3. দেশে দেশে নতুন সভ্যতা।

দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 3. দেশে দেশে সাম্রাজ্য। 4. দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী মানুষের কথা।

তৃতীয় পর্ব (জানুয়ারি-এপ্রিল) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 5. শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি জগতের সৃষ্টিশীল মানুষ। 6. মধ্যযুগে সভ্যতার অবদান।

পঞ্চম শ্রেণি

প্রথম পর্ব (মে-আগস্ট) পিরিয়ড—18।

পাঠ একক: 1. বাণিজ্যের প্রসার, ভৌগোলিক আবিষ্কার। 2. আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। 3. শিল্প ও কৃষির প্রসার। 4. একালের যোগাযোগ ব্যবস্থা। 5. ভিন্ন দেশ দখলের লড়াই।

দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 6. দেশে দেশে নব চেতনার বিকাশ ও উন্মেষ। 7. নানা দেশে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। 8. ভারতে নবচেতনার বিকাশ। 9. ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন।

তৃতীয় পর্ব (জানুয়ারি-এপ্রিল) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 10. মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। 11. ভারতের শাসনতন্ত্র ও পৌরনীতি।

ভূগোল

প্রথম পর্ব (মে-আগস্ট) পিরিয়ড—18।

পাঠ একক: 1. স্থল, জল, বায়ু—প্রাথমিক পরিচয় ও অন্যান্য জীবের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক। 2. জেলার প্রাথমিক ধারণা, দেশ ও রাজ্যের ধারণা। 3. পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা।

দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 3. অর্থনৈতিক পরিবেশ। 4. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

তৃতীয় পর্ব (জানুয়ারি-এপ্রিল) পিরিয়ড—16।

4. সৌরজগৎ।

চতুর্থ শ্রেণি

প্রথম পর্ব (মে-আগস্ট) পিরিয়ড—18।

পাঠ একক: 1. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিচিতি। 2. অর্থনৈতিক পরিবেশ, কৃষিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, নদী, সমুদ্র, বনজ সম্পদ।

দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক 2. খনিজ সম্পদ।

তৃতীয় পর্ব (জানুয়ারি-এপ্রিল) পিরিয়ড—16।

3. শিল্প সম্পদ। 4. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। 5. জীবিকা। 6. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

পঞ্চম শ্রেণি

প্রথম পর্ব (মে-আগস্ট) পিরিয়ড—18।

পাঠ একক: 1. আমাদের পৃথিবী। 2. আমাদের দেশ ভারতের কথা। 3. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ।

দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) পিরিয়ড—16।

পাঠ একক: 4. অর্থনৈতিক পরিবেশ। 5. অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্য, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

তৃতীয় পর্ব

6. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। 7. ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহের ভৌগোলিক বিবরণ।

প্রকৃতি বিজ্ঞান

তৃতীয় শ্রেণি

পাঠ একক: 1. প্রাকৃতিক পরিবেশ—জীব ও জড়। (ক) পরিবেশের উপাদান। (খ) জড় পদার্থ। 2. সূর্য ও পৃথিবী, চাঁদ। 3. বল ও কার্য। 4. আমাদের দেহ। 5. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জল, খাদ্য, বায়ুর ভূমিকা।

পিরিয়ড সংখ্যা—20।

চতুর্থ শ্রেণি

পাঠ একক: 1. প্রাণী ও উদ্ভিদ। 2. উদ্ভিদ। 3. শক্তি, বল, কার্য। 4. তাপের প্রভাব। 5. আকাশ ও নক্ষত্র। 6. মানবদেহের কয়েকটি শারীরিক প্রক্রিয়া। 7. সাধারণ নিরাপত্তা বিধি।

পঞ্চম শ্রেণি

পাঠ একক: 1. উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ। 2. কয়েকটি প্রাণীর জীবনচক্র। 3. সৌরশক্তি, তড়িৎ, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি। 4. সাধারণ জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছন্দময় করার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি সরলযন্ত্র ও তাদের প্রয়োগ কৌশল। 5. পরিমাপের বিভিন্ন একক। 6. সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ারভাটা, কালপুরুষ। 7. পাথর এবং মাটির প্রকারভেদ ও খনিজ পদার্থ। 8. মানবদেহের শারীরিক প্রক্রিয়া। 9. পরিবেশদূষণ ও প্রতিকার। 10. মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন বিজ্ঞানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের আবিষ্কার।

এ ছাড়াও প্রতিটি শ্রেণিতে মূল পাঠের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কাজের আনন্দ, নৈপুণ্য ইত্যাদির উপায়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে কর্মোদ্যোগ, কর্মসংস্কৃতি, কর্মমানসিকতা, সমবায়িকা কাজের আনন্দ ইত্যাদির উপায় এবং পঞ্চম শ্রেণিতে কাজের আনন্দ, শৃঙ্খলাবোধ সমবেতভাবে কাজ করার আনন্দ, নিপুণতা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

❸ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম
(Curriculum for Madhyamik Stage of Education)

কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত উচ্চ প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরগুলির বদলে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি স্তর নির্দেশ করেছে। (i) মাধ্যমিক স্তর (V থেকে X), (ii) উচ্চমাধ্যমিক স্তর (XI & XII) প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট শিক্ষা মান 10 বছরের, এর পরে রয়েছে দু-বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, (iii) তিন বছরের স্নাতক স্তরের শিক্ষা—স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে (10 + 2 + 3) বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চ প্রাথমিক (কোঠারি কমিশনের সুপারিশ মতো) ও নিম্নমাধ্যমিক দুটি স্তর মিলে বলা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা বা (+2 স্তরের শিক্ষাকে) এবং XI ও XII স্তরের শিক্ষাকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বলা হয়েছে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার পাঠক্রম তৈরির দায়িত্বে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অপরপক্ষে XI ও XII এর পাঠক্রম তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে (i) V-X পর্যন্ত শিক্ষা (ii) XI & XII পর্যন্ত শিক্ষা।

পশ্চিমবঙ্গের পাঠক্রমে কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে যেমন কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে তেমনি পাঠক্রমের মধ্যেও কিছুটা পরিবর্তন আছে। কমিশন উচ্চ প্রাথমিক অর্থাৎ সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ও IX & X এর মধ্যে যে পাঠক্রম প্রস্তাব করেন তাতে যে বিষয়গুলি ছিল সেগুলি—1. মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, 2. হিন্দি বা ইংরেজি (প্রয়োজনে একটি তৃতীয় ভাষা) 3. গণিত, 4. বিজ্ঞান, 5. সমাজবিদ্যা, 6. চারুশিল্প/চারুকলা, 7. কর্মভিত্তিক শিক্ষা ও সমাজসেবা, 8. শারীরশিক্ষা,

9. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিম্নমাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ V-VII পর্যন্ত যে পাঠক্রম চালু করেন সেগুলি হল—

1. ভাষা: প্রথম ভাষা মাতৃভাষা (200 নম্বরের)। (ii) দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) ইংরেজি (100 নম্বরের)। (iii) তৃতীয় ভাষা—যে-কোনো একটি ধ্রুপদি ভাষা (সংস্কৃত বা আরবি)—100 নম্বরের। (তৃতীয় ভাষা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তে হবে না। তবে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে এ দুটি আবশ্যিক, নবম ও দশম শ্রেণির জন্য এটি ঐচ্ছিক।

2. বিজ্ঞান বিভাগ: (i) ভৌত বিজ্ঞান (এতে দুটি অংশ রয়েছে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা) 90 নম্বর।

(ii) জীবন বিজ্ঞান (এতে রয়েছে উদ্ভিদ বিদ্যা, জীবন বিজ্ঞান, শারীরবৃত্তীয় বিজ্ঞান) 90 নম্বর।

(iii) গণিত (Class VI-এ পাটিগণিত ও জ্যামিতি ; Class VII ও VIII পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি ; (IX ও X পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতি)—100 নম্বর।

3. সামাজিক বিজ্ঞান: (i) ইতিহাস—90 নম্বর, (ii) ভূগোল—90 নম্বর।

4. কর্মশিক্ষা বিভাগ: (i) কর্মশিক্ষা, (ii) শারীরশিক্ষা, (iii) সমাজশিক্ষা (এই বিভাগটি ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয়)।

5. অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়: তর্কবিদ্যা, সংস্কৃত, জীবনবিজ্ঞান, মৎস্য চাষ, রসায়ন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, স্ট্যাটিসটিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার ব্যাবহারিক প্রয়োগ, গান ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনো একটি। কোঠারি কমিশনের সঙ্গে 1974 খ্রিস্টাব্দে পাঠক্রম পরিবর্তিত হয়েছিল, পরে আবার 2004 খ্রিস্টাব্দে VI-VIII পর্যন্ত পাঠক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে ও 2005 খ্রিস্টাব্দ থেকে IX-X -এর পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হচ্ছে।

এই পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. এই স্তরের মূল পাঠক্রম 1-3 সাল শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক মোট নম্বর 800 (আটশত)। এদেরকে বলে Core subject।
2. এই পাঠক্রমের উপাদানগুলি বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনুবন্ধনের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। 2004 ও 2005 খ্রিস্টাব্দে যে পাঠক্রম চালু হচ্ছে তাতে বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে ও ভূগোলে পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কর্মশিক্ষা বিভাগটিকে আবশ্যিক রাখা হয়নি।
3. কোঠারি কমিশনের সুপারিশ মতোই 1974 খ্রিস্টাব্দ ও 2004 বা 2005 খ্রিস্টাব্দের মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে ভাষা, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানকে সর্বভারতীয় পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতি রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

4. এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করার জন্য একটি অতিরিক্ত বিষয় স্বাধীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতিকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছে।
5. এই পাঠক্রমে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। মাতৃভাষা—20 নম্বরের, (ইংরেজি ও গণিত বাদে) অন্যান্য বিষয়গুলিতে 10 নম্বর মৌখিক রাখা হয়েছে। সুতরাং একজন শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত বিষয় বাদে 400 নম্বরের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রতিটি গ্রুপে 30% পেতে হবে, তবে যে-কোনো গ্রুপের যে-কোনো বিষয়ে 20 পেলেই সে সেই বিষয়ে পাশ বলে বিবেচিত হবে।
6. তবে বর্তমানে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিবেশ বিদ্যা আলাদা বিষয় হিসেবে পড়ানোর কথা চিন্তা করা হচ্ছে।
7. এ ছাড়াও আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে যৌন শিক্ষা (Sex Education)-কেও এর পরিবর্তে জীবনশৈলী শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়াবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এইসব বিষয়গুলির পাঠক্রমও হয়ে গিয়েছে।
8. এই পাঠক্রমে কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা ও সমাজ সেবামূলক বিষয়গুলি স্থান পেলেও সেগুলিকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে।

সুতরাং বর্তমানে মাধ্যমিক পাঠক্রমে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত অনেক নীতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ত্রুটি: পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পাঠক্রমে অনেক অভিনবত্ব থাকলেও এর মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে—

1. পাঠক্রমে এক একটি এককে নির্দিষ্ট পাতার মধ্যে লিখতে বলা হয়েছে। এইভাবে যাঁরা লিখছেন তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। এরকম ভাবে পাঠক্রম রচিত হলে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু শেখা থেকে বঞ্চিত হবে এবং এর ফলে সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকেও ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বিজ্ঞানের পাঠক্রম অনেকটাই আধুনিক করার চেষ্টা করা হয়েছে তথাপি উপরোক্ত অসুবিধার ফলে শিক্ষার্থীদের সঠিক ধারণা জন্মাবে না।
2. নতুন পাঠক্রমেও ব্যাবহারিক (Practical) পাঠক্রমের কোনো ব্যবস্থা নেই। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক কাজ (Practical) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
3. বর্তমান পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক ক্ষমতা বিকাশের বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। যদিও সব কমিশন ও কমিটির সুপারিশে শারীরশিক্ষা, কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষা, সমাজসেবা বিষয়গুলিকে আবশ্যিক করার কথা বলা হয়েছে; পশ্চিমবঙ্গেরও মাধ্যমিক পাঠক্রমে এই শিক্ষা 1974 খ্রিস্টাব্দের পাঠক্রমে আবশ্যিক ছিল, তবে বর্তমানে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই বিষয়গুলিকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে।

4. ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠক্রমে আচরণগত শিখনসামর্থ্য অর্থাৎ জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতামূলক প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই এ বিষয়ে অবগত নয়, ফলে এই ব্যবস্থা ঠিকমতো অনুসরণ করা হচ্ছে না। আবার নবম ও দশম শ্রেণির নতুন পাঠক্রমের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে একেবারেই চিন্তা করা হচ্ছে না। এ ছাড়া বি.এড পাঠক্রমের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের কোনো যোগাযোগ নেই।
5. পাঠক্রম রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল সক্রিয়তার নীতি। কিন্তু এখন শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা তেমন স্থান পায়নি। পাঠক্রমটি অধিক মাত্রায় তাত্ত্বিক। এই পাঠক্রমের মাধ্যমে শ্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলা যায় না।
6. পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়গুলিকে কাঠিন্যের ক্রম অনুসারে নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও তাদের এক একটি শ্রেণিতে তালিকাবদ্ধ করার সময় মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে সম্পাদনা করা হয়নি।
7. মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষায় পাঠক্রমে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ পাঠক্রমকে আরও আধুনিক করার প্রয়োজন ছিল।
8. পাঠক্রম নির্ধারণের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, পাঠক্রম সব সময় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হলেও পাঠক্রমের উপাদানগুলির সঙ্গে তার যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি।
9. শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করার কোনো বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেই। এমনকি বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠ্যসূচিও তাত্ত্বিক।
10. পাঠক্রমে সহ-পাঠক্রমিক কাজের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
11. পাঠক্রমে নৈতিক ও মূল্যবোধ শেখানোর কোনো ব্যবস্থা নেই।।

❶ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম
(Curriculum of Higher Secondary Education)

1996 খ্রিস্টাব্দ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম চালু করা হয়েছিল। 2005 খ্রিস্টাব্দ থেকে পুনরায় নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে। পাঠক্রমে যে বিষয়গুলি পড়ানো হয় তার মূল কাঠামো হল নিম্নরূপ ঃ

(a) ভাষা: (i) প্রথম ভাষা (200 নম্বরের) বাংলা সহ 14টি ভারতীয় ভাষা-এর মধ্যে যে-কোনো একটি।

(ii) দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি—200 নম্বর)।

তবে যারা প্রথম ভাষা ইংরেজি তাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষা হল মাতৃভাষা।

(b) আবশ্যিক বিষয়সমূহ: মোট 32টি বিষয় রয়েছে। যা নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়।

1. পরীক্ষাগার ভিত্তিক বিষয়—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, হোমসায়েন্স, জীববিদ্যা, ভূগোল, সংগীত, চারুকলা ও হস্তশিল্প, কম্পিউটার সায়েন্স, পুষ্টিবিদ্যা।
2. পরীক্ষাগার বর্জিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে—গণিত, রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, তর্কবিদ্যা শিক্ষা, অ্যাকাউন্ট্যান্সি, কারবার সংগঠন ইত্যাদি। এ ছাড়া এই অংশে কিছু ভাষাকেও রাখা হয়েছে, যেমন—প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, শিক্ষার্থীরা আবশ্যিক ভাষাগুলি যেগুলি নিয়েছে তা বাদে অন্য যে-কোনো ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে পারবে।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ মতোই elective subject নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষাগারভিত্তিক বিষয় বা পরীক্ষা বর্জিত বিষয়গুলির মধ্য থেকে যে-কোনো তিনটিকে গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে চরম বিশেষীকরণের ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী তিনটি বিজ্ঞান বিষয় বা তিনটি কলা বিষয় বা একটি বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে দুটি কলা বিষয় বা একটি কলা বিষয়ের সঙ্গে দুটি বিজ্ঞান বিষয় বা বাণিজ্য শাখার বিষয়গুলির তিনটি বা একটি বা দুটিকে নিতে পারবে।

এ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা ওই elective বিষয়গুলির মধ্য থেকে যে-কোনো একটিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও নিতে পারে।

সুতরাং এই পাঠক্রমে একজন শিক্ষার্থীকে দুটি ভাষার জন্য 400 নম্বর এবং তিনটি elective বিষয়ের জন্য 600 নম্বর, মোট 1000 নম্বর পরীক্ষা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আবশ্যিক। তবে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে আর-একটি বিষয় নিলে তাকে 1200 নম্বরের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তবে অতিরিক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে 60 নম্বর বাদ দিয়ে বাকি নম্বর শিক্ষার্থীর মোট প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়।

এ ছাড়া কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা, N.C.C., সামাজিক শিক্ষা (N.S.S.)—এইসব বিষয়কে সহপাঠস্থমিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এই চারটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোনো একটি বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে বলা হয়েছে তবে এই ক্ষেত্রে মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই এটি কার্যত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু বিদ্যালয় N.C.C., মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিদ্যালয়ে N.S.S. থাকলেও বেশিরভাগ স্কুলগুলিতে এই সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

যদিও 1976 খ্রিস্টাব্দে যখন H.S. (+2) স্তর চালু করা হল তখন এই শিক্ষা স্কুল ও কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানেই পড়ানো হত। যেহেতু কলেজে এই শ্রেণি দুটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম, আবার কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি মূলত বক্তৃতাধর্মী, তাই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের পক্ষে পড়াশোনা বুঝে ওঠাও কঠিন। কারণ অধিকাংশ শিক্ষক কলেজের ধরনেই পড়ান। এই কারণেই H.S. এর ফলাফল স্কুলেই ভালো। এই কারণেই বিগত বছর দুয়েক আগে থেকে কলেজ থেকে H.S. তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষের পাঠক্রম সংস্কার: ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (Curriculum Reforms of India: National Curriculum Framework)

ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক' বলতে সম্ভবত 2005 খ্রিস্টাব্দের ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ককে বোঝানো হয়েছে। তবে যেহেতু শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষা কোর্স পাঠরত বা পাঠরতা তাই ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক—শিক্ষক শিক্ষা উভয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

1. ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (National Curriculum Framework–2005)

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশে এবং NCERT-এর প্রশাসনিক সহায়তায় National Steering Committee 2005-এর ডিসেম্বরে National Curriculum Framework 2005 সরকারি স্তরে একটি দলিল পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে এটি NCERT কর্তৃক প্রকাশিত National Curriculum for School Education 2005 পাঠক্রমের পুনর্গঠিত রূপ। এর প্রধান প্রেক্ষিত হল—(i) ভারহীন শিখন (Learning without burden 1993)-এর রিপোর্ট এবং (ii) শিক্ষা অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়।

পাঠক্রমের প্রণেতাগণ National Curriculum Framework 2005-এ যে রূপরেখা নির্ণয় করেন সেগুলি হল—

(i) বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করা।
(ii) অর্থহীন মুখস্থ পদ্ধতিকে বাতিল করে শিখনকে নিশ্চিত করা।
(iii) পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে শিশুর যাতে সার্বিক বিকাশ ঘটানো যায় তার প্রতি লক্ষ রেখে পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করা।
(iv) পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও নমনীয় করা এবং শ্রেণিকক্ষের জীবনের সঙ্গে তাকে আরও সম্পর্কিত করা।
(v) দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে তোলা এবং তার পরিচর্যা করা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব নতুন চিন্তা করা হচ্ছে তার প্রতিফলন পাঠক্রমে থাকবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এমন কিছু কার্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে পারে এবং সমস্ত শিশু আত্মমর্যাদার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং শিক্ষার প্রতি আস্থা গড়ে ওঠে। Curriculum এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক, আর্থিক পশ্চাৎপদ থেকে যেসব শিশু আসছে তাদের শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্যাবলি মেনে নিয়ে তাদের শিক্ষাকে নিশ্চিত করা যায় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্জন

করতে সক্ষম হয় এবং সাফল্য লাভ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, লিঙ্গ সংক্রান্ত, জাতপাত, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, অসমতা প্রভৃতি কারণে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসুবিধা দেখা যায় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মোকাবিলা করতে হবে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন এর জন্য রাজনীতি যথেষ্ট নয়। শৈশব অবস্থা থেকেই শিখনকে এমনভাবে রূপ দিতে হবে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসমতাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি শিক্ষাচিত্রের মধ্যে যাতে একটা নতুনত্ব নিয়ে আসে সেই বিষয়ে পাঠক্রম প্রণেতাগণ বিশেষ লক্ষ রাখবেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি করতে হবে। এই Curriculum framework-এর অন্যতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে শিক্ষা নির্মাণ করা।

National Curriculum Framework-2005 (Chapter-1)

National Curriculum Framework 2005-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে সেই সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষার চিত্রকে তুলে ধরেছে। প্রসঙ্গত National Curriculum Framework 2000 খ্রিস্টাব্দে যে বিষয়ের উপর তীব্র বিরোধিতা করেছিল তারও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—স্মৃতির অনুশীলন, পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা, অত্যন্ত তথ্য ভারাক্রান্ত, তথ্যকে জ্ঞান বলে মেনে নেওয়া ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় NCF-2000 খ্রিস্টাব্দে যশপাল কমিটির (1993) Learning without burden রিপোর্টে যে শিক্ষার কথা বলা হয় তার পর্যালোচনা করে বলা হয়, এই ধরনের শিক্ষা আদৌ শিশুকেন্দ্রিক নয়। এই Learning without burden-এর প্রতিবেদনে syllabus এবং পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপক পরিবর্তনের সুপারিশ করে। যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার পরিবর্তে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে। এই প্রতিবেদন বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সংগঠন এবং পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের সুপারিশ করে।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের পুনর্গঠনের দিকে নজর রেখে 2005 খ্রিস্টাব্দে Curriculum Framework-এ পূর্বের পাঠক্রমের ত্রুটিগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(i) অনমনীয় ও পরিবর্তনে বাধা।
(ii) শিক্ষাকে একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলে মনে করা হয়। জীবন এবং জৈবিক বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কহীন।
(iii) বর্তমান চিন্তাধারাকে উৎসাহিত না করা।
(iv) সৃজনশীল চিন্তা এবং অন্তর্দৃষ্টিকে উৎসাহ না দেওয়া।
(v) মানুষের ক্ষমতা এবং জ্ঞান নির্মাণের গুরুত্ব না দিয়ে শিখনকে সঞ্চালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
(vi) বর্তমানকে বাদ দিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎকে চিন্তা করা।

ebook.dascoaching.in

পাঠক্রমের প্রণেতাগণ তদানীন্তন বিদ্যালয়ের শিক্ষার চাহিদা, যেমন—শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন, সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং সাফল্যের অনুভূতি লাভের ক্ষেত্রে পাঠক্রমের পুনর্গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পাঠক্রম প্রণেতাগণের বক্তব্য: 2000 খ্রিস্টাব্দে পাঠক্রমের কিছু পুনর্গঠন সত্ত্বেও পাঠক্রমের বোঝা এবং পরীক্ষা কেন্দ্রিকতার কোনো সমাধান হয়নি। পাঠক্রম প্রণেতাগণ এই প্রসঙ্গে দুটি জাতীয় দলিলে NPE-1986 এবং POA-1992 যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। NPE-1986-এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ভৌগোলিক এবং সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্যের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেন। যেখানে POA-1992-তে 14 বছর পর্যন্ত শিশুদের সর্বজনীন নথিভুক্তকরণ, বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার আরও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শিশুকেন্দ্রিক পাঠক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। POA (1992)-তে নমনীয়তা এবং শিক্ষার গুণগত মানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

National Curriculum Framework (2005)-এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই সাধারণ বিষয়গুলি হল—

(i) ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস।
(ii) সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অন্যান্য বিষয় যা জাতীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য। পাঠক্রমে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এই ধরনের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকবে। ভারতবর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি, যেমন—সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিঙ্গের প্রতি সমভাব, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক বাধা দূর করা, ছোটো পরিবার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন প্রভৃতি মূল্যবোধের উপর গুরুত্বদান করতে হবে। সব রকমের শিক্ষামূলক কার্যাবলির মধ্যে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হল ধর্মনিরপেক্ষ ও শান্তির বার্তা। বিশ্বের যাবতীয় দেশগুলির মধ্যে বোঝাপড়া সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা।

Guiding Principle বা রূপরেখা: পাঠক্রম প্রণেতাগণ National Curriculum Framework 2005-এ যে রূপরেখা নির্ণয় করেন সেগুলি হল—

(i) বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করা।
(ii) অর্থহীন মুখস্থ পদ্ধতিকে বাতিল করে শিখনকে নিশ্চিত করা।
(iii) পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিশুর যেন সার্বিক বিকাশ ঘটানো যায় তার প্রতি লক্ষ রেখে পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করা।
(iv) পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও নমনীয় করা।
(v) দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্মবোধ এবং তার পরিচর্যা করা।

❷ **গুণগত মান:** National Curriculum Framework 2005-এর প্রথম ও শেষ কথা হল গুণগত মান বজায় রাখা। UNESCO এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। গুণগত মানের সঙ্গে বস্তুগত পরিকাঠামোর গভীর সম্পর্ক না থাকলেও ন্যূনতম বস্তু সম্পদ বা পরিকাঠামোর গুণগত মান বজায় রাখা প্রয়োজন। গুণগত মান বজায় রাখার জন্য যেগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সেগুলি হল—

(i) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শিক্ষকতা পেশাকে যারা ভালোবাসে সেই ধরনের ব্যক্তিকে এই পেশায় নিযুক্ত করা। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও উল্লেখ করা হয়েছে কোনোভাবেই যেন শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতার মান হ্রাস করা না হয়।

(ii) গুণগত মানের আর-একটি দিক হল শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং দক্ষতাকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা, জ্ঞানের প্রকৃতি এবং শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা সিলেবাস এবং Text book প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(iii) প্রতিটি বিষয়ে কী ধরনের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করানো হবে তা সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল—অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং সংবিধানে যে সমস্ত মূল্যবোধের উল্লেখ আছে তার বাস্তবায়ন ঘটানো। এটা সম্ভব হবে যখন পাঠক্রম সংশোধনে মূল বিষয়টি হবে সামাজিক ন্যায় এবং তার উন্নয়ন করা। প্রথাগত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নাগরিকতার শিক্ষা। সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হবে অন্যতম লক্ষ্য। সংক্ষেপে বলা যায়, শিক্ষার গুণগত মান জীবনের সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত।

❸ **পাঠক্রমের সামাজিক তাৎপর্য:** শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জাতপাত, অর্থনৈতিক অবস্থা, লিঙ্গভেদ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং অসম বিকাশ ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক শ্রেণিভেদে শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। ধনী এবং উচ্চবিত্তদের জন্য বেসরকারি স্কুল এবং নিম্নবিত্ত দরিদ্রের জন্য সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় প্রসারলাভ করেছে, যা সামাজিক ন্যায় এবং শিক্ষার সমসুযোগের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। বিশ্বায়ন এবং মুক্ত অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষিতকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষায় বাণিজ্যকরণ শুরু হয়েছে, অন্যদিকে প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত সরকারি আর্থিক সাহায্য এবং বিকল্প শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার দায়িত্ব ক্রমশ সরকার থেকে পরিবার এবং Community-এর উপর আরোপিত হচ্ছে। শিক্ষা যাতে পণ্যে পরিণত না হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। সংবিধানের 73 এবং 74 নং সংশোধনে শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিউনিটির সিদ্ধান্তের উপর গুরুত্ব

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, দরিদ্র এবং সামাজিক বৈষম্যের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকার এবং সমান মান এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। পাঠক্রম প্রণয়নে শিক্ষার ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগণের আশা এবং প্রত্যাশা অবশ্যই বিবেচিত হওয়া উচিত।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষিত একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে, যা Curriculum framework প্রণয়নে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে বিবেচিত হয়।

❹ **নতুন পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য:** শিক্ষার লক্ষ্যে বর্তমান সমাজের চাহিদা এবং আশা-প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি স্থায়ী মূল্যবোধ, কমিউনিটির সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ এবং মানবিক আদর্শসমূহ শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যেই প্রতিফলিত। লক্ষ্যের অবশ্যই দূরদৃষ্টি থাকা উচিত। শিক্ষামূলক কার্যাবলি বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ এবং শিখনীয় কার্যাবলির মধ্যেই প্রকাশ পায়। এই কারণেই পাঠক্রম উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জনে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হবে এবং যাতে সেটা বিদ্যালয়ের মধ্যেই কার্যকরী হতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। অন্যদের মঙ্গলসাধনের মানসিকতা, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান, মূল্যবোধ গঠনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সৃজনশীল সম্পর্ক গঠনে প্রয়োজন হল কীভাবে শেখা যায় তা শেখা, পুনর্বার শিক্ষা এবং কোনো কোনো সময় না শেখার ইচ্ছাও গুরুত্বপূর্ণ। National Curriculum Framework 2005-এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্বদান। শিক্ষার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বিকশিত হবে। শিক্ষা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে। এর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সমন্বয়করণ, কর্মসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। সমাজ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে বোঝা এবং অন্যান্যদের সহযোগিতামূলক কাজ করার ক্ষেত্র নিশ্চিত করবে। কাজের মধ্যে দিয়েই সমাজ সম্পর্কিত মানসিকতা গড়ে উঠবে। সৌন্দর্য অনুভূতি এবং শিল্প মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার মাধ্যমেই শিশু তার সৃজনশীলতার প্রকাশ এবং সৌন্দর্য অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

উপরোউক্ত লক্ষ্যগুলি শিক্ষার লক্ষ্যের একটা সাধারণ কাঠামো। কীভাবে এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করা যাবে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকে না। পাঠক্রম প্রণয়নে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে।

Curriculum Framework-2005 (Chapter-2)

National Curriculum Framework 2005-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে শিশুকে একজন স্বাভাবিক শিক্ষার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরের শিশুর সক্রিয়তাকে জ্ঞান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শৈশবকাল বা বাল্যকাল হল বৃদ্ধি এবং পরিণমনের সময়কাল। এই সময়ে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ পূর্ণতা পায়। শিশুর সামাজিকীকরণ ঘটে। সে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে,

নির্মাণ করে এবং অন্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে।

❶ **পাঠক্রমের প্রাণকেন্দ্র হল শিখন:** Curriculum Framework 2005-এ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে বোঝায় শিশুদের অভিজ্ঞতা, তাদের মতামত এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্বদান। এর জন্য প্রয়োজন হল শিশুদের মনস্তত্ত্ব এবং আগ্রহের উপর ভিত্তি করে শিখন পরিকল্পনা। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের সামাজিকীকরণ এবং শিক্ষাগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুদের মতামত এবং তাদের অভিজ্ঞতা শ্রেণিকক্ষে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ নেই। এখানে শিশুরা শেখে একটা ভয়ের পরিবেশে, কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলে যা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। শিখনের মধ্যে যে আনন্দ আছে এবং সাফল্যের অনুভূতি আছে সেই পরিবেশ তারা পায় না। ফলে প্রকৃত শিখন তাদের ঘটে না।

এই পাঠক্রম Framework-এ শারীরিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— বিদ্যালয়ে আসতে গেলে অনেক দূর হাঁটতে হয়, ব্যাগের বোঝা খুব ভারী। সময় তালিকা এমন যেখানে শিক্ষার্থীরা বিশ্রাম পায় না, খেলার সুযোগ নেই। যার ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত আনন্দজনক নয়। সুতরাং পাঠক্রমকে শিখন এবং বিকাশকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে তার প্রতি নজর দিতে হবে।

❷ **বিকাশ এবং শিখন:** সমস্ত ধরনের বিকাশের প্রাক্‌শর্ত হল শিশুর সুস্থ শারীরিক বৃদ্ধি। খেলার মাঠ, উপকরণ এবং নিয়মাবলি বিদ্যালয়ের সমস্ত শিশুর খেলার সুযোগ তৈরি করে এবং কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। অল্পবয়সি শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে। বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটলে শিশু নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজের শিখনকে তারা নিজেই পরিচালনা করতে পারে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন—

(i) সমস্ত শিশুই শিখতে আগ্রহী এবং শেখার ক্ষমতার অধিকারী।
(ii) শিখনের বিশেষ দিকগুলি হল বিষয়কে অর্থবহ করে তোলা এবং বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ করাও কাজ করা।
(iii) শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। যেমন—অভিজ্ঞতা অর্জন, বিভিন্ন ধরনের কাজ করা, পরীক্ষা করা, পাঠ করা, জিজ্ঞাসা, চিন্তা ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে প্রয়োজন হলে এসব ব্যাপারে তাদের সুযোগ করে দেওয়া।
(iv) উপযুক্ত বৌদ্ধিক বিকাশ না ঘটলে শেখানো উচিত নয়। সেটা পরবর্তী স্তরে ক্ষতিকারক। শিশুরা অনেক কিছু মনে করতে পারে, কিন্তু বোঝে না বা পরিবেশের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে পারে না।

(v) বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই শিখন ঘটে। যদি এই দুটি কাজের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটানো যায় তাহলে শিখন সমৃদ্ধ হয়।
(vi) শিখনে যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার। যার ফলে শিক্ষার্থীরা ধারণাগুলিকে বুঝতে পারে। শুধু মনে রেখেই পরীক্ষায় ভালো ফল করা যথেষ্ট নয়।
(vii) প্রথমত অনেক শিখন অন্যদের সাহায্য ছাড়াই ঘটে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ এবং অন্য বয়স্ক ব্যক্তিরাই হল শিখনের পথ।

❸ **জ্ঞান নির্মাণের জন্য শিখন:** বর্তমানে প্রচলিত জ্ঞানের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানকে এমনভাবে রূপ দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান নির্মাণ করতে পারে। তাদের অর্জিত ধারণা, অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষকদের দেওয়া পাঠদান নিজেদের মতো করে গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষক সর্বদাই চেষ্টা করবেন শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তার দ্বারা জ্ঞানকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে।

❹ **শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ বিন্যাস করা:** শিখনের মান শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিখনীয় কর্মসূচিকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই অন্যান্য উৎস থেকে জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত হয়। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থী যাতে শিখনীয় বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে পারে তার জন্য তাকে সময় দিতে হবে।

❺ **পরিকল্পনাকরণ:** শিখন অবশ্যই সক্রিয়তাভিত্তিক হবে। শিখন অভিজ্ঞতাগুলিকে নিম্নোক্তভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন। যেমন—

(i) কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা।
(ii) দেহ এবং মনসংক্রান্ত কাজগুলি, যেমন—কোনো কিছু পরিকল্পনা করা, তাকে উপস্থাপন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে।
(iii) শিশুর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তার ব্যবহার করা।
(iv) পাঠদান করার পর শিক্ষক আলোচনার ব্যবস্থা করবেন এবং শিখন, অঙ্কন এবং প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

❻ **জ্ঞান এবং বোধগম্যতা:** (শিক্ষার্থীর মৌলিক ক্ষমতাসমূহ) পাঠক্রমে এমন সব অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা প্রয়োজন যা যুক্তিসম্মত চিন্তা, জগৎকে বোঝা, সৌন্দর্যানুভূতি লাভ করা, অপরের প্রতি অনুভূতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশ করা যায়। ব্যাপক অর্থে শিশুদের মৌলিক ক্ষমতাগুলি হল সেইসব ক্ষমতা যা তাদের মধ্যে বোধগম্যতা, মূল্যবোধ এবং দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করে। National Curriculum Framework 2005-এ এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

(i) ভাষার বিকাশ,

(ii) সামাজিক জগতের সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের সম্পর্ক।

(iii) কাজ করার ক্ষমতা এবং সক্রিয়তা, দেহ সঞ্চালনের সঙ্গে চিন্তন এবং ইচ্ছার সংযোগ ঘটানো, দক্ষতা এবং বোধগম্যতা, উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্টতা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

❼ **বোধগম্যতার প্রকৃতি:** বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়কে বোঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন—

(i) গণিতের ক্ষেত্রে মৌলিক সংখ্যা, বর্গক্ষেত্র, গাণিতিক প্রক্রিয়া, বর্গমূল, ভগ্নাংশ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। এও বুঝতে হবে যে, গণিতে যথার্থতা অনেক সময় প্রমাণিত হয় না এবং তাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা যায় না। কতকগুলি অনুমান, সংজ্ঞা এবং তাদের ভেতরে পারস্পরিক যৌক্তিকতা গণিতের মূলভিত্তি।

(ii) বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলির যথার্থতার জন্য পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ করা যায়। সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিষয়গুলির নিজস্ব ধারণা, অর্থ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ Community, আধুনিকতা, সংস্কৃতিইত্যাদি। সামাজিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল মানুষকে বোঝা এবং সমাজবদ্ধ মানুষকে বোঝা। শিল্প এবং সৌন্দর্যানুভূতি হল সংহতি এবং ছন্দময়তা। শিল্পকলাকে কোনো বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায় না। নৈতিকতা মানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা আবার সামাজিক নীতি ও আদর্শমানের পরিচয়।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে বলা যায় যে, পাঠক্রম প্রণেতাগণ যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেবেন সেগুলি হল জ্ঞানমূলক নির্মিতিবাদ, নৈতিকতা, চিন্তন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করা, সমন্বয়মূলক শিখন, সমস্যামূলক শিখন ইত্যাদি।

❽ **শিশুদের জ্ঞান এবং স্থানীয় জ্ঞান:** National Curriculum Framework 2005 আধুনিক পাঠক্রম যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছে তা হল—পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের সঙ্গে দৈনন্দিন জ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধন করা। স্থানীয় Community শিখনে প্রভাব বিস্তার করে, কমিউনিটি সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীকে সমাজ-বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে যা জ্ঞান শিখনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সব কিছু অর্থবহ হয়ে ওঠে। প্রচলিত পাঠক্রমে এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়নি। সেই কারণে নতুন পাঠক্রমে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিদ্যালয়কে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে উন্মুক্ত করতে হবে। এর কারণ কেবল এই নয় যে, স্থানীয় পরিবেশ এবং শিশুর নিজের অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জনের প্রবেশপথ। এ ছাড়াও এর আর-একটি কারণ হল শিশুর অর্জিত জ্ঞানকে বিশ্বজগতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এটা কেবল লক্ষ্য অর্জনের পথ নয়, লক্ষ্য এবং পথ উভয়ই। এর অর্থ এই নয় যে জ্ঞানকে কার্যকরী

এবং তাৎক্ষণিক করে তোলার জন্য সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এর অর্থ হল জগতের সঙ্গে জ্ঞানকে আরও গতিশীল এবং অর্থবহ করে তুলতে হবে।

❾ **বিদ্যালয় এবং কমিউনিটি সম্পর্কে জ্ঞান:** বিদ্যালয় এবং কমিউনিটির মধ্যে যাতে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং মত বিনিময় হয় সে বিষয়ে পাঠক্রম প্রস্তুতকারীগণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক বিষয়গুলির উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। Community ভিত্তিক পরিচিতি, যেমন—ধর্ম, শ্রেণি, জাতপাত, লিঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেগুলির কিছু ক্ষতিকারক দিক আছে। যেমন—সামাজিক অসমতা, শ্রেণিগত ঊর্ধ্বক্রমিকতা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে যাতে শিক্ষার্থীরা সামাজিক বাস্তবতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে পাঠক্রম নজর দেবে। কমিউনিটির প্রত্যাশা সম্পর্কে বিদ্যালয়কে সচেতন হতে হবে এবং বিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তগুলির শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিউনিটিকে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

NATIONAL CURRICULUM FRAMEWORK-2005 (CHAPTER-3)

পাঠক্রমের বিভিন্ন দিক, বিদ্যালয় স্তর এবং পরিমাপ—

National Curriculum Framework-এর তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে ৪টি ভাগের কথা বলা হয়েছে।

(A) ভাষা, (B) গণিত, (C) বিজ্ঞান, (D) সমাজবিজ্ঞান, (E) শিল্পশিক্ষা, (F) স্বাস্থ্য এবং শারীরশিক্ষা, (G) কাজ এবং শিক্ষা, (H) শান্তির জন্য শিক্ষা। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

A. ভাষা: ভাষা দক্ষতা, বক্তব্য এবং শ্রবণ করা, পঠন এবং লিখন প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(i) ত্রিভাষার সূত্র—স্থানীয় ভাষা বা মাতৃভাষা হবে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম।

(ii) অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো ইংরেজি ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(iii) ভারতীয় সমাজে বহু ভাষাভাষী দিকটির উপর বিদ্যালয় জীবনে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

B. গণিত: গণিত শিখনে প্রথাগত ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে যুক্তিক্ষমতা এবং বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

C. বিজ্ঞান: শিক্ষার্থীদের বয়স এবং তাদের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিজ্ঞানের বিষয় ও প্রক্রিয়া ঠিক করতে হবে। বিজ্ঞান শিখনে কৌতূহল ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহদান, পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয় পাঠক্রমে পরিবেশ বিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

D. সমাজবিদ্যা: সমাজবিদ্যার তথ্যগুলিকে কেবল মুখস্থ করার পরিবর্তে সমাজবিদ্যার ধারণাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থী নিজে যাতে চিন্তা করতে পারে এবং সামাজিক বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের ভিতরে আন্তঃশৃঙ্খলা বজায় রেখে জাতীয় বিষয়গুলি, যেমন—লিঙ্গ, ন্যায়, মানুষের অধিকার, সংখ্যালঘু, প্রান্তীয় জনগণের প্রতি অনুভূতিশীলতা ইত্যাদি উপলব্ধি করতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আমাদের জীবনে ইতিহাসের গুরুত্ব, অতীতের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদির প্রতি নজর দিতে হবে।

প্রাথমিক শ্রেণিতে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে ভাষা এবং গণিতের সঙ্গে সমন্বিত করে ব্যাখ্যা করতে হবে। শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে অংশগ্রহণকারী এবং আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে পরিবেশবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হবে।

শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা, যেমন—দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, নিরক্ষরতা, জাতপাত, গ্রাম এবং শহরের শ্রেণিগত অসমতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। শিখনীয় বিষয়বস্তু শিশুদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।

উচ্চপ্রাথমিক বা নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হবে। যার মধ্যে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান। ইতিহাসে থাকবে ভারতের বিভিন্ন অংশের বিকাশ সংক্রান্ত তথ্য। এর পাশাপাশি কোনো কোনো অংশে থাকবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিকাশের ইতিহাস।

ভূগোলে অন্তর্ভুক্ত হবে স্থানীয় থেকে বিশ্বের সর্বত্র কীভাবে পরিবেশ, সম্পদ এবং বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তথ্য, তত্ত্ব এবং আলোচনা।

পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হবে কীভাবে স্থানীয়, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে সরকার গঠিত হয় এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করে। এর পাশাপাশি থাকবে সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে সাধারণ জনগণ কীভাবে গণতান্ত্রিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞানে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, পৌরবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি। সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে এইসব বিষয় আলোচিত হবে। জাতীয় জীবনে এই সমস্ত বিষয় কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে হবে, যেমন—আদিবাসী, দলিত, প্রান্তীয় জনগণ ইত্যাদি। ইতিহাস বিষয়ে থাকবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আধুনিক ইতিহাস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হবে। ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের অন্যান্য অংশের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কীভাবে বিভিন্ন দেশ ক্ষমতা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কার্যকরী করে সে ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। ভূগোল এমনভাবে পড়াতে হবে

যেতে শিক্ষার্থী পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্রিয় হয়।

পৌরবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে চিহ্নিত হবে। পঠন এবং পাঠনের মূল লক্ষ্য হবে ভারতীয় সংবিধানের কাঠামো গঠনে দার্শনিক ভিত্তিগুলি কী অর্থাৎ সমতা, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, বহুত্ববোধ এবং শোষণ থেকে মুক্তি।

E. শিল্প শিক্ষা: এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সংগীত, নৃত্য, নাটক, শিল্পকলা ইত্যাদি।

F. স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা: শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে এটি বিশেষ প্রয়োজন।

G. কাজ এবং শিক্ষা: প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিষয়টি থাকবে এবং শিক্ষাগত মূল্য, যেমন—জ্ঞানার্জন, কায়িক দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

H. শান্তির জন্য শিক্ষা: বিদ্যালয়ের সব স্তরেই বিভিন্ন বিষয় এবং কার্যাবলির মধ্য দিয়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

I. বাসস্থান ও শিখন: সমস্ত বিষয়ের শিখনের মধ্য দিয়েই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

⑩ শিক্ষার স্তর এবং পরিমাপ

এই পর্যায়ে আলোচনাগুলি হল—

(i) প্রাক্-শৈশব শিক্ষাব্যবস্থা।
(ii) প্রারম্ভিক শিক্ষাব্যবস্থা।
(iii) মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা।
(iv) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা।
(v) মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা এবং ব্রিজ শিক্ষাব্যবস্থা।

Our Online Class>>
www.online.dascoaching.in

⑪ পরিমাপ ও মূল্যায়ন

(i) পরিমাপের উদ্দেশ্য,
(ii) শিক্ষার্থীদের পরিমাপ,
(iii) শিক্ষাদানের কোর্সের পরিমাপ,
(iv) পাঠক্রমের যে অংশে নম্বর দেওয়া যাবে না তার পরিমাপ।
(v) পাঠক্রমের নকশা এবং পরিচালনা,
(vi) স্বপরিমাপ এবং ফিডব্যাক,
(vii) যে সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট করা।
(viii) বিভিন্ন স্তরে পরিমাপ।

উচ্চমাধ্যমিক স্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই স্তর থেকে শিক্ষার্থী তার মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা অনুযায়ী কোর্স পছন্দের সুযোগ পায়। কোনো কোনো শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রথাগত

শিক্ষার এখানেই সমাপ্তি ঘটে এবং বৃত্তিজীবনের শুরু হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক স্তর উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই স্তরের শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর উচ্চতর সাধারণ শিক্ষায় প্রবেশ করার সুযোগ পায়, অন্যদিকে বৃত্তিকেন্দ্রিক ভোকেশনাল কোর্সেও ভরতি হওয়ার সুযোগ পায়।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী কোর্সের ব্যবস্থা আছে। যেমন—বিজ্ঞানের কোর্স, মানবিক বিষয়ের উপর কোর্স, বাণিজ্য বিষয়ক কোর্স ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা তার পছন্দমতো কোর্স গ্রহণের সুযোগ পায়। প্রচলিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন 'Stream' ভিত্তিক নির্দিষ্ট বিষয় আছে, যেমন—বিজ্ঞান স্ট্রিমে আছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, গণিত, জীববিদ্যা ইত্যাদি । মানবিক স্ট্রিমে আছে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন শিক্ষা ইত্যাদি। NCF 2005 পাঠক্রমে এর বিরোধিতা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী তার চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় পছন্দের সুযোগ পাবে।

National Curriculum Framework-2005 (Chapter-4)

বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ
(School and Classroom Environment)

এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে—

(i) শিক্ষকদের উৎকর্ষতার জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামো এবং উপকরণাদির সরবরাহ, এবং দৈনন্দিন নমনীয় সময়তালিকা পরিকল্পনা।

(ii) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সম্ভাবনাগুলি বিকাশের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

(iii) নির্দিষ্ট কার্যাবলি যেখানে সমস্ত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে।

(iv) গণতান্ত্রিক কার্যধারার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মশৃঙ্খলার মূল্য সম্পর্কে সচেতন করা।

(v) বিভিন্ন কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় এবং কমিউনিটির মধ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করা।

(vi) নিম্নলিখিত কর্মসূচির সাহায্যে শিখন প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে তুলে ধরা।

(a) ধারণা এবং তার ব্যাখ্যা, সমস্যা এবং অনুশীলন, মৌলিক চিন্তন এবং দলগত কাজের উপর পাঠ্যপুস্তক গুরুত্ব দেবে।

(b) সহায়ক পুস্তক, ওয়ার্কবুক ইত্যাদির সাহায্যে নতুন চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহদান।

(c) একমুখী যোগাযোগের পরিবর্তে তথ্যপ্রযুক্তি এবং বহুবিধ মাধ্যম ব্যবহার করা।

(d) বিদ্যালয়ের পাঠাগার হবে জ্ঞানের উৎস যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কমিউনিটির সদস্যগণ বিশ্ব সম্পর্কে নানাবিধ জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায়।

(e) বিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার এবং দৈনন্দিন কর্মসূচি বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং শিক্ষকদের পেশাগত স্বাধীনতা উত্তম শিখন পরিবেশের অন্যতম শর্ত।

National Curriculum Framework-2005 (Chapter-5)

প্রচলিত পাঠক্রমের ধারাবাহিক সংস্কার
(Systematic Reforms of the Existing Curriculum)

সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ—

(i) ধারাবাহিক সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হল গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

(ii) শ্রেণি এবং মেধা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য 'কমন বিদ্যালয় ব্যবস্থা' গড়ে তোলা, যাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা বলা হয়।

(iii) প্রধান শিক্ষক এবং সহ-শিক্ষকদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে অর্থবহ অ্যাকাডেমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

(iv) শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক গুণগত মান বজায় রাখার জন্য নিয়মিত তদারকির উপর গুরুত্ব দান।

(v) শিক্ষক-শিক্ষা কর্মসূচির সংস্কার ও তাকে শক্তিশালী করতে হবে। এর জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন—

(a) শিক্ষক এমনভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাদের শারীরিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পূর্ণতা পায়, তাদের চরিত্র এবং বাঞ্ছিত সামাজিক এবং মানবিক মূল্যবোধগুলি বিকশিত হয়।

(b) শিক্ষকদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তারা শিক্ষার্থীদের ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম পুনর্নবীকরণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সচেষ্ট হন।

(vi) NCF 2005-এ শিক্ষক-শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষক যাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান নির্মাণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

(vii) শিক্ষক-শিক্ষার উপর এমন সমন্বিত মডেল তৈরি করতে হবে যাতে শিক্ষকদের মধ্যে পেশাগত বৈশিষ্ট্যাবলি শক্তিশালী হয়।

(viii) বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

(ix) পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, গ্রামস্তরে কমিটি গঠন করে শিক্ষার বিকাশে গণতান্ত্রিক এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সকলের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(x) অহেতুক মানসিক চাপ দূর করে পরীক্ষায় যাতে ভালো ফল করা যায় সেদিকে লক্ষ রাখা। এর জন্য প্রয়োজন হল—

(a) বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষার পরিবর্তে বোধগম্যতা এবং সমস্যাসমাধান দক্ষতার উপর পরীক্ষার গুরুত্ব দান।

(b) স্বল্প সময়ের পরীক্ষা গ্রহণ।

(c) পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে নমনীয়তা বজায় রাখা।

(d) সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার জন্য একটি Nodal সংস্থা স্থাপন করা।

(xi) প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে +2 শিক্ষা স্তর পর্যন্ত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

(xii) বৃত্তিশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণকে (VET) মিশন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এর জন্য পৃথক সংস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন।

(xiii) বিভিন্ন ধরনের Text book সরবরাহ করা যাতে শিক্ষকদের পছন্দের সুযোগ থাকে। শিক্ষার্থীরা তাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায়।

(xiv) শ্রেণিকক্ষ অনুশীলনে বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাদান অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে নতুন চিন্তার সূচনা করা। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবিষ্কার এবং পরীক্ষণের মানসিকতা উৎসাহিত হয়।

2. ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক—শিক্ষক শিক্ষা (National Curriculum Framework–2009)

❶ **ভূমিকা (Introduction):** স্বাধীনোত্তর সময় থেকে ভারতবর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীন সাক্ষরতা, পরিকাঠামো, সর্বজনীন শিক্ষায় প্রবেশ ও অন্তর্ভুক্তির উপর প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান সংস্করণের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক-শিক্ষণে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিকাশ হল—শিক্ষার সর্বজনীনতার রাজনৈতিক স্বীকৃতি এবং 86তম সংশোধনীর মাধ্যমে রাজ্যস্তরে Universalisation of Elementary Education (UEE)-কে বাস্তবায়ন করা, যা 2008 খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা অধিকারপত্রে এবং 2005-এর National Curriculum Framework (NCF)-এর মাধ্যমে এসেছে। শিক্ষার অধিকার আইনে বলা হয় 6-14 বছরের সকল শিশুকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে 200 সংখ্যার ছাত্রের স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে 1: 30।

শিক্ষার্থীর গুণগত মান নির্ভর করে শিক্ষকের কর্মদক্ষতা, অনুভূতি ও প্রেষণার উপর। শিক্ষকের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি গুরুত্বপ্রদান করে শিক্ষকের শিক্ষাগত ও পেশাগত মান।

শিক্ষকের গুণগতমান নির্ভর করে কয়েকটি উপাদানের উপর, যেমন—শিক্ষকের পদমর্যাদা, কাজের শর্ত ও পারিশ্রমিক ও শিক্ষকের শিক্ষাগত ও পেশাগত শিক্ষা প্রভৃতি।

শিক্ষক-শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে পেশাগত কর্মদক্ষ শিক্ষক প্রদান করা হয়। তাৎক্ষণিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষক তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে, এটি ভাবী শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রেষণা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব প্রদান করে থাকে।

❷ **The Changing School Context and its Demands:** একজন শিক্ষক একটি বিদ্যালয়ে প্রচুর ভূমিকা পালন করে, যেমন—লক্ষ্য নির্ধারণে, পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে, উপকরণে, পদ্ধতিতে ইত্যাদি। শিক্ষক-শিক্ষণের Curriculum Framework-এর সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার Curriculum Framework-এর সামঞ্জস্য থাকবে এবং বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হওয়া চাহিদা ও দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষক প্রস্তুত থাকবেন এবং নিজেকে সময়ের সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করবেন।

বিদ্যালয় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা গিয়েছে স্বাধীনতার বিগত দশক থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত। সরকারি অনুমানে (Selected Educational Statistics-2004-2005—Ministry of Human Resource Development (MHRD), New Delhi) যেখানে 6-14 বছর বয়সি শিশুদের 20 কোটির মধ্যে 82% শিক্ষার আওতায় আনা, তার মধ্যে 50% শিশুরা অষ্টম শ্রেণির পাঠ শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে দেয় (MHRD Annual Report, 2007-2008)। আঞ্চলিক, সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্য এক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করে যা শিক্ষকদের, শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়নে বাধাস্বরূপ।

শুধুমাত্র শিশুদের শিক্ষাদান করাই শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয় বরং শিশুদের ও তার পরিবেশকে বোঝাও তাদের কর্তব্য। যার ফলে শিশুরা প্রত্যেকদিন স্কুলমুখী হয়। এই আইনে বলা হয়েছে যে শিক্ষক সমস্ত শিশুকে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে শাস্তিদান ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করার ক্ষেত্রে, অভিভাবক সাক্ষাৎকার আয়োজন করার ক্ষেত্রে, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষক বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

NCF 2005 অনুসারে শিক্ষক হবে শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে একজন সহায়ক, যিনি শিশুর আত্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন। শিক্ষক সক্রিয়ভাবে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণ-শিখন উপকরণ তৈরিতে অংশগ্রহণ করবেন।

সামাজিক অভিমত অনুসারে এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের ক্ষেত্রে বোঝাস্বরূপ, যা থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে 2005 খ্রিস্টাব্দের NCF-এ আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার এই দর্শন অনুসারে শিক্ষক প্রস্তুতির একটি নতুন ও উৎকর্ষমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। শিক্ষা কখনোই তথ্য স্থানান্তরকরণের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় এবং শিক্ষক একজন তথ্য বণ্টনকারী যন্ত্র নয়। শিক্ষক, পাঠক্রম স্থানান্তরণের মাধ্যম হবেন। শিখন চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয় বহির্ভূত জগতের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে পাঠক্রম খুব বেশি পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক না হয়।

❸ **Present Teacher Education Scenario:** বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচি নজিরবিহীনভাবে বেড়ে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে Operation Blackboard ও DPEP-এর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সর্বশিক্ষা অভিযান প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনকরণের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রায় সক্ষম হয়েছে, যার ফলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকের চাহিদাও বেড়েছে। যার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে সরকার বাধ্য হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার গুণগত মানের অবনমন হচ্ছে।

প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, M.Ed, C.P.Ed, B.P.Ed, M.P.Ed স্তরে (Face to Face and Distance Modes) যেখানে 2004 খ্রিস্টাব্দে 3199টি প্রতিষ্ঠানে 3489টি কোর্সে 2,74,072 শিক্ষার্থী ছিল 2008 খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 12,266টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 14,523টি কোর্স এবং ছাত্রসংখ্যা বেড়ে 10,73,661 জন। যার জন্য স্বাভাবিকভাবে Infrastructure, Faculty learning resource এবং Student Profile-এর গুণগত দিক থেকে অবনমন হয়েছে।

2007 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত 31টি Institute of Advanced Studies in Education (IASEs) এবং 104টি Colleges of Teacher Education (CTEs) অনুমোদন পেয়েছিল এবং বর্তমানে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের 599টি জেলাতে 556টি DIET অনুমোদন পেয়েছিল এবং তার মধ্যে 466টি প্রতিষ্ঠান কার্যকরী হয়েছে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করার ফলে শিক্ষার মান ক্রমহ্রাসমান। NCTE ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে National Assessment and Accreditation Council (NAAC), Distance Education Council (DEC) হাত মিলিয়ে প্রাক্ কর্মরত, কর্মরত শিক্ষকের শিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও Open and Distance Learning (ODL) Mode-এর মাধ্যমে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকেও নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া Rehabilitation Council of India (RCI)-এর 2002 ও 2005-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে Inclussive Education-এর পাঠক্রম প্রবর্তন ও শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচির জন্য কাজ করে চলেছে। এ ছাড়া National Knowledge Commission (NKC) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন।

❹ **Teacher Education Reform: Perspectives Past and Present:** শিক্ষক-শিক্ষণের সংস্কারসাধনের জন্য Education Commission (1964-66), National Commission on Teachers (1983-85), NPE (1986) বিভিন্নরকম

সুপারিশ করেছিল কিন্তু বর্তমানের বিভিন্ন রকম কর্মসূচি DIET, CTE, IASE, NPE Review Committee (1992) National Advisory Committee or Curriculum Load (1993) শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

❺ **Urgency of Referring Teacher Education:** শিক্ষকদের পেশাগত ও গুণগত মানোন্নয়ন ও সংস্কার সাধনের জন্য বিভিন্ন Training Course, যেমন—BEd, DElEd, Refersher, Orientation Course-এর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি।

Elementary Teacher Education: NCTE-এর দ্বারা শিক্ষক-প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য 1998 খ্রিস্টাব্দে Curriculum Framework for Quality Teacher Education গঠন করা হয়েছিল যা 2003 খ্রিস্টাব্দে Approach Paper for Elementary Teacher Education Curriculum Renewal-এ বিস্তারিত আলোচিত হয়। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে BEd ও DElEd এই Course-গুলি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

Secondary Teacher Education: মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য BEd-এর প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাগত ও বাণিজ্যিকীকরণের মান বাড়লেও গুণগতমান বাড়ছে না। তবে বর্তমানে এই কোর্সকে 1 বছর থেকে 2 বছর করার কথা ভাবা হচ্ছে। বিদ্যালয় সংযুক্তি বাড়ানোর জন্য চিন্তাভাবনা হচ্ছে।

❻ **Systemic Concerns in Teacher Education:** বর্তমানে Teacher Education-এর যেসমস্ত কর্মসূচি রয়েছে তার মাধ্যমে ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার চাহিদাপূরণ না হওয়ার কারণগুলি NCF-2005 নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করেছে—

- পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের কোনো যোগাযোগ না থাকার জন্য পাঠক্রমে আলোচ্য বিষয়ের গুণাগুণ বিচার না করে গ্রহণ করা হচ্ছে।
- শিক্ষকের ভাষাগত দক্ষতা বাড়াতে হবে তবে বর্তমান কর্মসূচিতে ভাষা শিক্ষার তেমন কোনো স্থান দেওয়া হয় না।
- শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করার সামান্য স্থান রয়েছে।
- শিক্ষক-প্রশিক্ষণের কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বারবার অনুশীলন করার উপর জোর দেওয়া হয়।

❼ **Contemporary Context and Concerns that need to Inform Teacher Education Reform**

Inclusive Education: আমরা স্কুলছুটের পিছনে দুটি কারণ লক্ষ করি। একটি হল—বিভিন্ন রকমের অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের চাহিদা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা তাদের সম্পর্কে না জানা ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের চাহিদা সম্পর্কে শিক্ষকদের অজ্ঞতা, শিশুশিক্ষার পথে বাধাস্বরূপ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষককে ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের একত্রে শিক্ষাদান ও মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করাই হল Inclusive Education।

The Persons with Disabilities (PWD) Act 2005 অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের জন্য 18 বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। SC, ST, Minority, মেয়েদের শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

Perspectives for Equitable and Sustainable Development: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাগরিকদের স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সমান মর্যাদা প্রদান, লিঙ্গগত বৈষম্য দূরীকরণ, শান্তি প্রতিষ্ঠা, সার্বিক অধিকার রক্ষা করা সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে।

বর্তমানে সামাজিক বিভেদীকরণ, হিংসা, মানসিক চাপ দূরীকরণে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে বুঝতে পারে ও অপরকে সম্মান করতে শেখে। এই ক্ষেত্রে NCF-2005 পাঠক্রম রচনা ও উপকরণ প্রদান করে থাকে।

Role of Community Knowledge in Education: বিদ্যালয় পাঠক্রমে এমন কিছু বিষয়বস্তু সংযুক্ত করতে হবে যার মাধ্যমে সামাজিক চাহিদার নিবৃত্তি সম্ভব ও ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের সামাজিক অভিযোজনে সাহায্য করবে। NCF 2005-এ এই জন্য সামাজিক পারিপার্শ্বিক চাহিদার উপর নজর রেখে পাঠক্রম তৈরির কথা বলা হয়েছে।

ICT in Schools and e-Learning: বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ICT বা Computer-এর ব্যবস্থা ও জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদেরও ICT এবং জ্ঞান ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে।

❽ **The Present Document:** Education Commission (1964-66) শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পাঠক্রম সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিলেন। এরপর NCTE 1978 খ্রিস্টাব্দে Non Statutory Body হিসেবে Teacher Education Curriculum–A Framework (1978)-এর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করে যা পুনঃ আলোচিত হয় 1988 খ্রিস্টাব্দে। 1990 খ্রিস্টাব্দে UGC যে পাঠক্রম মডেল তৈরি করে তা 1978 খ্রিস্টাব্দের NCTE-এর Framework-কে অনুসরণ করেছে। NCTE 1995 খ্রিস্টাব্দে স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুমোদন পেল। তারপর 1998 খ্রিস্টাব্দে Curriculum Framework for Quality Teacher Education পেশ করে। NCF-এর বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থনের জন্য NCERT 2000 খ্রিস্টাব্দে একটি Framework তৈরি করে Teacher Education for Future নামে প্রস্তাব আনে। NCTE দুটি পর্যায়ে. Curriculum Framework-এর খসড়া তৈরি করে। প্রথমটি 2005-এ এবং দ্বিতীয়টি 2006 খ্রিস্টাব্দে। বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য NCERT 2005 খ্রিস্টাব্দে একটি Curriculum Framework

তৈরি করে এবং পরবর্তীতে 2007 ও 2008 খ্রিস্টাব্দে তৈরি করে। 2006 খ্রিস্টাব্দের উপর ভিত্তি করে নতুন এক ধরনের Framework তৈরি করা হয়েছে যা হল National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE)।

❾ **Vision of Teacher and Teacher Education:** শিক্ষকের ভূমিকা এবং Teacher Education-কে সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। শিক্ষকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা এখানে আলোচনা করা হল—

- শিক্ষক হবেন শিশুদের প্রতি যত্নবান, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্রতী হবেন এবং জ্ঞানপিপাসু হবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আত্মশিখনে উৎসাহিত করবেন।
- Teacher Education হবে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয়ই এবং Academic knowledge ও Professional Learning-এর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে।
- একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক শিখন এবং বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক শিখন, যেমন—Play, Project, Discussion পরিচালনায় দক্ষ হবেন।
- Teacher Education শিক্ষকদের মধ্যে পরীক্ষানিরীক্ষার এবং অনুসন্ধিৎসার মনোভাব জাগ্রত করবে।
- Teacher Education প্রশিক্ষকদের স্বাধীন অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করবে।

❿ **Professionalization of Teacher Education:** Teacher Education-এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক পেশাগত এবং গুণগত দিক দিয়ে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

⓫ **Preparing Teacher Educators:** শিক্ষার্থী-শিক্ষক শিক্ষার তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরের প্রতিটি দক্ষতাগুলিকে অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করবে (Pedagogy and androgogy)।

⓬ **Research and Innovation:** বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত অত্যাধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির আবির্ভাব হচ্ছে তা শুধুমাত্র পাঠক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে, যাকে আবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

Teacher Education-এ যে সমস্ত Research ও Innovation হচ্ছে সেগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রকল্পগুলিকে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌছোতে হবে ও বাস্তবে রূপদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

⓭ **Open and Distance Learning (ODL) in Teacher Education:** বর্তমান শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সময়, ক্ষেত্র এর সমস্যা দূরীকরণের জন্য ODL-কে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে Online শিক্ষা প্রদান, Video conference ও Technology কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Curriculum Areas of Initial Teacher Education (Chapter-2)

ভূমিকা (Introduction)

একজন শিক্ষক অবশ্যই জ্ঞানী, দক্ষ, ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, আদর্শ এবং চরিত্রবান হবেন অর্থাৎ একজন শিক্ষক হবেন—

- জ্ঞানপিপাসু,
- শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নবান ও পক্ষপাতহীন।
- শিক্ষার্থীদের প্রেষণাদানকারী হবেন এবং আনন্দদায়ক চিত্তাকর্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।
- সামাজিক চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম নির্ণয় করবে।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক শিখন অভিজ্ঞতা, যেমন—Play, Projects, Discussion, Dialogue, Observation-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ভাবী শিক্ষকদের যে সমস্ত সুযোগসুবিধা দান করবে তা হল—

- শিশুদের সঙ্গে কথোপকথন, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংযোগ করে রাখবেন।
- নিজেকে এবং অন্যদের বোঝার ক্ষমতা প্রদান করবে এবং আত্মবিশ্লেষণ, আত্মমূল্যায়ন, অভিযোজন, নমনীয়তা, সৃজনশীলতা প্রভৃতি বিকাশে সাহায্য করবে।
- Pedagogy, Observation, Documentation, Analysis and interpretation, Drama, Craft, Story-telling এবং Reflective inquiry-এর ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের 3টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-এর উল্লেখ রয়েছে—

(A) Foundation of Education, এর অন্তর্গত কোর্সগুলি হল—Child studies, Contemporary Studies এবং Educational Studies.

(B) Curriculum and Pedagogical Theory, এর অন্তর্গত কোর্সগুলি হল—Curriculum Studies and Pedagogic Studies.

(C) Practicum & School Internship.

Area 1 : Foundations of Education

1. Child Studies

(a) Childhood, Child development and Learning

Rationale: বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর চাহিদা ও মানসিক দিক বিচার করে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রতিটি প্রশ্নকে, চিন্তন ও শিখনকে গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে এবং তার সমাধানের পথ প্রদান করতে হবে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়, যেমন—Nutrition, personal and environmental hygeine, family health,

disease prevention & control including HIV/AIDS, mental health, prevention of accidents, health information and use of health services প্রভৃতি সংযুক্ত থাকতে হবে।

Curriculum Provision

***Course work*:** শিক্ষক-শিক্ষণে এমন দুটি Course-এর ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে দর্শন, সমাজ, মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত তাত্ত্বিক দিক থাকবে।

- বিভিন্ন রকম প্রকল্প, শিশুদের পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত Project-এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field Survey) করতে হবে।
- Workshop, Seminar, Assignment-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক শিশুদের সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক দিকগুলি জানার চেষ্টা করবেন।
- Child Contact Practicum-কে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের Practical-এ রাখতে হবে।

2. Contemporary Studies

(a) Teacher and Learner in Society: শিক্ষক-শিক্ষণে শিশুদের মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সমানভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবিক দিকে নজর দিতে হবে। যার জন্য এর পাঠক্রমে সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়কে স্থান দিতে হবে। Teacher Education ভারতের Pluralistic nature সংক্রান্ত Issues, যেমন—Identity, gender, equity (সমতা), Poverty (দারিদ্র্যতা) and diversity সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষকদের জায়গা প্রদান করবে।

(b) Other critical social issues: Human and child rights, environment and development, reservation.

Rationale: সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিবর্তনের জন্য একজন শিক্ষককে অবশ্যই শিশুর অধিকার রক্ষা আইন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত আইন সম্বন্ধে জানতে হবে ও জানাতে হবে এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পাঠক্রমে পরিবেশবিদ্যাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে।

Curriculum Provision

***Course work*:** শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভের জন্য একটি বা দুটি কোর্স রাখতে হবে। যেমন—

- Classroom as a social context.
- Issues & concerns of contemporary Indian Society.
- Ideas of educational thinkers.

***In-built field based units of study*:** ভারতবর্ষের বিভিন্নতা অনুযায়ী আঞ্চলিক বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হবে।

***Projects*:** শিক্ষার্থী-শিক্ষক প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে Geography, Economics, Politics, History, Sociology এই সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে। যার বিচারকরণ হবে Workshop, Seminar, Assignment-এর মাধ্যমে।

3. Educational Studies

দার্শনিক আলোচনার বিষয়গুলি লক্ষ্য, মূল্যবোধের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত।

Curriculum Provision

***Course work*:** শিক্ষাক্ষেত্রে দার্শনিক চিন্তাভাবনার উপর একটি অথবা দুটি কোর্স রাখতে হবে।

(a) শিক্ষক-শিক্ষণে Discussion method, Lecture Method, Self Study Unit, Seminar-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়, যেমন—Education as liberation, Education as reconstruction of experience, Intelligence, knowledge and Nationality, Appreciations, Cultural Diversity and Individual differences প্রভৃতি রাখতে হবে।

(b) Developing the self and aspiration as a teacher :শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মজ্ঞান, মানবীয় সম্পর্কীয়, adult-child gap, বিশ্বাস ও মনোভাব সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে হবে।

Curriculum Provision

Course work: একটি কোর্স যেখানে Workshop-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পেশাগত ও তত্ত্বগত দিককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

Workshops in drama, art, Music and craft: Workshop-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক তাদের শৈশবের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, লিঙ্গ সংক্রান্ত Issues, ব্যক্তিগত Issues প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হবে।

Recording and analysis of observation: বাস্তবে যে সমস্ত তাত্ত্বিক ও প্রকল্পিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে সেগুলিকে Record ও Analysis করতে হবে।

Area 2: Curriculum and Pedagogical Theory

1. *Curriculum Studies*:

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান সহায়তা করে। অভিজ্ঞতা গঠিত হয় সক্রিয়ভাবে একে অপরের মধ্যে ধারণা, মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে।

সম্ভাব্য শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের যে পাঠক্রম তৈরি করা হচ্ছে তাতে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বিষয়গত জ্ঞানের উপর সেরকমভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে না। এই জন্য পাঠক্রমের সংশোধন করে বিষয়গত পাঠ রাখা উচিত।

বিষয়বস্তুর জন্য বিভিন্ন রকম অনুসন্ধানীমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন বিজ্ঞান বিষয়ে যুক্ত করা যেতে পারে Laboratory work, Library reference,

Field survey, Group discussion ইত্যাদি। শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সার্থকভাবে যোগাযোগের জন্য যেমন বিষয় জ্ঞানের গভীরতা দরকার তেমনি শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কেও যথাযথ ধারণা প্রয়োজনীয়।

2. *Pedagogic Studies*

Rationale: গতানুগতিক বিষয়গত জ্ঞান এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। যেমন—একটি কোর্স হিসাবে Language Pedagogy শুধুমাত্র ভাষাকে একটি গতানুগতিক বিষয় হিসেবেই ধরা হয় না। এটি শিক্ষার্থীদের ভাষাকে বোধগম্য করতে, ভাষার সমাজ-সাংস্কৃতিক দিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে, পাঠক্রমে ভাষার ব্যবহার ও কার্যকারিতাকে বুঝতে সাহায্য করে।

একইরকমভাবে Mathematical Pedagogy শিশুদের গঠন সংক্রান্ত চিন্তন, গণিতের ভুলভ্রান্তি, গণিতে ভয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণামূলক মনোভাব ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে।

এ ছাড়াও পরিবেশবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল-এর পাঠ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ইতিহাসের স্থানীয় প্রমাণাদি, প্রকল্প ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Curriculum Provision

***Course work*:** Two four courses on knowledge, curriculum and pedagogy:

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের যথাযথ বোধগম্যতা, বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জিত হয় ও শিক্ষণ সংক্রান্ত ধারণা হয় শিক্ষার্থী, বিষয়গত এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সমন্বয়ের মাধ্যমে। এইগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করে—

(i) Revisiting/Reconstructing Concepts General Education-এর মাধ্যমে ধারণাগত জ্ঞানার্জন।

(ii) Understanding School Curriculum বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের উপযুক্ত বোধগম্যতা।

(iii) সমাজজীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংযুক্তিকরণ।

(iv) অনুসন্ধানীমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে বিষয়গত পাঠের সংযুক্তি।

(v) ভাষা, গণিত, পরিবেশ শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে প্রকল্পকে সংযুক্ত করতে হবে।

(vi) বিভিন্ন রকম ব্যাবহারিক কোর্স, ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং গবেষণা প্রকল্পভিত্তিক সুসংগঠিত শ্রেণিকক্ষের মাধ্যমে ধারণা, অভিজ্ঞতা এবং পেশাগত দক্ষতা সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিখন হবে যা গবেষণা দক্ষতা, প্রতিফলক অনুশীলন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিশ্লেষণ, শিশুদের ত্রুটিবিচ্যুতি ধরতে এবং শিখন ধরন বিকাশে সহায়তা করবে।

ebook.dascoaching.in

Learning to Assess Childrens Progress

একজন শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ পরিমাপ করা এবং পাঠক্রম সংক্রান্ত যেসব মানদণ্ড স্থির করা হয় তা শিক্ষার্থী সঠিকভাবে অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা পরিমাপ করা। শিক্ষকদের শুধুমাত্র পাঠ্যসূচিভিত্তিক পারদর্শিতার অভীক্ষা নেওয়া এবং স্কোর দেওয়া ছাড়াও শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের দিকটি মূল্যায়ন করতে হবে। এজন্য NCF-2005 পরীক্ষা ব্যবস্থার সংশোধনের দীর্ঘায়িত লক্ষ্য নিয়ে School based evaluation-এর কথা বলেছে এবং শিক্ষকদের মধ্যে এই মূল্যায়ন প্রয়োগের দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

School based evaluation-এর জন্য যে সমস্ত সামর্থ্য দরকার সেগুলি হল—মূল্যায়ন পরিচালনার কর্মদক্ষতা, প্যারামিটার, কৌশল, tools, মানদণ্ড, অভীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের বোধগম্যতা এবং ব্যাখ্যা, Feedback এবং অনুসরণমূলক কার্যাবলি, আত্মমর্যাদা এবং বিশ্বাস বোধের বিকাশ ইত্যাদি যা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যপূর্ণ মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগরণে মূল্যায়ন কীভাবে সাহায্য করে তা বোঝা যায়।

Area 3: Practicum and School Internship

1. ***The Present Context***: শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী অংশ হল অনুশীলনমূলক শিক্ষণ (Practice teaching)। কিন্তু এই অনুশীলনমূলক শিক্ষণ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে, যেমন—বাঁধা-ধরা রুটিন (Observation, Micro-teaching, teaching practice and examination), গতানুগতিক পাঠ-পরিকল্পনার পদ্ধতি, শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে গতানুগতিকতা পরিদর্শনের অভাব, প্রয়োজনীয় পরামর্শদাতার অভাব ইত্যাদি। পেশাগত মনোভাব নিয়ে এই অনুশীলনমূলক শিক্ষণে (Practice teaching) ব্যাপক এবং গুণগত (Comprehensive & qualitative) মূল্যায়ন হচ্ছে না। NCF-2005-এর ত্রুটিগুলি হল—
   - বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার পাঠক্রমে বিদ্যালয় পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত এবং এজন্য শিক্ষার্থী প্রশিক্ষকরা সেই অনুযায়ী নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে।
   - পেশাগত বিকাশের জন্য কিছু পৃথক পাঠের বারবার অনুশীলনকে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়।
   - বর্তমানের অনুশীলনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের নিজের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ইত্যাদি মূল্যায়নের কোনো সুযোগ নেই।
   - শিক্ষক-শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে ব্যাবহারিক কাজের এবং বাস্তব ক্ষেত্রের কোনো স্পষ্ট যোগ নেই।
   - মূল্যায়ন খুবই তাত্ত্বিক এবং প্রচণ্ড পরিমাণে সংখ্যাগত যাতে ব্যাপকতার অভাব রয়েছে।

Situating the practice of teaching in the broader context of the vision of the role of the Teacher

শিক্ষক-শিক্ষায় এটা সুস্পষ্ট যে শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য পেশাগত কাঠিন্যতা, অনুশীলনমূলক শিক্ষণ, তাত্ত্বিক অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে Field learning-এর বিভিন্ন বিষয়, যেমন—বিদ্যালয়কে জানা, শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা, বাস্তব শ্রেণিকক্ষ পরিস্থিতিতে শিখন-শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ, শিক্ষণ অনুশীলন, শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্বের শিখন-শিক্ষণ পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রয়োগ, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়ন এবং Feedback সরবরাহ, সহযোগী বন্ধুদের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে শিখন ইত্যাদি হয়।

শিক্ষক-শিক্ষা আসলে বহুমুখী এবং বিভিন্ন রকম কার্যাবলির সমন্বয় কেন্দ্র। এটি তাত্ত্বিক অধ্যয়ন, ফিল্ড ওয়ার্ক, ব্যাবহারিক কাজ এবং ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা, যেমন—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী-শিক্ষক পরামর্শদাতাকে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত করে।

শিক্ষক-শিক্ষার জন্য Guiding Philosophy-গুলি হল—

- শিক্ষক-শিক্ষা গতানুগতিক না হয়ে মুক্ত এবং নমনীয় হবে। শিক্ষক-শিক্ষা পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী গঠিত হবে এবং শিক্ষকদের যথাযথ ক্ষমতায়নের উপর জোর দিতে হবে (Changing context & empowerment of the teacher)।
- শিক্ষক-শিক্ষা হবে উদার, সংস্কারমুক্ত, প্রয়োগমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল হবে।
- শিক্ষণে শুধুমাত্র যান্ত্রিক যোগাযোগকে গুরুত্ব দিলেই হবে না। শিক্ষণ হবে Non-dialectic, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে খোলামেলা/মুক্ত কথোপকথন হবে।
- শিক্ষণের নীতি হবে আন্তঃক্রিয়াশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সংযুক্তি এবং অংশগ্রহণ, বহুমুখী শিখন।
- শিখনে এবং পাঠক্রমে বৈচিত্র্য থাকবে।
- শিখন উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল—পড়া, লেখা, আবৃত্তি, গান করা, অভিনয় করা, খেলাধুলা করা, মানচিত্র অঙ্কন, ছবি অঙ্কন, প্রশ্নকরণ, প্রোজেক্ট ইত্যাদি।
- আমাদের লক্ষ্য হবে নমনীয় অনুশীলনকে উৎসাহিত করা, শিক্ষকের জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং পেশাগত দক্ষতার বিকাশসাধন করা।

Curriculum Provision

School Internship: Sustained engagement with children and school. তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাবহারিক Field based কাজ একত্রে পাঠক্রমে রাখতে হবে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের পর্যবেক্ষণীয় তথ্যগুলি সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং সেগুলিকে তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রাক্-চাকুরিরত শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের নিয়মিত যুক্ত রাখতে হবে বিদ্যালয়ের শিশুদের সঙ্গে, শিশুদের শিক্ষণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে।

একজন শিক্ষার্থী-প্রশিক্ষক যখন শিক্ষক হিসাবে কমপক্ষে 12-20 সপ্তাহ নিয়মিত ক্লাস করবে তখন স্কুল Internship-এ বাস্তবিক পাঠক্রমের এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। এর ফলে শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় আয়ত্তে আসবে।

Time as a Critical Factor in Teacher Preparation

শিক্ষক-শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রস্তুতি কর্মসূচির জন্য সময়সীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য সময়সীমা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা আত্ম-অধ্যয়ন, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি ও তাত্ত্বিক অধ্যয়ন করতে পারে।

শিক্ষক-শিক্ষায় প্রশিক্ষকরা অনুশীলনমূলক শিক্ষণে কম সময় পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে দক্ষ করে তুলতে পারে না।

এর জন্য ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তী দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন যেমন কোঠারি কমিশন (1964-66), চট্টোপাধ্যায় কমিশন (1983-85) শিক্ষক-শিক্ষার সময়সীমা নিয়ে সুপারিশ করেছেন।

Transacting the Teacher Education Curriculum

শিক্ষক-শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—পাঠক্রম সঞ্চালন। শিক্ষণ একটি পেশা এবং শিক্ষক-শিক্ষা হল পেশাগত প্রস্তুতির একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের শিক্ষণ পেশা প্রস্তুতির জন্য এবং পেশাগত নীতিবোধ অর্জনের জন্য এই কর্মসূচি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত প্রশিক্ষণের দুটি দিক রয়েছে—একটি পাঠক্রম সঞ্চালন এবং শিখন অর্জিত ফলাফলের মূল্যায়ন। যেগুলি এখানে আলোচনা করা হল—

Curriculum Transaction

Process based teacher education শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের বিভিন্ন রকম সুযোগ দেয়—

- নিজেকে বুঝতে এবং অপরের বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, প্রক্ষোভকে বুঝতে সাহায্য করে। আত্ম-বিশ্লেষণ, আত্ম-মূল্যায়ন, অভিযোজন ক্ষমতা, নমনীয়তা, সৃজনশীলতা বিকাশে সাহায্য করে শিক্ষক-শিক্ষা।
- শিশুদের পর্যবেক্ষণ, তাদের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ দেয়।
- আত্মগতিতে শিখনে সাহায্য করে। সহযোগিতামূলক শিখন সরবরাহ করে।
- পেশাগত দক্ষতার বিকাশের জন্য শিক্ষণ-সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, হস্তশিল্প, গল্প বলা পদ্ধতি এবং প্রতিফলনমূলক অনুসন্ধানে সাহায্য করে।

Language Competence and Communication Skills

ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পাঠক্রম সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একজন শিক্ষকের কথা বলার জন্য, বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য, অনুবাদ করার জন্য, নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রেষণা এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী যথার্থ ভাষা ব্যবহার আবশ্যক। এজন্য শিক্ষকের ভাষাগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে তাঁর যোগাযোগ দক্ষতা। শ্রেণিকক্ষ ছাড়াও শিক্ষককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চতুরতার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ একজন শিক্ষককে সুবক্তা হওয়ার জন্য অবশ্যই স্পষ্ট এবং সুমধুরভাষী হতে হবে যার জন্য শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের শ্রেণিতে মনোযোগী হবে।

এজন্য শিক্ষক-শিক্ষায় শিক্ষার্থী-শিক্ষকের ভাষাগত দক্ষতা এবং যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Teaching the Adult Learner

শিক্ষক-শিক্ষা কর্মসূচি প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্করা কীভাবে শেখে সেদিকে নজর দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীরা স্বাধীন এবং আত্ম-পরিচালিত, তাদের অনেক পরিমাণ জীবন অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান রয়েছে। তারা বাস্তববাদী এবং লক্ষ্যাভিমুখী হয় এবং কর্মকেন্দ্রিক শিখন বা সমস্যামূলক শিখন (যেমন—Case studies, Simulations, role play, action research)-এ বেশি প্রতিক্রিয়া করে। তাই মুক্ত কার্যাবলির উপর জোর দেওয়া উচিত।

Bringing the Learner's Open Experiences Center-Stage

প্রক্রিয়াভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষা (Process based teacher education) গতানুগতিক শিক্ষক-শিক্ষার থেকে এই দিক দিয়ে পৃথক যে Process based education-এ তত্ত্বগত ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা এবং সমাজের বাস্তবতার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিষয় অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্ব এবং তত্ত্ব থেকে অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে।

Engagement with theoretical concepts and frameworks

তত্ত্বগত ধারণা এবং ফ্রেমওয়ার্ক-এর সংযুক্তিকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা না হলে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেবে।

শিক্ষক-শিক্ষায় শিক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব শিক্ষাবিজ্ঞান থেকে যেমন গৃহীত হয়েছে তেমনি মৌলিক কিছু বিষয় দর্শন, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, মনোবিদ্যা থেকে গৃহীত হয়েছে। এইভাবে শিক্ষক-শিক্ষার পাঠক্রম হয়েছে প্রকৃতিগত দিক থেকে। বহুবিধ শৃঙ্খলার (Multi-disciplinary) সমন্বয় শিক্ষার প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার জ্ঞানের উপাদানগুলি গঠিত হয়েছে যেমন শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে তেমনি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান শৃঙ্খলার ভূমিকা রয়েছে।

Understanding the Self and Others

শিক্ষক-শিক্ষা কর্মসূচি শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের নিজেকে এবং অন্যদেরকে বুঝতে সাহায্য করে। এটি আত্মবিশ্লেষণ, আত্মমূল্যায়ন এবং সহযোগিতামূলক শিখনে সাহায্য করে।

Training to be a Reflective Practitioner

শিক্ষণ অনুশীলন শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের প্রতিফলনমূলক বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে গুণগতভাবে যথাযোগ্য করে গড়ে তোলে।

Theory-Practice Dialectic

শিক্ষক-শিক্ষায় তাত্ত্বিক কোর্সগুলি সুপরিকল্পিত এবং সেগুলির দ্বারা শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের সঞ্চালিত করা হয়। ফলে তাঁরা শিশু বিকাশ তত্ত্ব, শিখন তত্ত্ব, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে বোধগম্যতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য স্কুল Internship-এর সময় প্রশিক্ষকরা শিশুদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। প্রশিক্ষণকালীন নিয়মনীতি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রশিক্ষকরা নিয়মিতভাবে শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে।

Meaningful Internship and School Experience

Pre-service teacher education programme-এ সবসময় বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে যাতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে প্রশিক্ষকদের সেই ব্যবস্থা করা উচিত। যখন একজন প্রশিক্ষক নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে কার্যে নিযুক্ত থাকবে তখন পাঠক্রম, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু শিখনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাবে। প্রশিক্ষকরা সঠিকভাবে শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে। গতানুগতিক শিক্ষণ প্রণালীর পরিবর্তে প্রশিক্ষকরা নতুন নতুন শিক্ষণ উপকরণের দ্বারা শিক্ষণ দিতে সমর্থ হন।

Internship অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষকদের সামর্থ্য মূল্যায়নে, পেশায় সমাজিকীকরণে সাহায্য করে। বিভিন্ন Journal, বই, Magazine পঠনের মাধ্যমে এবং শিশুদের পর্যবেক্ষণ ও ঘটনা অনুশীলন (Case Study), সহপাঠীদের কাজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, দক্ষতাগুলি বোধগম্যতার দ্বারা অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষকরা নিজেদেরকে গুণগতমান সম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন।

Need for Complementary Structures and Mechanisms

শিক্ষক-শিক্ষার সমস্ত কোর্স হবে গঠনগত দিক থেকে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং সেগুলির field based study থাকবে। যেমন—'Contemporary Indian Studies' বিভিন্ন রকম সমাজবিজ্ঞান শৃঙ্খলার দ্বারা গঠিত হতে পারে, যেমন—সমাজবিদ্যা, History,

Political Science, Economics এবং Geography যা শিক্ষার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বুঝতে সাহায্য করবে। এর জন্য যেমন শিক্ষা বিজ্ঞানকে পাঠ্যবই হিসেবে বা অন্যান্য বিভিন্ন উৎসকে ব্যবহার করে এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালনের মাধ্যমে Process based শিক্ষক-শিক্ষা কর্মসূচি সফল করা যাবে।

এই Resource Centre-গুলি প্রাক্-চাকুরিরত এবং চাকুরিরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই Resource Centre-গুলি কীভাবে পরিচালনা করা যাবে তা নিম্নে আলোচিত হল—

Establishing Teachers Learning Centres

TLC: A Structural Space for Hands on Experience—শিক্ষক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের শিক্ষণ উপকরণ, শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিজের উৎকর্ষতা বিকাশের জন্য একটি TLC থাকা জরুরি।

TLC: A Resource for Teacher Trainess, Teacher Practitioner and Teacher Educations—শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ উপকরণ যেমন—Activity Manual, শিশু সাহিত্য, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবই, শিখন-শিক্ষণ উপকরণ ইত্যাদি TLC-তে রাখা প্রয়োজনীয়।

TLC: A Forum for Interaction and Sharing—TLC এমনভাবে গঠন করা উচিত যাতে শিক্ষক-প্রশিক্ষকরা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা, উপকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময় করতে পারে। প্রত্যেকে যাতে স্বাধীনভাবে একে অপরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারে এর জন্য বাৎসরিক, মাসিক এবং সাপ্তাহিক রুটিন ঠিক করতে হবে।

TLC: A Platform for Classroom-based Research—TLC-গুলির মাধ্যমে ছোটো ছোটো গবেষণা প্রকল্প গঠন করা যেতে পারে যার দ্বারা শিশুদেরকে বুঝতে এবং তাদের বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা যাবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার যেমন উন্নতি ঘটানো যাবে, তেমনি শিক্ষকদের পেশাগত বিকাশও ঘটবে।

TLC: A Structural Space for self-directed Activities—TLC-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকরা আত্ম-পরিচালিত বিভিন্ন কার্যাবলির সুযোগ পান। এর মাধ্যমে তাঁরা শিশুদের পর্যবেক্ষণ, পাঠ্যবই বিশ্লেষণ এবং কোন্ পাঠ্যবই কোন্ স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত তা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শেখার সুযোগ পান।

TLC: A Platform for Developing a Repertoire of Skills—TLC-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষকরা ওয়ার্কশপ পরিচালনার দ্বারা বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা,যেমন—বলা এবং

তার যথাযথ প্রকাশভঙ্গি, কল্পনা এবং ভাষার সৃজনশীল ব্যবহার, বুলেটিন বোর্ড তৈরি, সংগীত, নাটক ইত্যাদির দ্বারা নিজেদেরকে দক্ষ করে তোলার সুযোগ পায়।

TLC: A Structural Space for the Personal and Psychological Development of Teachers—TLC-তে এমন কার্যাবলিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত যেগুলি শিক্ষকের ব্যক্তিগত এবং মানসিক বিকাশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। প্রশিক্ষকরা যাতে তাঁদের বাল্যকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং একজন সম্ভাব্য শিক্ষকের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রশিক্ষণে যুক্ত থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তাঁরা যাতে প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের যোগাযোগের ব্যবধান বুঝতে পারে, নিজের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং এর প্রভাব ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনে কী তা বিশ্লেষণ করতে পারে এমন ব্যবস্থা TLC-তে থাকা উচিত। আত্মগতিতে শিখন কৌশলে এমন কিছু যুক্ত করা উচিত যাতে বিভিন্নরকম Reflective Question, Reflective Reading, Observation, শ্রেণিকক্ষে দলগত আলোচনায় উত্তর খুঁজে পায়।

TLC: A Structural Space for Forging links between Pre-service and In-service Teacher Education—প্রাক্-কর্মরত এবং কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য DIET-TLC সমন্বিতভাবে বিদ্যালয় সম্পর্কিত উপকরণের সহায়তায় প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে 20 দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যা শ্রেণিকক্ষের এবং শিক্ষকের চাহিদা নির্ভর হবে।

Sample Redesigned Schemas of Current Teacher Education Programmes (Chapter-3)

ভূমিকা (Introduction)

এটি পূর্বে আলোচিত যে Teacher Education-এর ক্ষেত্রে হবু শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে আত্ম-শিক্ষার জন্য। তা ছাড়াও তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক, স্কুল, Classroom-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। প্রশিক্ষণের সময়সীমার সঙ্গে যে-কোনো কারণেই মীমাংসা করা হোক না কেন, তা প্রশিক্ষণের গুণগত মানকে প্রভাবিত করবে।

তাই বিদ্যালয় শিক্ষার বর্তমান Teacher Education-এর Model-গুলি এমন হবে যা শিক্ষকদের General Education-এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেশাগত দক্ষতাও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এই মডেলগুলি 4-6 বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিশ্চিত করা হবে। এর মাঝখানে Teacher Education-এর বর্তমান মডেলগুলি, যেমন—BEd এবং DEd-এর কোর্সের Structure পুনঃবিবেচনা করতে হবে।

DEd: Two-Year Diploma after+2: BEd One-Year Degree after Graduation.

Area 1: ***Theoretical Foundation of Education***

(1) Child Studies.
(2) Contemporary Studies.
(3) Educational Studies.

Area 2: ***Curriculum and Pedagogical Theory***

(1) Curriculum Studies.
(2) Pedagogical Studies.

এই তাত্ত্বিক কোর্সগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্র (discipline) থেকে Unit হবে। যেমন সমাজবিজ্ঞান থেকে শিশু বিকাশ (Child development)-এর Unit থাকবে, মনোবিজ্ঞান থেকে শিশুর Cognitive development-এর Unit থাকবে। তা ছাড়াও এই কোর্সগুলিতে Field based unit-ও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

Area 3: ***Practicum Courses and School Internship***

(1) School-contact Programme.
(2) Observing Children
(3) Self-development
(4) Story-telling and Childrens Literature
(5) Theatre, Creative Drama, Craft and Music.
(6) Material Development and Evaluation.
(7) Classroom Management and Block Teaching.
(8) Visits to Innovative Centres of Pedagogy and Learning
(9) Classroom-based Research Project
(10) School Internship of 4 days a Week Over a Minimum Period of 6-10 weeks, Including an Initial Phase of Observing a Regular Classroom.

তত্ত্ব এবং প্রকল্পের মধ্যে সংগতি স্থাপনের জন্য উপরোক্ত Practicum-গুলি দুই বছর ব্যাপী করতে হবে।

Four Year Integrated Programme

Elementary Teacher Education-এর 4 বছর ব্যাপী Integrated Programme, General Education-কে পেশাগত প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই Programme-এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

- শিক্ষার ভিত্তি অবস্থিত রয়েছে শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক বোঝাপড়া এবং শিক্ষার দার্শনিক চিন্তাধারার উপর।

- এই কোর্সে বিষয়ের ধারণা ও ভিত্তিগত দিক থেকে পুনঃগঠিত ও পুনঃবিবেচনা করতে হবে।
- তাত্ত্বিক কর্মসূচিগুলি অবশ্যই Inter-disciplinary হবে।
- Drama, Craft, Music, Self-development Workshop-এর মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্যাবহারিক কোর্সগুলিকে গভীরভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

Recommendation for Pre-Service Programmes of Teacher Education

- প্রারম্ভিক পর্যায়ে Elementary teacher education-এর 4 বছর ব্যাপী Integrated programme হবে রাজ্যস্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, তা ছাড়াও নির্দিষ্ট কিছু IASEs এবং DIETs-এর মাধ্যমে।
- Elementary Teacher Education-এর বর্তমান মডেলগুলি, যেমন—DElEd কোর্সকে Redesign (নতুন রূপে তৈরি) করতে হবে।
- পুনঃবিবেচিত DElEd Programme নিয়োজিত হবে এবং প্রস্তাবিত মডেল অনুযায়ী পাঠক্রমটিকে আগামী 1-2 বছরের মধ্যে নতুনভাবে রচনা করতে হবে।

Pre-service Programme at the Secondary Stage

- বর্তমান বিএড Programme-কে পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং রাজ্যের প্রয়োজন ও প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বিএড-কে +2 স্তরের পর 4 বছরের Integrated মডেল বা স্নাতক স্তরের পরে 2 বছরের কোর্সে পরিণত করতে হবে।
- Teacher Education-এর বর্তমান মডেল, যেমন—BEd-এর কোর্স এবং Programme-গুলিকে পাঠক্রমের নতুন Framework অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।
- BEd-কোর্সটি পুনরালোচনা করতে হবে এবং প্রস্তাবিত মডেল অনুযায়ী বিএড-এর পাঠক্রমটিকে 1-2 বছরের মধ্যে নতুনভাবে রচনা করতে হবে।

Structural and Operational Issues of Teacher Education and Continuous Professional Development

- Teacher Education Programme নতুনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে স্কুলের পাঠক্রম নবীকরণের প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে।
- প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে Teacher Education-এর পাঠক্রম ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে SCERT/DIET-এর মধ্যে সংযোগ থাকবে।
- Teacher Education-এর প্রোগ্রামগুলি 10+2 স্তর অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিক স্তর শেষ করার পর 4-5 বছরের সময়কালের জন্য হবে।

Evaluating The Developing Teacher (Chapter-4)

ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রকে গুণগতমানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বিভিন্ন বাৎসরিক বা মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাণগত পরিমাপ করা হচ্ছে।

The Comprehensive Nature of Evaluation

শিক্ষক-শিক্ষার মূল্যায়ন অবশ্যই পরিমাণ ও গুণগত দিক দিয়ে ব্যাপক মাত্রায় হবে এবং মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়, পাঠক্রম, পাঠপুস্তক, শিখন ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া, মনস্তাত্ত্বিক ও পেশাগত বিকাশ, ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক বোঝাপড়া, নিয়মনীতি, শিক্ষণ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশ্লেষণভিত্তিক করে শিক্ষক মূল্যায়ন হবে।

The Evaluation Protocal

মূল্যায়নের Criteria-গুলি হল—

Observing children for a specified duration in specific situations—বিশেষ সময় পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে শিশুদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে।

Observational records maintained by the student teacher on a set of criteria relevant to the task on report writing ক্ষেত্র ও প্রতিবেদন লিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা তাদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

School contact practicum to relate and communicate with children : বিদ্যালয়ভিত্তিক ব্যাবহারিক কাজগুলি শিশুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকবে।

Planning for the school contact: বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে, যেমন—Theme নির্বাচন, কার্যাবলি, উপকরণ, সময়, কথোপকথন দক্ষতা, Time management প্রভৃতি।

Post contact discussions, report writing and group presentation: বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের পর দলগতভাবে আলোচনা, প্রতিবেদন লিখন ও উপস্থাপন করতে হবে।

Psychological and professional development of the teacher: শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পেশাগত ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নতির জন্য জোর দিতে হবে।

Assessing a repertoire of skills: শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দক্ষতা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তার পরিমাপ করতে হবে।

Understanding the learner, curricular and pedagogic issues: শিশুর পাঠক্রম ও শিক্ষণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ বিষয়গুলি কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপ করতে হবে।

Teacher as researcher: শিক্ষককে গবেষণাধর্মী মনোভাবাপন্ন হতে হবে।

Internship activities on which students may be assessed: প্রশিক্ষকরা internship-এর সময় কতটা শিক্ষাদান করতে সক্ষম হল তা পরিমাপ করতে হবে।

In-service Education and Continuous Professional Development (Chapter-5)

ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের কথা আলোচনা হয় কোঠারি কমিশন (1964-66) এবং চট্টোপাধ্যায় কমিশন (1983-85)-এ। শিক্ষকদের জ্ঞানের উন্নতিকরণে ও তাঁরা যে বিষয় পড়াবেন সেই বিষয় যেন শিক্ষকদের অবিচ্ছিন্নতাকে দূর করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পরিবর্তিত জ্ঞান ও প্রাত্যহিক অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠক্রমের বিশেষ বিষয়ের পরিমার্জন করা হয়ে থাকে। শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষক হলেন একজন পেশাগত দক্ষ ব্যক্তি যার দ্বারা পাঠক্রমের পরিবর্তনশীল লক্ষ্যপূরণের জন্য তাদের পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি ও চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও বেশি পরিমাণে অর্থ প্রদানের দায়িত্ব সংস্থার। কোঠারি কমিশনের মতে, Primary, Middle ও High School-এর মধ্যে পারস্পরিক সংযুক্ত কর্মশালার ব্যবস্থা করতে হবে যা শিক্ষক ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে। NPE 1986-কে অনুসরণ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্র সরকারের অর্থসংস্থার সহযোগিতায় প্রতিটি জেলাতে Institute of Advanced Studies in Education (IASE), District Institutes of Education and Training (DIET) প্রতিষ্ঠা করে। District Primary Education Programme (DPEP, 1995-2003) দেশের প্রতিটি ব্লকস্তর একটি Structure তৈরি করে যা Primary School-এর শিক্ষকদের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ বিজ্ঞান পদ্ধতিসম্মত শিক্ষাদান করবেন ও বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষক সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষা পরিদর্শক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক একসঙ্গে কাজ করবেন এবং বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সাহায্য কেন্দ্র তৈরি করবেন। Sarva Shiksha Abhijan (SSA, 2001)-এ চাকুরিকালীন শিক্ষক-প্রশিক্ষণের কথা বলেন যেখানে প্রতিটি শিক্ষককে বছরে 20 দিন প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়।

শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব প্রাত্যহিক কর্মের মাঝে। শিক্ষকরা প্রত্যেকেই শিক্ষক সমিতির সদস্য থাকবেন যাতে সময়ানুবর্তী হয়ে তারা নিজেদের জ্ঞানের পরিবর্তন করতে পারেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে, পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচনে অংশগ্রহণকরণে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির আলোচনায় যেন তারা অংশ নেন। প্রত্যেক শিক্ষককে Block ও Cluster Centre-এ কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এ ছাড়াও তারা বিভিন্ন NGO সংগঠন যেমন Hoshangabad Science Training Programme (HSTP),

Uttarakhand Seva Nidhi, BVIER এবং Homi Bhava Centre-এর PRISM-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, যারা শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগ দান করবেন, বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানকরণে ও শিক্ষকদের জ্ঞান পরিমার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

Aims of Programmes for Continuous Professional Development of Teachers

পেশাগত শিক্ষক নিজের আত্মবিকাশ বৃদ্ধির যে পথ সন্ধান করেন তা হল—

- প্রাত্যহিক অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও বিদ্যালয় পাঠক্রমের ক্ষেত্রে নিজেকে পরিমার্জিত করা।
- শিশু এবং তার শিক্ষার উপর গবেষণা করা।
- শিক্ষা ও সামাজিক সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেকে বোঝা এবং Update করা।
- Teacher education, Curriculum Development, Counselling-এর সঙ্গে নিজেকে পেশাগতভাবে যুক্ত করা।
- শিক্ষকদের শিক্ষার বিস্তৃত লক্ষ্যের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। যেমন—Universalization and inclusion ।
- সামাজিক মনোভাবকে প্রভাবিত করতে হবে ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষের বাধাগুলি দূরীকরণ করতে হবে।
- শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্তরে এসে শিক্ষাদান করতে হবে ও এমন শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে তা যেন শিশুদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও সঠিক জ্ঞানদানের পরিপূরক হয়।
- প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ব্যবহার, কৈশোরকালের শিক্ষা, AIDS প্রভৃতির মতো বিষয় পড়ানোর মধ্যে দিয়ে শিক্ষকদের পাঠক্রমের লক্ষ্যপূরণের সুযোগ দিতে হবে।
- শিক্ষককে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

Designing In-service Programme: Some Principles

চাকুরিকালীন কর্মসূচি নির্ভর করে প্রতিটি কর্মসূচির কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর। তবে এই কর্মসূচিকে কার্যকরী করতে কিছু সাধারণ নীতি মনে রাখা প্রয়োজন। এই নীতিগুলি নিম্নে আলোচিত হল—

ebook.dascoaching.in

Content and Pedagogic Approach

- কর্মসূচি তৈরির সময় শিক্ষকদের পারস্পরিক মতামত পোষণের জন্য যথেষ্ট স্থান বা সময় রাখতে হবে যাতে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি হয়।
- কর্মসূচির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ রাখা হবে এবং সেটি কোন্ পথে পূরণ করা হবে তা স্থির করতে হবে। এই কর্মসূচি পালিত হবে কোনো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষক দলের নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং নিয়মাবলির মাধ্যমে।

- সমস্ত কর্মসূচি শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ও নির্ধারিত কিছু লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হবে এবং এটাও জানানো হবে যে তারা কেন এই কর্মসূচিতে যোগদান করবেন। কর্মসূচির মূল সূত্রগুলি নির্ধারিত হবে শিক্ষকদের নিজস্ব মূল্যায়নের মাধ্যমে। দীর্ঘকালীন সময়সূচি ও অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে পেশাগত এই চাকুরিকালীন কর্মসূচিতে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।
- পারস্পরিক মত বিনিময়কে কখনোই উপেক্ষা করা যাবে না বা গৌণভাবে দেখা যাবে না।
- কর্মসূচিতে এমন কিছু বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যা শিক্ষকের পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং তারা যেন নিজেদের মতামত পোষণ করতে পারেন।
- শিক্ষকদের প্রেষণার স্তরকে কোনোরকম আঘাত করা যাবে না বরং এমন কিছু বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যাতে সকলে তার মধ্যে অংশ নিতে পারেন এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি হয়। কর্মসূচিতে শিক্ষকদের আগ্রহ বাড়ানোর প্রতিও নজর দিতে হবে যা নিয়মমাফিক ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখে।

Addressing Teacher as Learners

- প্রত্যেক শিক্ষক প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের নিজস্ব পেশাগত দক্ষতা ও পড়ানোর সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে। যে-কোনো চাকুরিকালীন কর্মসূচি তৈরি করে নতুন ধারণা, কীভাবে কঠিন বিষয়বস্তু সহজভাবে প্রদান করা সম্ভব এবং নিজের পেশাগত পরিচয় এবং জ্ঞানের প্রতি শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেবে।
- যে সমস্ত কার্যাবলি শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ায়, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা শিক্ষকদের শিক্ষাগত দিক ও আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করবে। যেসব কর্মসূচি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে সেগুলি যেন বোধগম্য, দীর্ঘমেয়াদি, মনোবিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রেষণাদায়ক হয়।
- একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং পেশাদার হিসেবে সকলেই চাকুরিকালীন কর্মসূচির সমালোচক হবে যেগুলি শিক্ষকদের গুণগত মানের বৃদ্ধি করবে এবং যেগুলি শিক্ষকদের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে।

Seeking Various Routes Towards Teachers Continuous Professional Development: Types of In-service Programme

চাকুরিকালীন কর্মসূচির পেশাগত বিকাশকে মাথায় রেখে, বিভিন্ন ধরনের চাকুরিকালীন কর্মসূচি ও অভিজ্ঞতাকে চেনার প্রয়োজন রয়েছে, যা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

Short and Long Term Courses

স্বল্পমেয়াদি অথবা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নির্ভর করে শিক্ষকদের কোনো নির্দিষ্ট দক্ষতা বা দিকের উপর তাদের সারাবছরের কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে। যেমন—বলা যেতে পারে যে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে Teaching fractions, developing secular attitude among children, aids education ইত্যাদির মতো কোর্সের ব্যবস্থা প্রদান করে থাকেন। শিক্ষকদের জ্ঞানগত এবং পেশাগত মাত্রা বাড়ানোর চাহিদাভিত্তিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কিছু রয়েছে স্বল্প সময়ভিত্তিক অর্থাৎ 4-5 দিন আবার কিছু রয়েছে 1-3 মাস। যেমন—শ্রেণিকক্ষে থিয়েটার প্রদর্শন অথবা ব্যবস্থাপনায়ক দল তৈরি ইত্যাদি। এমন কিছু কার্যাবলি যা শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেগুলিতে শিক্ষকরা সবসময় যোগদান করবেন। কিছু কর্মকাণ্ড তৈরি করা হয়ে থাকে দীর্ঘসময়ের জন্য আবার অন্যগুলির মধ্যে কিছু সময়ের পার্থক্য দেখা যায়। যেখানে শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করবেন এবং পরবর্তীতে সেই স্থানে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করবেন। আবার কিছু কোর্স শংসাপত্র প্রদান করে। গণ প্রশিক্ষণ শিক্ষকের অনুশীলনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না, যা কেবলমাত্র সময় এবং শ্রমের অপচয় বিশেষ।

The Use of Distance Media

ICT (TV Radio, Internet) ব্যবহার উপযোগী সম্পদ যেগুলি জ্ঞানের ধারণা প্রবেশের পথ। দূরাগত মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশার ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রাখে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষাগত ক্ষেত্রের সঙ্গেও যুক্ত রাখে।

Study and Research

শিক্ষকদের অন্যান্য স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, NGO-তে শিক্ষকতা করা, জ্ঞান সংগ্রহ করার জন্য 1 বছরের সুযোগ বেছে নিতে দেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাকে একটি তথ্য প্রদান করতে হবে। এটি একজন বিজ্ঞ পরামর্শদাতার সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগ করবেন যা এই কর্মকাল চলাকালীন বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থী ছোটো ছোটো গবেষণার মাধ্যমে নিজেকে যুক্ত করবেন। যেমন—Action Research।

Professional Conferences and Meetings

শিক্ষকতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বিভিন্ন Meeting ও Conference-এর ব্যবস্থা করতে হবে যার স্থায়িত্বকাল হবে 3-4 দিনের। অথবা বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণের ব্যবস্থা করবেন যা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

Professional Forum Resource Rooms and Materials

বিভিন্ন পেশাগত কার্যক্রম প্রদান করতে হবে, যেমন—অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের পড়ানোর দক্ষতার উপর নির্ভর করে বার্ষিক, মাসিক ও

সাপ্তাহিক সময়সূচি তৈরি করতে হবে। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত স্তর নির্ভর করে শ্রেণি এবং ব্লক লেভেলের বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে যা শিক্ষাদান পেশায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একটি দলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যাপ্ত সম্পদ, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা খুবই প্রয়োজনীয় হয় বিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়নে।

একইভাবে শিক্ষকদের বিভিন্ন Network-এর যোগদান, যেমন—BGVS, TNSF খুব গুরুত্বপূর্ণ যা শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

শিক্ষকরা Seminar for Teachers, Traninging, Meals, Childrens Club-এর মতো বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রেষণা গ্রহণ করে থাকেন। এগুলি বিভিন্ন চাকুরিরত ক্ষেত্রে এবং সরকারের বিভিন্ন স্কিম যেমন DIET-এর সঙ্গে যুক্ত। কিছু বিষয় আবার স্থানীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত যা তাদের জ্ঞান ও নতুন পদ্ধতি প্রদান করে থাকে। DIET, CTE-এর মতো শিক্ষা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষকদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে 3-4 মাস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে যাতে শিক্ষকরা শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিশুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে এবং Fellowship-এরও ব্যবস্থা করে থাকেন।

Faculty Exchange Visits and Fellowships

প্রতিটি জেলায় শিক্ষক Fellowship-এর ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিছু নির্বাচিত শিক্ষককে 3 মাস থেকে 1 বছরের জন্য এই দেশের অন্য রাজ্যের একটি স্কুলে কিংবা অন্য দেশের একটি স্কুলে পাঠানো হয়ে থাকে শিক্ষকতা এবং শিক্ষাগ্রহণের জন্য। অনুরূপভাবে স্কুল Plan করবে যে কীভাবে সেই শিক্ষকদের Service, Utilize করা যাবে।

শিক্ষকদের কিছু অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা হয়ে থাকে DIET ও CTE-এ অংশগ্রহণের জন্য অথবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য কিছু নির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রদান করা হয় তাদের নিজস্ব জেলায়। ধরা যাক, গল্পের ছলে পড়ানোর পদ্ধতির কর্মশালায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি রাখা হবে এবং এই কর্মশালাকে আরও কার্যকরী করে তোলার জন্য নানান ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে।

Implementation of Continuous Professional Development: Critical Aspects

Organisation and Coordination: DPEP ও SSA-এর মতো সংস্থানগুলি প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলেন প্রতিটি জেলা, ব্লক স্তরে। DIET, IASEs-এর সংযুক্তির মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে বৃহৎ আকারে Teacher Association-এর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা সম্ভব

হয়েছে। অন্য NGO সংস্থাগুলি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন তাদের নির্দিষ্ট পাঠক্রম এবং কার্যাবলির মাধ্যমে। সংস্থার লক্ষ্য হল শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে সফল করা। যা ইদানীং প্রায় সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা বা পেশা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর কাজ করে চলেছে। দ্বিতীয়ত এই সমস্ত Training Centre-গুলি গড়ে উঠেছে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ভিত্তিক। যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বা শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে কোনো রকম যোগ নেই শিক্ষকতার গুণগত মানের উন্নয়নের স্বার্থে।

এই পরিস্থিতিতে SI, CRPs, HMs এবং শিক্ষকদের আগ্রহ ও উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি সময়সূচি বা (Session) শেষ হওয়ার পর একটি Remedial Training-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত প্রশিক্ষণের সময় এবং দিন কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষকের পরিপ্রেক্ষিতে হবে না বরং সর্বস্তরের কথা মাথায় রাখতে হবে। এ ছাড়া অবসর সময় যাপনের জন্য Conference, Workshop, Seminar-এর মতো কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে বেশিরভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যোগদান করতে পারেন।

Bites and Agencies

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজীয় স্তরের বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র প্রদান করে থাকে বিদ্যালয় শিক্ষকদের। তা ছাড়াও তাদের জন্য গবেষণা ক্ষেত্র, গ্রন্থাগার, আধুনিক এবং নতুন জ্ঞান Share করে থাকে।

প্রাক্-চাকুরিরত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এমন কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় যা শিক্ষকদের সচলতার সঙ্গে যুক্ত রাখে।

Impact

শিক্ষকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালা থেকে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের জন্য অনেকটা ব্যাহত। যেখানে সেগুলি বিদ্যালয় কিংবা শ্রেণিকক্ষে জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও জ্ঞানদানকে সরাসরি সমর্থন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে Pre-test ও Post-test সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা যাচ্ছে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাগুলি লক্ষ্যাভিমুখী হবে ও নির্দিষ্ট গুরুত্ব থাকবে এবং প্রশাসনিক পরিচালনাকে নিম্ন স্তর থেকে সমর্থন করবে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন কর্মসূচির সুস্পষ্ট গুরুত্ব থাকবে ও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রের নিম্ন স্তর থেকে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আলোচিত এইসব ক্ষেত্রে SCERT ও DIET-এর মতো সংস্থাগুলিকে সতর্ক হতে হবে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

Structural and Operational Issues of Continuous Professional Development

In-service Programmes and Continued Teacher Support at the Elementary Stage

- DIET-এর 'Redesigned In-service Programme' ও 'Redesigned Pre-service Programme'-এর মধ্যে সংযোগ রাখতে হবে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণের Content ও Approach গঠিত হবে শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ চাহিদার উপর ভিত্তি করে। যেটি বিষয়গত উন্নতি করবে, দক্ষতা বাড়বে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ পদ্ধতি পরিমার্জিত করবে, শিক্ষার্থীদের বোধগম্য পাঠদান করবে, সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত মূল্যায়ন করবে ও শিশুদের পরিমার্জনে সক্ষম হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাষাগত উন্নয়ন ঘটবে বিশেষভাবে নির্মিত Modules এবং Programmes-এর মাধ্যমে।
- SSA-এর Fund শিক্ষক-প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে খরচ করা হবে এবং শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক করার জন্য চাকুরিরত প্রশিক্ষণকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে।
- স্কুল Internship কর্মসূচি চলাকালীন প্রাক্-কর্মরত শিক্ষার্থী-শিক্ষক দ্বারা নির্মিত Resource Centre-গুলিকে Hub-এ পরিণত করতে হবে শিক্ষকদের পেশাগত বিকাশের জন্য।
- IASE, SCERT ও DIET-এর মতো সংস্থানের মাধ্যমে তৈরি Programme-গুলি গড়ে উঠেছে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

In-service Programmes and Continued Professional Development at the Secondary Stage

- কর্মরত কর্মসূচিগুলি পুনরায় নির্মাণ করতে হবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের সহযোগিতা ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক শ্রেণি পরিস্থিতি পরিচালনার জন্য।
- বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী পদ্ধতি অবলম্বন করে চাকুরিকালীন কর্মসূচি নির্মাণ করতে হবে যেখানে Disciplinary Content-এর উপর জোর দিতে হবে।
- শিক্ষকের চাহিদা ও SCERT–IASEs-এর উপর ভিত্তি করে কর্মরত প্রশিক্ষণের বিষয় (Content) ও পদ্ধতি (Method) ঠিক করা হবে।
- IASEs যে মাধ্যমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে প্রাথমিক শিক্ষক ও Teacher Education-এর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতেও যথাযথ সাহায্য করবে।

PREPARING TEACHER EDUCATORS (CHAPTER-6)

ভূমিকা (Introduction)

এটি সত্য যে শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ-এর উপর প্রভাব ফেলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নির্দেশিত কার্যপ্রণালী, যারা তাদের পেশাগত দিকে দক্ষতা বিস্তার করে। শিক্ষকের শিক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন সময়ে Education Policy পেশাগত দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু সে চাহিদা আজও পূরণ হয়নি কারণ আজও শিক্ষার সমস্ত স্তরে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে।

Existing Arrangements for Training of Teacher Educators—Status and Critique

Early Childhood Education

ECE শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নততর কাজ করে থাকে, তাদের আনন্দদায়ক পড়ানো, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, খেলা এবং সক্রিয় কাজকর্মভিত্তিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে। ECE-এ শিক্ষক শিক্ষা পাঠক্রম শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিশুকেন্দ্রিক ও খেলার ছলে ও সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রম নির্ভর শিক্ষণের ধারণা, সঠিক আচরণ ও দক্ষতা প্রদান করে। এই ECE Programme-এর মাধ্যমে জ্ঞান ও ভাষাগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধীয়, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক, দৈহিক দক্ষতা, মানসিক, সৃজনশীল ও খেলার ছলে শিক্ষার জ্ঞান প্রদান করে যা শিক্ষা পরিকল্পনা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উন্নয়ন এবং দিক্‌নির্ণয় করে থাকে।

Primary/Elementary Education

DIET-এর স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে দুই ধরনের Teacher Education-এর আবির্ভাব হয়। যারা DIET-এ শিক্ষকতা করেন এবং যারা অন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। বেশিরভাগ রাজ্যে DIET-হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রধান Supply প্রতিষ্ঠান। WG Report on Elementary Education and Literacy XI Five year Plan 2007-12-এর অনুযায়ী 556, DIETs অনুমোদন করা হয়েছিল, যার মধ্যে 466টি কার্যকরী হয়েছে।

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— **মান-2**

▶ **পাঠক্রমের ব্যুৎপত্তিগত ধারণা লিখুন। (Write the etymological concept of curriculum.)**

Ans. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে Curriculum বলতে বলা হয়েছে, A course of study laid down for the students of a university or school, or in a wider sense, for schools of certain standards। পাঠক্রম শব্দটির উৎপত্তি লাতিন শব্দ cureere থেকে। এর অর্থ হল দৌড়। সুতরাং পাঠক্রম (curriculum) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ। শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণভাবে এর অর্থ হল লেখাপড়া ও কাজকর্মের জন্য নির্ধারিত পথ।

▶ **Good পাঠক্রমের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন? (What definition of curriculum are given by Good ?)**

Ans. *Good*-এর মতে, "It is defined as a general overall plan of the content or specific materials of instruction that the school should offer the students by way of qualifying him for graduation or certification for entrance into a professional or vocational field." অর্থাৎ কোনো পেশা বা বৃত্তি শিক্ষায় প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যে শংসাপত্র বা স্নাতক ডিগ্রি বিদ্যালয় দেয় তার মধ্যে সমস্ত বিষয় এবং পাঠদানের যাবতীয় ব্যবস্থাকেই পাঠক্রম বলে।

▶ **Cunningham পাঠক্রমের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন? (What definition of curriculum are given by Cunningham ?)**

Ans. *Cunningham*-এর মতে, "Curriculum is the tool in the hands of the artist (the teacher) to mould his materials (pupils) according to his ideals (aims and objectives) in his studies (the school)." অর্থাৎ পাঠক্রম হল শিল্পীর (শিক্ষকের) হস্তে এমন যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে তিনি তাঁর উপাদানকে (শিক্ষার্থীকে) তাঁর চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাঁর কর্মস্থলে (বিদ্যালয়) রূপ দিতে পারেন।

▶ **পাঠক্রমের আধুনিক ধারণাটি লিখুন। (Write the modern concept of curriculum.)**

Ans. আধুনিক শিক্ষাবিদগণের মতে, যেহেতু শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া সেহেতু পাঠক্রম জীবন পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা মনোবিদ

Crow & Crow বলেছেন, "Curriculum includes all the learner's experience, in or outside school that are included in a programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally." অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্যে, বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ও বহির্ভূত যে সাহায্যকারী অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করা হয়, তাকেই বলে পাঠক্রম।

▶ **শিক্ষা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিগুলি কী কী? (What are the main educational aspects ?)**

Ans. শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) কোন্ স্তরের জন্য পাঠক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে—প্রাক্-প্রাথমিক, প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি।

(খ) কোন্ ধরনের শিক্ষা যেমন সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা ইত্যাদি। সাধারণ শিক্ষায় যে সব বিষয়বস্তু এবং কার্যাবলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় বৃত্তিশিক্ষার পাঠক্রমে তার থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন হয়।

(গ) পাঠক্রম সমাপ্ত করার জন্য কী পরিমাণ সময় বরাদ্দ করা হয়েছে এক বছর, দু-বছর বা তিন বছর।

(ঘ) পাঠক্রম কীভাবে বাস্তবীকরণ বা প্রয়োগ করা হবে, কী ধরনের শিক্ষাপোকরণ প্রয়োজন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কীভাবে এবং কত সময়ের জন্য দেওয়া হবে।

(ঙ) পাঠক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতি যেমন গঠনমূলক, সমষ্টিমূলক, শিক্ষকদের বক্তব্য এবং মন্তব্য, শিক্ষার্থীদের মন্তব্য ইত্যাদি।

(চ) প্রণীত পাঠক্রম কত বছরের জন্য স্থায়ী হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— **মান-5**

▶ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের ত্রুটিগুলি আলোচনা করুন। (Discuss the deficiency of traditional concept of curriculum.)

Ans. 290-291 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the characteristics of curriculum as per modern concept.)

Ans. 292-293 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগগুলি সংক্ষেপে লিখুন। (Briefly state the classification of curriculum theories.)

Ans. 297-300 পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ——— **মান-10**

▶ পাঠক্রম প্রণয়নের নির্ধারকসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (Briefly discuss about the determinants of curriculum construction.)

Ans. 293-296 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ কোঠারি কমিশন কর্তৃক প্রচলিত স্তরভিত্তিক পাঠক্রমের আলোচনা করুন। (Discuss about stage specific curriculum according to Kothari commission.)

Ans. 302-305 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (Briefly state the curriculum for madhyamik stage of education in West Bengal.)

Ans. 318-321 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (2005)-এর প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখুন। (Briefly state the content of Ch. 1 in NCF-2005.)

Ans. 324-327 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (2005)-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখুন। (Briefly state the content of Ch. 2 in NCF-2005.)

Ans. 328-331 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে NCF-2005-এ কী বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে লিখুন। (Briefly discuss about the different aspect of curriculum in school level, which are mentioned in NCF-2005.)

Ans. 331-334 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষক-শিক্ষা বিষয়ে NCF-2005-এর সুপারিশ উল্লেখ করুন। (Mention the recommendations of NCF-2005 about the teacher education.)

Ans. 336-341 পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের বিষয়ে NCF-2005-এর সুপারিশগুলি লিখুন। (Write the recommendations of NCF-2005 about the in-service education and continuous professional development.)

Ans. 356-362 পৃষ্ঠা দেখুন।

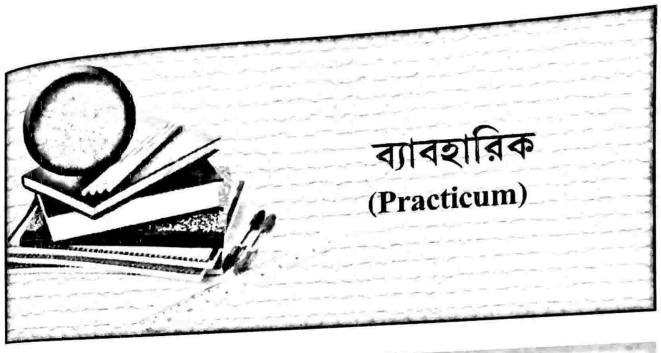

ব্যাবহারিক
(Practicum)

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখার নীতি বিশ্লেষণ
(Policy Analysis of National Curriculum Framework)

শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবিকরণের প্রধান পন্থা হল উপযুক্ত পাঠক্রম প্রণয়ন। নির্দিষ্ট কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে যেমন শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়, তেমনই পাঠক্রমের রূপরেখা কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, সমাজ এবং দেশের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কর্মসূচির প্রয়োজন হয় তার প্রভাব শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পাঠক্রমের রূপরেখা প্রণয়নে বিশেষভাবে দেখা যায়।

এই কারণেই কেবলমাত্র স্বাধীন দেশের সাংবিধানিক প্রস্তাবনা এবং কিছু শায়িত মূল্যবোধ ছাড়া পাঠক্রমের রূপরেখা নির্ণয়ে স্থায়ী কোনো নীতির কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই স্বাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা রূপ পেয়েছে তার নীতিগুলির ভিত্তি ছিল সেই সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা। স্বাভাবিকভাবেই সেই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যে পাঠক্রম প্রণয়নে যে সুপারিশ করা হয় তার ভিত্তি হল সেই সময়ের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তব রূপ দান করা।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখায় যে নীতিগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সে সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনটি জাতীয় পাঠক্রমের নীতির কথা এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন—

1. 1964-66 খ্রিস্টাব্দে কোঠারি কমিশনের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রমের নীতিসমূহ।
2. 1986 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে পাঠক্রমের যে নীতিগুলি উল্লেখ করা হয়।
3. 2005 খ্রিস্টাব্দে পাঠক্রমের রূপরেখার নীতিসমূহ।

❶ **কোঠারি কমিশনের উল্লিখিত পাঠক্রমের রূপরেখার নীতিসকল এবং তার বিশ্লেষণ এখানে আলোচনা করা হল—**

(ক) পাঠক্রমকে সামগ্রিকভাবে বিচার করা প্রয়োজন: শিক্ষার উন্নতিকল্পে শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের মধ্যে যে অন্তঃসম্পর্ক আছে তাকে ভিত্তি করে পাঠক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতি করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার বিশেষ প্রয়োজন। একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রয়োজন। পাঠক্রমের রূপরেখার ক্ষেত্রে এইগুলি অবশ্যই বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে।

(খ) পাঠক্রম জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবে: পাঠক্রমকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে মানুষের প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রূপান্তরের জন্য পাঠক্রমকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি অর্জন করা যায়, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়, সামাজিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও চরিত্র গঠন সহায়ক হয়।

(গ) পাঠক্রমের সঙ্গে উৎপাদনকে যুক্ত করা: শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে উৎপাদনকে যুক্ত করতে হবে। তার জন্য যেসব পাঠক্রমিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- বিজ্ঞান শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে পাঠক্রমের মূল অংশ হিসাবে বিবেচিত করতে হবে।
- কর্ম অভিজ্ঞতা (Work experience) হবে সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করতে হবে যাতে শিল্প (Industry) কৃষি (Agriculture) এবং ব্যাবসাবাণিজ্য (Trade) প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সরবরাহ করা হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণায় গুরুত্ব দিতে হবে বিশেষ করে কৃষি এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর।

(ঘ) পাঠক্রমে সামাজিক এবং জাতীয় সংহতি সাধনের নীতি: সামাজিক এবং জাতীয় সংহতি সাধন শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় চেতনা ও ঐক্য বৃদ্ধির জন্য কমিশন পাঠক্রমে যে কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করতে বলেছে তা হল—

শিক্ষার সার্বজনীনতা যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সবাই শিক্ষার সুযোগ পায়।

(ঙ) পাঠক্রমে সমাজসেবা মূলক ব্যবস্থার নীতি: শিক্ষার সর্বস্তরে সব ছেলেদের জন্য জাতি ও সমাজসেবামূলক কাজ বাধ্যতামূলক হবে। জাতীয় পুনর্গঠন ও পল্লি উন্নয়নমূলক কাজ শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। কমিশনের মতে

সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলাবোধ, কায়িক শ্রমের প্রতি বিশ্বাস ও মর্যাদাবোধদান এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে উঠবে।

(চ) পাঠক্রমের রূপরেখা ও ভাষানীতি: শিক্ষার সঙ্গে উপযুক্ত ভাষা নীতি স্থির হলে জাতীয় সংহতি তা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সহায়ক হবে। বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষার দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি। স্কুল স্তর থেকেই ইংরাজি শেখানো হবে। অন্যান্য বিদেশি ভাষা শিক্ষার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

(ছ) পাঠক্রম রূপরেখা ও গণতন্ত্রের নীতি: সংবিধানের 45 নং ধারা অনুযায়ী 14 বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এ জন্য বিশেষ ধরনের পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমের রূপরেখা এবং কর্মসূচি এমনভাবে রচিত হবে যাতে গতানুগতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ ও দৃষ্টিভঙ্গি, সহিষ্ণুতা, সমাজসেবাবোধ, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ লাভ করে।

(জ) পাঠক্রমের রূপরেখা এবং জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির নীতি: জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই জন্য আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, ভাস্কর্য, সংগীত, নৃত্য-নাটক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক পরিচয় ঘটাতে হবে।

(ঝ) পাঠক্রমের রূপরেখা ও আধুনিকীকরণ: বর্তমান যুগে অবিশ্বাস্য গতিতে জ্ঞানের প্রসার হচ্ছে, একইসঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে শিক্ষার পাঠক্রমে পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাঠক্রমের নীতি হবে কেবলমাত্র জ্ঞান সঞ্চালন নয়, এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যাতে কৌতূহলী হয়, অনুসন্ধিৎসু হয়। নতুন জ্ঞানের আবিষ্কারে প্রয়াসী হয় সেই ব্যবস্থা করা।

(ঞ) পাঠক্রমের রূপরেখায় সামাজিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক মূল্যবোধের নীতি: পাঠক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মৌলিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ করা হবে।

❷ জাতীয় শিক্ষা নীতি (1986) এবং প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (POA, 1992) এ পাঠক্রমের রূপরেখায় নীতি এবং তার বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখ করা হল: 1986 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা নীতি পার্লামেন্টে গৃহীত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল পাঠক্রমকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা যাতে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে এবং সমগ্রদেশে এই পাঠক্রমের প্রধান নীতিগুলি অনুসৃত হয়। এই জাতীয় শিক্ষা নীতি জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশান রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) উপর দায়িত্ব দেয়। জাতীয় শিক্ষা নীতি (1986) পাঠক্রম রূপরেখার প্রস্তুতে NCERT যে যে নীতিগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছে, তা হল—

(ক) জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা বলতে সমগ্র দেশে একই পাঠক্রম প্রচলিত হবে তা নয়। এর মূল বক্তব্য হল এমন পাঠক্রম প্রস্তুত করা হবে বলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে কতকগুলি সাধারণ মূল্যবোধ গঠন করতে সক্ষম হয়।

(খ) 14 বছর পর্যন্ত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তন করে সার্বজনীন ভরতিকরণ এবং বিদ্যালয়ে ধরে রাখাকে নিশ্চিত করতে পারে এবং শিক্ষার মানকে উন্নত করতে সক্ষম হয়।

(গ) জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখায় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা, নমনীয় এবং গুণগত মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে।

(ঘ) নতুন পাঠক্রমের কর্মসূচিগুলি এমন হবে যাতে বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষ করবে, প্রতিটি শিক্ষার্থী আত্মমর্যাদার অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং শিক্ষণে উৎসাহ বোধ করবে।

(ঙ) পাঠক্রমের নকশা কেবলমাত্র সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দায়বদ্ধ থাকলে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যসহ বিভিন্ন পশ্চাৎপট (যেমন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক, শারীরিক, মানসিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পার্থক্য সম্পন্ন) থেকে আগত শিক্ষার্থীরা শিখনের সুযোগ পায় এবং বিদ্যালয়ে সাফল্য অর্জন করে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখবে।

(চ) পাঠক্রমে ধারাবাহিক সংস্কারের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ এবং পঞ্চায়েতবাদ ব্যবস্থার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পঞ্চায়েতবাদ (DRJ) অপেক্ষাকৃত কম আমলাতান্ত্রিক, শিক্ষকগণের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধিকার অর্জন করে ও শিশুদের চাহিদার উপর গুরুত্ব দেয়।

(ছ) পাঠক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং সাধারণ পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন শ্রেণিকক্ষে করতে উৎসাহিত হয়।

(জ) পাঠক্রমকে এমনভাবে রূপ দিতে হবে যাতে শিখনের মূল নীতি যেমন জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বির্মূত, স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক ইত্যাদি অনুশীলিত হয়।

(ঝ) পাঠক্রমের রূপরেখা নিম্নোক্ত শিক্ষা-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

—শ্রেণিকক্ষে জ্ঞান সঞ্চালনের সঙ্গে শিশুর জীবন অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করতে হবে

—প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর (Marginalised persons) শিশুরা যাতে নিজেদের অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তারা তাদের সহপাঠী সুবিধাভোগী জনগণের শিশুদের মর্যাদা লাভ করার সুযোগ পায়।

(ঞ) বিদ্যালয়ের পাঠসূচির মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং তত্ত্বগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার বোধ জাগ্রত করে তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

(ট) শিশু/শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা এবং তার রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন পাঠক্রমের নীতি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিগত শতাব্দীতে সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি, প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার। জীবনযাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে পরিবেশের ভারসাম্যের বিশেষভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে প্রকৃতি এবং তার পরিচর্যা অর্থাৎ তাকে রক্ষা করার বিষয়টির উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন এই জন্যই NPE (1986) সমাজের সর্বস্তরের জনগণসহ 'পরিবেশ সচেতনতা' সম্পর্কে শিক্ষার সর্বস্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

(ঠ) বর্তমানে আমরা এক অভূতপূর্ব হিংসার পরিবেশে (স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্ব স্তরে) বাস করছি, এত দিন পর্যন্ত শিক্ষা এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেছে যার ফলে অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি দেখা দিয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) এ পাঠক্রমের রূপরেখার নীতি হিসাবে বিষয়টিকে গভীরভাবে নজর দিতে বলেছে। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় শান্তির (Peace) সংস্কৃতি গঠন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।

❸ 2005 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার (National Curriculum Frame Work, 2005) নীতিসমূহ এবং তার বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখ করা হল: মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশে এবং NCERT-এর প্রশাসনিক সহায়তায় National Steering Committee 2005-এর ডিসেম্বরে ন্যাশানাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক 2005 সরকারি স্তরে একটি দলিল পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে এটি NCERT কর্তৃক প্রকাশিত ন্যাশানাল ক্যারিকুলাম ফর স্কুল এডুকেশন 2005 (National Curriculum for School Education 2005) পাঠক্রমের একটি রূপ।

পঞ্চম অধ্যায়ের 323 থেকে 336 পৃষ্ঠায় আলোচিত জাতীয় পাঠক্রমের (2005) রূপরেখার নীতিগুলি এবং তার বিশ্লেষণ লিখতে হবে।

মন্তব্য (কেবল মাত্র সংকেত দেওয়া হল)

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আর সে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার একাধিক নীতি আছে সেগুলিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়ন জন্য, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির প্রয়োজন হয়, ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, আন্তর্জাতিক কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ইত্যাদি সবগুলিই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার নীতিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে এই নীতিগুলির পরিবর্তন ঘটে।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক নির্দেশ পালন (বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ) এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলি গঠনের প্রেক্ষিতে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী নীতি গ্রহণ করা হয়।

উক্ত উভয় ধরনের নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য বজায় রেখে পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয় যার প্রতিফলন ঘটে শিক্ষা-শিক্ষণ প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন এবং পরবর্তী সময়ে পাঠক্রম সংস্কারে।

পাঠ্যপুস্তকে কেন্দ্রীয়, লুক্কায়িত, অবহেলিত এবং সুপ্ত পাঠক্রম নির্দিষ্টকরণ (Identification of Cores, Hidden, Null and Latent Curriculum in Text Books)

উক্ত Practicum বা ব্যাবহারিক কাজটি সম্পন্ন করতে হলে নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। (কেবলমাত্র guide line দেওয়া হল)

প্রথম অধ্যায়ে লিখতে হবে পাঠক্রম কাকে বলে এবং তার প্রয়োজনীয়তা (যা এই বইতে উল্লেখ আছে)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত পাঠক্রমের শ্রেণিভাগগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হবে যা এখানে উল্লেখ করা হল।

কেন্দ্রীয় পাঠক্রম (Core Curriculum)

ebook.dascoaching.in

অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সামগ্রীর সমন্বয় ঘটিয়ে যে পাঠক্রম রচনা করা হয় তাকেই বলে কেন্দ্রীয় পাঠক্রম (core curriculum)। যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শ অভ্যাস, কর্মদক্ষতা ও জীবনাদর্শ বিকাশে সাহায্য করে তাই হল কেন্দ্রীয় পাঠক্রম। N.L. Bossing বলেছেন, কেন্দ্রীয় পাঠক্রম হল এমন কতকগুলি নির্বাচিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়,

যেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থী জ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা অর্জন করে। মানুষের কতকগুলি সাধারণধর্মী চাহিদা রয়েছে এবং ওই চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য যে পাঠক্রম প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনুশীলন করা প্রয়োজন তাকেই কেন্দ্রীয় পাঠক্রম বলা হয়। আমাদের সমস্ত কমিশনগুলি, জাতীয় শিক্ষানীতিগুলির কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন

(i) এই পাঠক্রমের মাধ্যমে বিশেষধর্মী জ্ঞান পরিবেশন না করে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা হয়।

(ii) এই পাঠক্রমের উপাদান হবে সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই পাঠক্রম সম্পর্কে বলা হয়, "It will equip the students with the fundamental knowledge of social living."

(iii) বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের সঙ্গে সমাজকেন্দ্রিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো এই পাঠক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(iv) শিক্ষার প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সাধারণ ধর্মী কিছু জ্ঞান থাকা দরকার, তাই এই স্তরগুলিতেই কেন্দ্রীয় পাঠক্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এই কারণে প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যস্থায় কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের ব্যবস্থা এই স্তরগুলিতেই রয়েছে।

(v) এই পাঠক্রম উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিমূলক পাঠক্রম।

(vi) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহুমুখী অনুরাগের সঞ্চার করাই হল এই পাঠক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় পাঠক্রমকে আরও বেশি মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে অনুবন্ধন স্থাপন করা প্রয়োজন। এইভাবে রচিত হলে তা শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রহণ করা যেমন সহজ হয় তেমন এর মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকেও রূপায়িত করা সম্ভব হয়। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় করে যে পাঠক্রম রচনা করা হয় তাকে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম বা Integrated Curriculum বলে।

অবহেলিত পাঠক্রম (Null Curriculum)

প্রথাগত পাঠক্রমে অর্জিত জ্ঞান এবং আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে পছন্দ মতো বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করি এবং অনেক বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না এর অর্থ এই নয় যে, যেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তার কোনো প্রয়োজন নেই, সাধারণ ব্যক্তিগণ ও মনে করেন প্রয়োজনীয়তার অভাবে এগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যবহৃত পাঠক্রমে জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন ক্রাফ্‌ট বা শিল্পের কাজ, শিক্ষা এবং সংগীত ইত্যাদি অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বাস্তবে দেখা গেছে পাঠক্রমে অবহেলা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা এগুলি শিখেছে, একেই অবহেলিত বা Null পাঠক্রম বলে। অর্থাৎ অবহেলিত বা Null পাঠক্রম হল সেই পাঠক্রম যা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু শিক্ষার্থীরা শেখে। জনপ্রিয় সমসাময়িক সংগীত শিল্পের সংগীত, সমসাময়িক বিতর্কিত বিষয়সমূহ ইত্যাদি প্রধানত পাঠক্রমে অনুপস্থিত কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদভাবে সচেতন।

লুক্কায়িত পাঠক্রম (Hidden Curriculm)

প্রথাগত পাঠক্রম বিদ্যালয় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে কার্যক্রম হয়, শিক্ষার্থীরা প্রধানত পাঠক্রম ছাড়াও অন্যান্য উৎস ও আচরণ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। একেই বলে লুক্কায়িত (Hidden) পাঠক্রম। অন্যভাবে বলা যায় অপরিকল্পিত উৎস থেকে তথ্য আহরণকেই লুক্কায়িত পাঠক্রম বলে। যদিও এর উৎসগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না তবে পাঠক্রম সংগঠনকে যখন তার সম্ভাব্য উৎসের প্রেক্ষিতে বিচার করা হয় তখন আংশিকভাবে হলেও লুক্কায়িত পাঠক্রমকে চিহ্নিত করা যায়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হোমটাস্ক, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসা, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে সম্মিলিতভাবে উঠে দাঁড়ানো, সহপাঠীদের দেয় কোনো প্রশ্নের উত্তর থেকে জ্ঞান আহরণ, বিদ্যালয়ে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা ইত্যাদি।

সুপ্ত পাঠক্রম (Latent Curriculum)

শিক্ষার্থীদের যে পাঠক্রম সরবরাহ করা হয় তা শিক্ষার্থীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুপ্ত ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী গ্রহণ করে—একেই সুপ্ত পাঠক্রম বলে। প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রম বিকাশে এই বিষয়টি বিবেচনা করা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব বলা যায়। এই অসুবিধা দূরীকরণে যাদের জন্য পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়, সেই সব শিক্ষার্থীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি বিচার করে পাঠক্রম বিকাশ করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়ে কোনো পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয়গুলির উপর আলোচনা আছে সেগুলিকে উপরোক্ত পাঠক্রমের শ্রেণি অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে চতুর্থ অধ্যায়ে মন্তব্য লিখতে হবে।

সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রমের নকশাকরণ (Designing an Activity Based Curriculum)

সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রমের নকশাকরণ বিষয়ে ব্যাবহারিক কাজের জন্য এখানে কেবলমাত্র Guideline দেওয়া হল।

প্রথম অধ্যায়ে থাকবে ভূমিকা

কর্মের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে। রুশো, মন্তেসরি, ডিউই, গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ সকলেই স্বীকার করেছেন শিক্ষাকে সফল করতে হলে কাজের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দেহ ও মনের বিকাশের সহায়ক।
2. এমনভাবে কর্মগুলি নির্বাচন করা যায় যাতে বৌদ্ধিক বিকাশও ঘটতে পারে।
3. নির্বাচিত কর্মগুলি শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে হওয়া উচিত।
4. কর্মগুলি শিক্ষামূলক ও শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ডিউই-এর পরীক্ষাগার বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম এই শ্রেণির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের ছটি ভাগ রয়েছে। যেমন—

দ্বিতীয় অধ্যায় থাকবে—কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের নকশাকরণ

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম

দৈহিক কার্যাবলি	পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি	গঠনমূলক কার্যাবলি	কল্পনাত্মক কার্যাবলি	সৃজনাত্মক কার্যাবলি	সামাজিক কার্যাবলি

(i) ***দৈহিক কার্যাবলি:*** এই পাঠক্রমের মধ্যে রয়েছে শারীরশিক্ষা, খেলাধুলা, action songs, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলি ইত্যাদি। দৈহিক শক্তিকে কাজে লাগানো যায় এমন সব বিষয় এই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ii) ***পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি:*** বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করাই হল পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি। যেমন—পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, ভ্রমণ, পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি হল পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি।

Dakshin Dinajpur B Ed 2009

(iii) *গঠনমূলক কার্যাবলি:* পাঠক্রমে যে ধরনের কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে ও কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়, উৎপাদন মূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সেইগুলিই হল গঠনমূলক কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের উপাদান। যেমন—হস্তশিল্প, বিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষা, সাধারণ যন্ত্রপাতি সারানো ইত্যাদি।

(iv) *সৃজনাত্মক কার্যাবলি সংক্রান্ত পাঠক্রম:* পাঠক্রমের যে কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনাত্মক গুণাবলির বিকাশ ঘটে তাকে সৃজনাত্মক কার্যাবলি সংক্রান্ত পাঠক্রম বলে। সংগীত, শিল্পকলা, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি তৈরি, বিভিন্ন ধরনের চার্ট ও মডেল তৈরি ইত্যাদি বিষয়ক পাঠক্রম এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(v) *কল্পনাত্মক কার্যাবলি:* পাঠক্রমের যে কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের কল্পনা বিকাশে সাহায্য করে তাকেই কল্পনাত্মক কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম বলে। সাহিত্য পাঠ্য, অভিনয়, বিভিন্ন ধরনের অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ক পাঠক্রম এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(vi) *সামাজিক কার্যাবলি:* পাঠক্রমের যে কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে উৎসাহিত করে তাকে সামাজিক কার্যাবলি সংক্রান্ত পাঠক্রম বলে। সমাজসেবামূলক কাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, সমাজ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ইত্যাদি এই ধরনের পাঠক্রমে স্থান পাওয়া উচিত।

সুতরাং কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের কর্মেন্দ্রিয় বিকাশের সাহায্য করে তাই নয়, এগুলি শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশেও সাহায্য করে। আধুনিক পাঠক্রমের ধারণা অনুযায়ী শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের উপযোগিতা সকল শিক্ষাবিদ ও মনোবিদ স্বীকার করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায় থাকবে মন্তব্য: এখানে শিক্ষার্থীদের কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ লিখতে হবে।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমের বিশ্লেষণ (Analysis of School Curriculum at Different Stages)

প্রথম একটি ভূমিকা লিখতে হবে—এখানে পাঠক্রম এবং বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাস্তর যেমন—প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সম্পর্কিত আলোচনা করতে হবে। যা পঞ্চম অধ্যায়ের **302** থেকে **322** পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Two-Year BEd Programme-এ 2nd Semester-এর অন্যান্য বই

- **শিখন এবং শিক্ষণ** (Learning and Teaching)
  ড. জয়ন্ত মেটে ড. রুমা দেব ড. বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ
- **শিখন ও শিক্ষণ** (Learning and Teaching)
  ড. দেবাশিস পাল
- **ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি** (Pedagogy of Language Teaching)
  ড. সুবিমল মিশ্র
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ইতিহাস** (Pedagogy of Social Science Teaching)
  গৌতম পাত্র
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ভূগোল** (Pedagogy of Social Science Teaching)
  ড. মহাদেব ঠাকুর চক্রবর্তী, পিউ রায়
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি** (Pedagogy of Social Science Teaching)
  ড. অমল কুমার মাইতি, অর্ণব কুমার দত্ত
- **জীবনবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি** (Pedagogy of Science Teaching)
  ড. সুবীর নাগ, শিঞ্জিনী নাগ
- **ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি** (Pedagogy of Science Teaching)
  ড. অমলকান্তি সরকার
- **ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি** (Pedagogy of Science Teaching)
  ড. দেবাশিস ধর
- **বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: জীবনবিজ্ঞান** (Pedagogy of Science Teaching)
  ড. উদয়াদিত্য ভট্টাচার্য, রুম্পা মুখার্জি
- **বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা** (Pedagogy of Science Teaching)
  মহুয়া চক্রবর্তী
- **গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি** (Pedagogy of Mathematics Teaching)
  প্রণয় পাণ্ডে
- **প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম** (Knowledge and Curriculum)
  ড. অমলকান্তি সরকার
- **জ্ঞান ও পাঠক্রম: তত্ত্ব ও প্রয়োগ** (Knowledge and Curriculum)
  ড. মিহির কুমার চ্যাটার্জি, ড. কবিতা চক্রবর্তী
- **জ্ঞান ও পাঠক্রম** (Knowledge and Curriculum)
  ড. প্রণব কুমার চক্রবর্তী
- **শিখনের অ্যাসেসমেন্ট** (Assessment for Learning)
  ড. দেবাশিস পাল, ড. দেবাশিস ধর
- **শিখন প্রক্রিয়া ও শিখন ব্যবস্থার অ্যাসেসমেন্ট** (Assessment for Learning)
  ড. অমলকান্তি সরকার
- **শিক্ষায় নাটক ও শিল্পকলা** (Drama and Arts in Education)
  অনিরুদ্ধ মুখার্জি

ebook.dascoaching.in

রীতা পাবলিকেশন™
25B, Beniatola Lane, Kolkata-700 009